সাহিত্য জিজ্ঞাসা

ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়—১৩৬৬

প্রকাশক

বিবেক ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা—৭

মুদ্রাকর

ফণীভূষণ বসু

হিন্দুস্থান প্রেস

১০, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ

অরুণ বণিক

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

হিন্দুস্থান প্রেস

১০, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

বাঁধাই

আলম্ এ্যাণ্ড্ কোং

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু ॥

॥ সূচীপত্র ॥

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

সাহিত্যের কথা

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

বাংলা কাব্যে শিব (যন্ত্রস্থ)

॥ ভূমিকা ॥

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মুদ্রিত এবং কয়েকটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা'। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দু-একটি রচনাকে আজ ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে; কিন্তু মূল বক্তব্য সম্পর্কে মতদ্বৈধ না থাকায় সেগুলির পরিবর্ধনে সচেষ্ট হই নি।

আমার শিক্ষাগুরু ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের কাছে আমার ঋণ অসীম। গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করে কৃতার্থ মনে করছি।

গ্রন্থের নামকরণ এবং প্রবন্ধ নির্বাচনের সমস্ত দায়িত্ব বন্ধুবর বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের; আর ত্রুটি-বিচ্যুতির সমস্ত দায়িত্ব আমার। প্রকাশ ব্যাপারে অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বসু, হিন্দুস্থান প্রেসের স্বত্বাধিকারী ফণীভূষণ বসু এবং প্রকাশ-ভবন ও মুদ্রণ-আলয়ের কর্মীদের সাগ্রহ সহযোগিতা অবিস্মরণীয় ॥

রথযাত্রা। তেরশো ছেষট্টি
স্কটিশ চার্চ কলেজ। কলকাতা ছয়।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

বাঙালীর সংস্কৃতি

সেই সুপ্রাচীনকালে বাঙলা ছিল পাণ্ডববর্জিত অর্থাৎ আর্যবিরহিত দেশ, এ সত্য আজ নতুন করে প্রমাণিত হবার অপেক্ষা রাখে না। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে আদিম আর্যেতর কোমজাতি ছোট ছোট গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে বসবাস করত। কৃষিকার্যই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের পেশা। নিজস্ব উৎপাদন পদ্ধতি, অর্থনৈতিক কাঠামো, আশপাশের বনজঙ্গল, মাথার ওপরকার আকাশ ঋতু আর পায়ের তলাকার মাটি, এই নিয়ে তাদের দিন কেটে যেত স্ব-ছন্দে। স্বকীয় সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ধর্মকর্ম ধ্যান-ধারণা আচার অনুষ্ঠান ভাষাকাব্য আর দেবদেবী গড়ে উঠেছিল এক বিশেষ ভংগিতে। নরগোষ্ঠি হিসাবে বাহির-বাঙলার অন্যান্য আদিম কোমদের জীবন ও মননের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য ছিল ; বৈসাদৃশ্য ছিল স্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক নিয়মে।

তারপর একদা এল আর্য-অভিঘাত। উৎপাদনে অর্থনীতিতে সমাজে রাষ্ট্রে শাসনে এল নূতনতর ব্যবস্থার জোয়ার। রাজপুরুষদের সঙ্গে এল রাজধর্ম একে একে, উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে উচ্চতর সংস্কৃতির ভাবনা-ভংগি। বাঙলায় তারা বহুদিন বাস করল পাশাপাশি। মিলমিশও হল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য মিশ্রণ কিছু দেখা গেল না, অন্ততঃ পালরাজাদের আমল পর্যন্ত তো নয়ই। অমিলের গৌণ কারণ বহিরাগত বণিকতন্ত্রাশ্রয়ী আর্য রাষ্ট্রীকতার ঔদ্ধারতা ; মুখ্যত বাঙলার আদিম কোমদের গ্রহণ করার মনোবৃত্তির অভাব। সমাজ-জীবনে যেমন তারা মনুসংহিতাকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেনি তেমনি মানিয়েও নিতে পারেনি সংস্কৃত কাব্য ও ধর্মের স্রোতের সঙ্গে। ফলে আর্য-অনার্য সংস্কার ও,,সংস্কৃতি প্রতিবেশী হয়ে কাটাল বহুকাল, আত্মীয় হতে পারল না এক নজরে। সংমিশ্রণ অবশ্যই হয়েছে, সে কেবল দেহ-নৈকট্যের জন্যে, অন্তর-ঘনিষ্ঠতার আগ্রহে নয়।

কিন্তু দ্বন্দ্ব প্রাণের প্রাণ। তার অভাবে জীবন মন সমাজ সংস্কৃতি অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসের নিয়মই এই। তার চলমান প্রবাহে বিরোধী

প্রবাহ এসে প্রতিঘাত করে, বহু লীলাবিলাসান্তে বেজে ওঠে সমন্বয়ের ছত্রিশ রাগিণী। সে সমন্বয়ও চরম উপসংহার নয়: নতুন পথে চলার একটা বড় বাঁক, সাময়িক বিরতি, দ্বন্দ্বলীলার সন্ধিক্ষণ মাত্র। তাই যেদিন সেন রাজারা পৌরাণিক ধর্মকে রাজধর্মরূপে বাঙালীর জনজীবনে প্রসারিত করে দেবার চেষ্টা সুরু করলেন, সেদিন থেকে বাঙালীর বাস্তব জীবনে ও মানস কল্পনায় সুরু হল দ্বন্দ্বের লীলা। সমাজে এল সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের প্লাবনবন্যা। পাঠান-মোগল আমলে ইসলাম ধর্ম বস্তু জীবনে যে ক্রিয়াই করে থাকুক, ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সত্যপীর ভিন্ন তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ। সুতরাং সেন আমলের সমাজব্যবস্থাই যেমন চালু থেকে গেল, তেমনি চলতে থাকল প্রাচীন ধর্ম-সংস্কৃতিও। সেই পথ ধরেই বাঙালীর জীবন ও মনন এগিয়ে চলল নানা আবর্তন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, বিভিন্ন ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করতে করতে। তুর্কী অভিঘাত একে দিল দ্রুতি ও দীপ্তি।

তার এই চলার পথের মূল হল দ্বন্দ্ব—আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব। আদিম কৌম বাঙালী পারেনি আর্য সংস্কৃতি ও মানসকল্পনার সঙ্গে নিজেকে সব রকমে মানিয়ে নিতে। উদারতা-ঔদাসীন্যের যুগ পেরিয়ে যখন বাঙালীর আত্মনেপদী কৃষ্টি ও আর্যভারতের পরস্মৈপদী কৃষ্টি মুখোমুখি দাঁড়াল—দ্বন্দ্ব বাঁধল তখন, সংঘর্ষ হল। বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে মিলমিশও ঘটল; কিন্তু দুয়ে মিলে এক হল না, দুই-ই থেকে গেল। দুজনেই দুজনের চোখের বালি, চোখের মণি নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে মিলন-মিশ্রণ বারে বারেই অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে, আর প্রতিবারেই মিলনের পরম মুহূর্তে দুই পক্ষ দুই বিপরীত দিকে ছিটকে পড়েছে। আবার এগিয়ে আসতে হয়েছে, বিচ্ছেদ এসেছে পরমুহূর্তেই। আর্যমানস ও অনার্যমানস পরস্পরবিরোধী এ দুই সংস্কৃতিভূমি এইভাবে যতবার অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছে ততবারই দূরে সরে গেছে; মিশ্রণ হয়েছে, মিলন হয়নি। পলাশীর যুদ্ধ-সীমান্তে গিয়ে মিলনের সুর অবশ্য খুব জোরেই বেজে উঠেছে। কিন্তু দ্বন্দ্ব তারও মূল রাগ। এই দ্বন্দ্বের দোলায় যেমন বাঙালী জীবন, তেমনি বাঙালী মন দুইই দুলেছে, গড়ে উঠেছে ধর্ম সাহিত্য।

বস্তুত প্রাচীন বাঙলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, তা আর্য সংস্কৃতি ও আর্যেতর সংস্কৃতির সনাতনী দ্বন্দ্বলীলার প্রতিচ্ছবি। ঐ দ্বন্দ্বই তাকে জন্ম গতি ও রূপ দিয়েছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কাল থেকে কালান্তরে। বাস্তব জগতে মিলনের চরম লগ্ন, অন্তর জগতে প্রত্যাখ্যানের পরম আকৃতি, আর্য-

অনার্য ভাবনার এই বিরহমিলনলীলাই প্রাচীন বাংলা কাব্য ও বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে রূপকে ও রূপকথায় অপরূপ ভংগিতে সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করেছে।

তবে দ্বন্দ্ব বলতে কেবলই শত্রুতা বা বিচ্ছেদ নয়। বাঙালী বহিরাগত বহু বিষয় গ্রহণ করেছে—নিজের মতো করে নিয়েছে তাকে। সামরিক দিক থেকে যেমন সে রাজশক্তির অধীন হতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি মাথা উঁচু করে বাধা দেবার, স্বপদে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টাও করেছে। যথা, রাজা শশাংক-দিব্যোক-ভীম-বারভুঁইঞা। সমাজ-দেহেও এরই প্রতিরূপ। ওপরতলার রাষ্ট্রনীতি মানতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের, তারাও সম্পূর্ণভাবে মেনে নেবে না সেই নীতি-অনুশাসন। মাথার ওপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যখন, তখনও বাঙলায় মনু-কথিত শূদ্ররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর্য ধর্ম, আর্য দেব দেবী, সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী বাঙালী অবশ্যই গ্রহণ করেছে, কিন্তু যথাযথভাবে নয়। নিজের প্রয়োজন ও মনের মতো করে তাকে ভেঙেচুরে রূপান্তরিত করে নিয়েছে, স্বীয় ধ্যান ধারণা উৎসব উপাসনা কাব্যসংগীতের সামিল করে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এইভাবে বাহির ও অন্তর দুইয়ের যোগে বাঙালীর একটি নিজস্ব সংস্কৃতি, মিশ্র কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। কিন্তু ঐ মিশ্রণ সমন্বয়ী হলেও মিলনের আন্তরিক কামনা যেখানে অসূর্যম্পশ্যা, মনে মনে যেখানে দুই পক্ষই পরস্পর-অনীহ, সেখানে পরস্মৈপদীর আত্মনেপদী-করণ কিভাবে সম্ভব? তাই মিলনমুখেও সংঘাত থেকে গেছে বাঙালীর জীবনে, দ্বন্দ্ব থেকে গেছে বাঙালীর মননে, হাজার সংমিশ্রণ সত্ত্বেও। সে দ্বন্দ্ব আর্য-অনার্য ভাবনার, সেই দ্বন্দ্বই বাংলা সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণ; দ্বৈতলীলাই তার জীবন দর্শন, লীলারসই তার একমাত্র আস্বাদ্য।

তালি এক হাতে বাজে না, দ্বন্দ্ব তেমনি একপক্ষে হয় না—চাই দুটি পক্ষ। তেমনি প্রয়োজন দুজনকে, নইলে দ্বৈতলীলা রূপেরসে বিচিত্র সৌন্দর্য লাভ করে না। জ্ঞানবাদী আর্যদেবতা মূলত অদ্বিতীয় একবচন, ভক্তিবাদী আর্যেতর হাতে পড়ে তাঁকে দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণ করে দ্বিবচন হতে হল, বহুবচন হতে বেশী দেরী লাগল না। শিব ও বিষ্ণু এই দুই আর্য দেবতারই তখন প্রবল প্রতাপ। বাঙলার বিভিন্ন দেবী গ্রাম্য বাস্তু অরণ্য পর্বত কৃষি ও যৌন উপাসনার ইষ্টদেবদেবীগণ একে একে যুক্ত হতে লাগলেন এঁদের সঙ্গে নানা সম্বন্ধের সূত্র ধরে, দাস্য সখ্য বাৎসল্য নানা রসের রূপে, কিন্তু শান্ত রস

নৈব নৈব চ। বাঙলার ধর্মসভায় একক দেব বা একাকিনী দেবীর স্থান নেই, বাংলা কাব্যেও না ; দ্বন্দ্বই তাঁদের বিধিলিপি। হাজার বছর একত্রে বসবাস করেও দুই দুই থেকে গেল, দুয়ে মিলে অভিন্ন-এক হয়ে উঠল না। তাই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বাঙালীর অতিপ্রিয় ছিল বলে বিশেষ প্রমাণ মেলে না। যেটুকু আছে তারও মধ্যে আধাবর—আধাবধূতে নিরন্তর বিবাদ-পরিবাদ লেগেই আছে। বাঙালীর দেবদেবীর এই দ্বিধারূপের মূল অর্থই হল দ্বন্দ্ব। তা একদিকে যেমন ঘরোয়া রোমান্সকে প্রতিফলিত করেছে, তেমনি আর একদিকে আর্য-অনার্য মানস-ভাবনার সনাতনী সংঘাতকে রূপায়িত করে তুলেছে।

রাধাকৃষ্ণ। বাহির বাংলা থেকে আগতা হয়েও রাধা হয়ে গেছেন বাঙালিনী ; কৃষ্ণ অমিশ্র আর্য ভারতীয়। সেন রাজদরবারী আবহাওয়ায় জয়দেবের রাধা বাঙালিনী হয়েও অভিজাতা, কৃষ্ণ তাঁর চরণ-চারণ-চক্রবর্তী। তবু স্পষ্ট দেখি, দুজনের মিলনের পথে বহু যোজন। একজন যখন কুঞ্জে, অপরজন তখন বহুৎ দূর অস্ত্। দুজনের সমান অভিমান, সমান মানসিক বাধা ; আর্য-অনার্য কেউ কারও সঙ্গে মিলিত হতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বাস্তব সংঘর্ষ মিলনের পথ খুলে দিচ্ছে। তাই অবশেষে আর্য মন আত্মনিবেদন করল আর্যেতর মানসীর পদপ্রান্তে। নইলে পবিত্র আর্যধর্ম বাঙলার কৌম জীবনে প্রচারিত প্রসারিত হবে কেমন করে? তাই সেন রাজাদের পৌরাণিক সংস্কৃতি প্রথমে মিষ্টি বুলি নিয়ে হাজির হল আর্যেতর সমাজে। কিন্তু আদিম সংস্কার রক্ষণশীল, সংরক্ষণ-মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তাই অচিরে ভালমানুষির মুখোশ খশিয়ে ফেলতে হল ; স্বচ্ছন্দে বয়ে যেতে ইচ্ছুক আর্যেতর মননে আর্য সংস্কৃতি সবলে অধিকার বিস্তার করতে ব্যগ্র হল। তাই গীতগোবিন্দের কোমলকান্তির পরিবর্তে এল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রূঢ় বাস্তবতা, বন্য বলিষ্ঠতা। বড়ুর কৃষ্ণ অনিচ্ছাময়ী রাধাকে জোর করে ভোগ করে। মিলনেই ঘনিষ্ঠতা। রাধা ক্রমেই কৃষ্ণময়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু আর্য অনার্যের মিলন-বাসনা তো আন্তরিক নয়, বহিরঙ্গ, বস্তুজাগতিক। আর্য অনার্য সংস্কারকে মনের পক্ষে সুসহ করে নিতে পারে না, চায় দখলীস্বত্ব। তাই ও পক্ষ যখন পেছোয়, এপক্ষ এগিয়ে যায় ; ও-পক্ষ যখন এগিয়ে আসে, এ পক্ষ স্থানত্যাগ করে। কৃষ্ণ তদ্‌গতপ্রাণা রাধাকে ত্যাগ করে চলে যান, মথুরা জয় করার মানসে নয়, এই অবৈধ মিলন অনুচিত বোধ হচ্ছে বলে। কৃষ্ণ এখন নারীত্যাগী যোগী—'মনপবন গগণে রেহাই'!

ক্রমে দিন এগোয়, জীবন এগোয়; মনও পেছিয়ে থাকে না। আর্য তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যতই নিজেকে জাহির করতে থাকে কৌম সংস্কারের ওপর, দ্বন্দ্ব-মিলমিশ ততই উদ্দামতা লাভ করে, কাব্য ততোই শ্রুতিমধুর রসসুন্দর হয়ে ওঠে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি থেকে রাধাকৃষ্ণ ক্রমেই পরিশোধিত হয়ে উঠতে থাকেন রূপেগুণে। রাধা এখন 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়।' তিনি এখন না-আর্য, না-অনার্য, না ঘরকা না ঘাটকা। বাঙালী বুঝতে পারে না কাকে গ্রহণ করবে। তাই দ্বিধা। এ দ্বৈধ মনোভাব রাধার রূপবর্ণনাতেও সুলভদ্রষ্টব্য। একদিকে কালিদাসাদির অনুসরণে তাঁর 'তিলফুল জিনি নাসা,' 'সিংহ জিনি মাঝা ক্ষীণি', 'খঞ্জন নয়ন চকোর'; অন্যদিকে চণ্ডীদাসাদির নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে তাঁর—'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।' বস্তুত, কেবল রাধাই নয়, বাঙলার তাবৎ দেব-দেবী নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনাতেই আর্যেতর গ্রাম্য ও আর্য নাগর ভাবনার আলোছায়ার বিচিত্র লীলা। আবার কেবল ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে নয়, আঙ্গিকের সকল ক্ষেত্রেই।

ভাগবত-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ কংসবধের জন্যে ধরায় অবতীর্ণ, বৈষ্ণব পদাবলীতে, রাধার সঙ্গে লীলাবিলাসার্থে—কংসের জন্যে বুদ্ধিভ্রংশতা তাঁর নেই। আর্য-অনার্য মানসে আদিম দ্বন্দ্ব এখন লীলায় পরিণত সাহিত্যের স্বাভাবিক বিবর্তন পথে। সে দ্বন্দ্ব আজ যতোটা না বাস্তব, তার চেয়েও বড়ো, তা হল কাব্যবস্তু। সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার দৃঢ়তর, সুপ্রতিষ্ঠ; আর্যেতর মানসও আর্যমুখী, প্রতিবেশীর পরিবেশে। তাই এতদিন কৃষ্ণ পথরোধ করতেন রাধার; আজ প্রিয়তমকে একনজরে দেখেই রাধা নিজেই অভিসারিকা, 'পন্থ বিপথ নহি মান!' একদা কৃষ্ণ না খেয়ে না দেয়ে ঘাটের পথে অপেক্ষা করতেন—কখন আসবে বৃষভানুতনয়া, কিভাবে তাঁর মনোজয় করবেন; আজ সব চিন্তা রাধারই, পথের বাধা দূর করার সকল প্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা করেন, জয়ও করেন। কিন্তু ঠিক তখনই কৃষ্ণের অভিসার-সংখ্যা কমে আসতে থাকে। সংকেত; কুঞ্জ। কিন্তু সেখানেও বহু বাধা—উৎকন্ঠিতা খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা। অভিমান কি সহজে যায়? মান-ভঞ্জন পালার মধ্যে দিয়ে সে ঝামেলা মেটাতে হয়; দুয়ে দুয়ে এক হবার সুবর্ণ সুযোগ আসে। কিন্তু তাও বর্ণহীন হয়ে যায়, জেগে ওঠে প্রেমবৈচিত্ত্য—বাঙালী বৈষ্ণবের নিজস্ব সৃষ্টি, অসাংস্কৃতিক। সেখানে মিলনে বাধা নেই, মিলনে রতি নেই—'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' এই প্রেমবৈচিত্ত্যই আর্য অনার্য

মানস দ্বন্দ্বের মূল সুর, বৈষ্ণব ধর্ম সাহিত্যের মহাভাব, চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাই বৈষ্ণব পদ ও চণ্ডীদাস বাঙালীর মন-অধিনায়কত্ব লাভ করতে পেরেছিলেন। এতো শুধুই কল্পনা-প্রবৃত্তি নয়, বাস্তববৃত্তি। ওপর-নীচ মিল হওয়া কি সহজ কথা? বাধা—বাইরে-অন্তরে; ভারতচন্দ্রের ভাষায়, 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' তাই চরম মিলনের পরেও এসেছে পরম বিরহ, বৈষ্ণব গীতিমালার সর্বশ্রেষ্ঠ কুসুমকোরক, অপূর্ব রূপরসান্বিত। বিরহেই তো শেষ নয়, প্রেমবৈচিত্ত্য চাই, নইলে দ্বন্দ্ব জমাট বাঁধবে কেন? অতএব যখন 'বিরহ অগিন অন্দর জারে', তখন মিলনের স্বপ্ন দেখতে হয় কল্পনার দূত পাঠিয়ে ভাবসম্মিলনের অলোক অলকায়। মিলনে বিরহ, বিরহেও মিলন: সেই দ্বন্দ্ব, সেই দ্বৈতলীলা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার গঙ্গাযমুনা, শুধু বদ্‌লে বদ্‌লে গেছে—হাবভাব ভংগিবিভ্রম বিলাসকলাকুতূহল।

শিবশক্তি। বাঙলার রঙ্গমঞ্চে আর্য-আর্যেতর সংঘাতলীলাভিনয়ের অন্যতম অভিনেতা-অভিনেত্রী। অনার্যদেবতা শিব বাঙলায় প্রবেশ করলেন আর্যায়িত হবার পর। একইভাবে সংঘাত বাধল বঙ্গীয়া দেবীদের সঙ্গে। আদ্যাদেবী চণ্ডী মনসা শীতলা গন্ধেশ্বরী মায় বনবিবি ইস্তক। একদিকে এঁরা শিবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, অন্যদিকে ঘরে বাইরে পরম শত্রু, বিবাদ পরিবাদে সিদ্ধ শক্তি। এইভাবে আর্য শিবকে সদরে অন্দরে নির্যাতিত করে সেদিন বাঙালী কৌম মানস অপার আনন্দ লাভ করেছিল, যেমন করেছিল রাধাপদে কৃষ্ণের আত্ম-নিবেদনে। শাক্ত বাঙালী ভক্ত বাঙালীর চেয়ে আর এক পদ অগ্রসর হল। শিবের বুকে তারা প্রতিষ্ঠিত করল শ্যামাকে, আর্য প্রজ্ঞার উপরে অনার্য প্রাণশক্তিকে; অন্যদিকে ভিখারী ভোলানাথ সারা পৃথিবী ঘুরে শেষবেলা এসে হাত পাতলেন নিজ ঘরণী অন্নপূর্ণারই হাতার তলে। বিচিত্র মানসের সঙ্গে সনাতনী দ্বন্দ্ব এসে দাঁড়াল—অনার্যের কাছে আর্যসংস্কৃতির আধাবাস্তব-আধা-কাল্পনিক আত্মনিবেদনে। পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে বাঙালী মহানন্দে গেয়ে উঠল—'সবে এক এই দেবীদেবা'। দ্বন্দ্বের বক্ররেখা উপনীত হল মিলনের বৃত্তবিন্দুতে।

তারপর পলাশীর যুদ্ধ। নয়া অর্থনীতি, নতুন সমাজ, নবীনমন। নয়া সংস্কৃতি, নতুন দ্বন্দ্ব, নবীন লীলা। স্বদেশী-বিদেশী প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আত্মনেপদী-পরস্মৈপদী ধাতু ও ক্রিয়া: মধুসূদন থেকে ইদানীন্তন পর্যন্ত।

কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

প্রাচীন বাঙলা কাব্যের আঙ্গিক

বাংলা সাহিত্যের পথচলার শুরু চর্যাপদকে দিয়ে। কিন্তু তার সনেটীয় গীতিময়তা পরবর্তীকালের কাব্যে আবছা হয়ে এলো; আখ্যায়িকার আকার-লাভের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। চর্যা ছিল সর্বভারতীয় ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যকৃতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যাদি বাঙলার নিজস্ব সাহিত্য। তাই এর আঙ্গিকও হল স্বতন্ত্র।

১৩শ-১৪শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপে জাগরণের সূত্রপাত, ভারতে এর কাছাকাছি সময়ে, বাঙলাদেশে হুসেনশাহী আমলে। গুপ্ত যুগ থেকে আর্য-আর্যেতর সংস্কৃতির মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলে আসছিল বঙ্গভূমির বুকে, সংঘাত-মাধ্যমে তা একটা নতুন রূপ নিল এই সময়েই। পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন ও কৌম চেতনা পরস্পরের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করল, তার মিলমিশে দেখা দিল জীবনে ও মননে নতুন রূপ নবীন ভাবনা। উচ্চবিত্ত ও লোকায়ত সংস্কৃতির দ্বন্দ্বজনিত নৈকট্য যে ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি করল, তাকে ধারণ করার জন্যে চর্যাপদ-অনুসৃত আঙ্গিকে আর চলল না। নতুন ধ্যানধারণাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল নতুন প্রকাশভংগিকে। এবং সেই নব্য প্রকাশরীতিই নবজাগ্রত কবিমানস ও সাহিত্যকে নিয়ে চলল এক শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দীতে। পূর্বগামী খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতা সুসমঞ্জস আখ্যায়িকার রূপ নিল ১৪শ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। পূর্ণরূপ নয়, পদক্ষেপ। সমকালীন লোক-গীতিগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আদিম উপপুরাণ ও ব্রতের কথা-অংশও তার অনুসঙ্গী ও সহায়িকা।

অতঃপর বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে নতুন আঙ্গিকটি বিবর্তিত হতে থাকল এবং পূর্ণরূপ নিল ছয়টি অঙ্গের সমাহারেঃ বন্দনা, দিগবন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তি বা আত্মপরিচয়, সৃষ্টিপালা, পৌরাণিক খণ্ড, মানবখণ্ড। বন্দনাংশে ইষ্ট এবং অন্যান্য জনপ্রিয় দেবদেবীর বন্দনা তথা রূপগুণের অনুধ্যান করা হত। দিগবন্দনায় থাকত বিভিন্ন তীর্থের বর্ণনা ও উদ্দেশে প্রণাম। আত্মপরিচয় অংশে

গ্রন্থরচনার কারণ ও সেই সূত্রে কবির আত্মপ্রকাশ-বিবৃতি। সৃষ্টিপালায়—আদিদেব ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাণী থেকে দেবমণ্ডলী পৃথিবী জীব ও মানবসৃষ্টি। স্বর্গখণ্ডে স্বর্গে দেবদেবীর জন্ম, বিবাহ, লীলা প্রভৃতির দৈবকাহিনী। মানব বা মর্ত্যখণ্ডে—পৃথিবীতে ইষ্ট দেবদেবীর পূজাপ্রচার ও সেইসূত্রে মানবিক জীবনী ও চরিত্রের বস্তু-অনুগামী চিত্রসন্নিবেশ। এই ছয়টি অঙ্গ মিলে বাংলা কাব্যের পূর্ণ আঙ্গিক। বলা বাহুল্য, হঠাৎ অথবা কোন-একজনের চেষ্টাতে এই আধার গড়ে ওঠেনি। বহুকাল ধরে বহুজনের চেষ্টাতেই তবে 'এব সম্পূর্ণতা সম্ভবপর হতে পেরেছে। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিবর্তনবাদ প্রযোজ্য। সেই নিয়ম অনুযায়ী প্রথমদিকের রচনারীতি স্বভাবতই শিথিল বিক্ষিপ্ত ও রুক্ষ। কিন্তু যতোই অগ্রগতি, ততোই সুন্দরতা সৌষম্য সংহতি, অবশেষে একটি সমঞ্জসা পরিণতি। আর, একবার যখন সেই আধার তথা আঙ্গিক গড়ে উঠল, তখন সেই পথই হল রাজপথ। পরবর্তীকালের সাহিত্যরথ গড়িয়ে চলল সেই পথ ধরে বিনাদ্বিধায় বিনাপ্রশ্নে। ফলে, ভংগি ও রীতি আরো উন্নত ও সংযত হল, সাহিত্যও দৃঢ়তা পেল; আবার সেই সঙ্গেই বাঁধাপথ সাহিত্যের বিচরণভূমিকে ক্রমে ক্রমে সংকুচিতও করে আনল, যতক্ষণ না নতুন ভাব আবির্ভূত হল নতুন আঙ্গিককে সঙ্গে নিয়ে।

মঙ্গলকাব্যগুলির আঙ্গিক এবং তৎ-বিধৃত কাহিনীগুলি অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। সে-আলোচনা কবব না। কিন্তু সদ্যোক্ত অঙ্গগুলির প্রথম পর্যায়ের কিছু দৃষ্টান্ত দেবো, যেগুলি সদ্য-আবির্ভাবেব অপটুত্বের পরিচয় বহন করছে, যেগুলি এই পদ্ধতির পূর্বগা, যেগুলি ছড়িয়ে আছে শূন্যপুবাণের প্রাচীন অংশে, গাজনগম্ভীরার গানে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোকগীতির মধ্যে।

প্রথমে বন্দনাংশ। 'শূন্য পুরাণের' সূচনাতেই যে বন্দনা থাকার কথা, তা আছে পরে 'স্থাপনডাকে', 'কৈলাস ছাড়িয়া গোসাঞি করহ গমন।...ঝাঁট করি আইস ধর্ম দেবের দেবরাজ'। এর নমস্ক্রিয়াকেও বন্দনারূপে ধরা যায়—'নকারে নমো নিরঞ্জন। অকারে নমো বস্তা। নকাবে নমো বিষ্ণু। অকারে নমো মহাদেব। সঅ নামে সিবসক্তি'। ধ্যান ও নিরঞ্জনাষ্টকও এই জাতীয় রচনা। গম্ভীরায়:

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়া শিবের গম্ভীরা বন্দ।
আর বন্দ সরস্বতীর গান।
বাসুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম।

আদিমদের উৎসবেও এভাবে আবাহন জানান হয়েছে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে। ওরাওঁরা নাচের সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে :

মহাদেও বাবাসি আরোজি চেলা—
ধ্যানিম আনো চেলা, গ্যানিম নামা।
হে ধরতি পিরথী বাবা হোয়
লামে লামে চিখন লগদম বাবা ওলবাণ লাগদম।

—মহাদেব বাবার চেলা আমরা। ধ্যানে আনো তাঁকে, মননে আনো। হে ধরিত্রী পৃথিবী বাবা, আমরা বিলাপ ও ক্রন্দন করতে করতে তোমাকে নাম ধরে আবাহন করছি।

এই গানের মহাদেব ও ধর্মতত্ত্বটুকু অবশ্য আর্যগন্ধী, কিন্তু বন্দনার পদ্ধতিটি কৌম মানসের নিজস্ব।

দিগ্‌বন্দনা। বাংলা কাব্যে প্রথম দিগ্‌বন্দনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। কৃষ্ণের হাত থেকে রেহাই পেতে রাধা বলে—'কে না পূজিল বদরি বটেশ্বরে'। 'ধর্মপুজাবিধানে' 'বারানসীপুর'কে স্তুতি জানানো হয়েছে। মালদহের গম্ভীরায় : দক্ষিণে জগন্নাথ, উত্তরে ভাণু, পুবে কামরূপ কামিখ্যা ইত্যাদির বন্দনা। আদিম কোমদের মধ্যে তীর্থস্থান বলে কিছু থাকেনা, দেব-দেবীর 'থান্' থাকে মাত্র। কিন্তু তার কোন মাহাত্ম্যবিবৃতি সাধারণত চোখে পড়েনা। তবে বৌদ্ধ প্রভাবিত শূন্যপুরাণে 'দ্বারপালবন্দনা' পাওয়া যায় ; তীর্থবন্দনা তার ক্রমপ্রসারিত রূপ। এও বলা যেতে পারে, এই দিগ্‌বন্দনা পুরাণ থেকে বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। তাই প্রথমদিকের রচনায় পৌরাণিক ও বহির্বাঙলার তীর্থগুলির নামতালিকা পাওয়া যাচ্ছে। ক্রমে পৌরাণিক সংস্কৃতির স্পর্শে বাঙলাতেও 'তীর্থ' গড়ে উঠতে থাকে। লৌকিক দেবদেবীরা, যাঁরা নিজ নিজ থানে পূজিত হতেন, তাঁরা ক্রমে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেন, 'থান্' হল তীর্থ। তারকেশ্বর-বৈদ্যনাথ-চন্দ্রনাথ এই বিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এঁদের প্রতিষ্ঠাকাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থ বিদ্যমান ; তা থেকে এগুলির তীর্থে পরিণতির সুন্দর ইতিহাস মেলে। এবং বাঙলাদেশে যখনই নিজস্ব তীর্থ গড়ে উঠতে লাগল, বাঙালী কবিরা তখনই বদরিনাথ-কাশীনাথকে ছেড়ে এঁদেরই বন্দনা করতে শুরু করে দিলেন। বরিশালের গীতে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ক্ষীর নদীসাগরের বন্দনা ; রাঢ়ের গম্ভীরাগানে পুরাণকীর্তিত তীর্থগুলির সাথে আন্ধের তুলসী, আরুঢ়ের বৈদ্যনাথ প্রভৃতির বন্দনাও যুক্ত হতে লাগল। ক্রমে, পুরাণভাব গেল সরে, বাঙলার

মন্দিরাদিই হয়ে উঠল একমাত্র বন্দনীয়। ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী এই বাঙালিয়ানার সুন্দরতম উদাহরণ।

সৃষ্টিপালা। প্রাচীন বাংলা কাব্যে এই একটিমাত্র অঙ্গ, যা প্রথম থেকে পূর্ণরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিবর্তন যা হয়েছে, সে কেবল তত্ত্বের, মূল কাঠামো অর্থাৎ প্রকাশরীতিটি শুরুতেই সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। শূন্যপুরাণে ও বৌদ্ধ প্রভাবিত সাহিত্যে তাই সহস্র শিথিলতা সত্ত্বেও সৃষ্টিকাহিনীটি সামঞ্জস্যময়: আদিতে সবই ধুন্ধুকার ছিল; তারপর জাগলেন নিরঞ্জন, বাহন উলুকের সাহায্যে সৃষ্টি করলেন পৃথিবী; হংস কূর্ম প্রভৃতিও সহায়তা করল; আদিদেবের থেকে আদ্যাশক্তি, এঁদের দুজন থেকে তিনদেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য জীব ও মানবগোষ্ঠী। মালদহের গম্ভীরায় আদিম কৌম ধারনা প্রভাব বিস্তার করেছে: কাঁকড়ার আনীত মাটিতে বসুমতীর জন্ম ও কূর্মপৃষ্ঠে অথবা পদ্মের ওপরে স্থিতি; তারপর মাটি, জীব ইত্যাদির আবির্ভাব। পূর্ণায়ত মঙ্গলকাব্যে পুরাণের আশ্রয়ে সৃষ্টিপালা বিবৃত: আদিদেব নিরঞ্জন ব্রহ্ম থেকে শক্তি, তা থেকে মহত্ত্ব অহংকারাদি, দেবতামণ্ডলী, সবশেষে মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব। তন্ত্রের প্রভাবে, আদিতে যিনি সৃষ্টি করেন তিনি প্রকৃতি বা আদ্যাদেবী বলে কীর্তিতা হয়েছেন। কোন কোন কাব্যে আবার এইসব বিভিন্ন ধারণার সংমিশ্রণও ঘটেছে। এমনকি, পরবর্তী কালে ইসলামিক সৃষ্টিতত্ত্বও এর অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। আলাওলের পদ্মাবতী তার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ।

শত ব্যবধান সত্ত্বেও বিভিন্ন সৃষ্টিপালাগুলি প্রায় একই ধরণের। তবে, একদল মনে করে, মাটি (প্রভৃতি বস্তু) থেকে জীবের আবির্ভাব; আর একদল মনে করে, এক ঈশ্বর সকলের স্রষ্টা। বিভিন্ন দেশের পুরাণ থেকে এ-ধরণের অজস্র কাহিনী উদ্ধৃত করা যেতে পারে, এবং এগুলি প্রায় সমানধর্মা। তাই চড়কের মহাদেবকে খ্রীস্টিয় রীতিতে 'বাবা আদম্' বলে সম্বোধন করতে গাজুনে সন্ন্যাসীদের আদৌ বাধেনা। সব সৃষ্টিকথার আদিতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, এক নিরঞ্জন আদিদেব সবারই স্রষ্টা। যারা মাটি থেকে সৃষ্টি বলে মনে করে, তাদের তত্ত্বকথার সঙ্গে স্রষ্টা-বাদীদের সংযোগ হওয়াও তেমন কিছু অসম্ভব নয়। বাংলা কাব্যে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র মাণিকদত্ত সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতির রচনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর ঠিক এইজন্যেই বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে যখন অন্য কোন অঙ্গের পুষ্টি হয়নি, তখনও সৃষ্টিপালাটিই ছিল ঐক্যসূত্রে বিধৃত সুসমঞ্জস ও সুশৃংখল। একদিকে আর্য ভাবনাজগতের সৃষ্টিপালা কৌষিতকী ও

শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে প্রায় তাবৎ পুরাণে ছড়িয়ে ছিল, অন্যদিকে কৌম উপপুরাণের আদিতেই সৃষ্টিকাহিনী স্থান পেয়ে আসছিল; মধ্যে বৌদ্ধ-শাক্ত-তন্ত্রের সৃষ্টিপত্তনকথা বাঙলার মানস ও মননকে আলোড়িত করছিল। এসবেরই প্রভাব পড়েছিল সেদিনকার বাংলা কাব্যে। প্রথম দিকে কৌম প্রভাব, মাঝে পুরাণ, শেষে তন্ত্রের প্রাধান্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ব্রতকথায় সৃষ্টিপালার স্থান আদৌ নেই; যেটুকু আছে, তাও পরবর্তী কালের প্রভাব।

আত্মপরিচয় অংশটির ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা। বাংলা কাব্যের প্রথম স্তরে এই আঙ্গিকটির আদৌ কোন প্রাধান্য ছিল না, যেমন পুরাণে নেই, গম্ভীরার গানেও নেই। নাম বা ভণিতা অবশ্য চর্যাপদের কাল থেকেই মেলে। কিন্তু শূন্যপুরাণে এবং ধর্মমঙ্গলে রামাই প্রভৃতি ধর্মপণ্ডিতের জীবনকথাই বোধহয় বাংলা কাব্যের প্রথম কবি-পরিচিতি বা 'গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ'। তারপর ক্রমে ক্রমে এই আঙ্গিকটি পুষ্টতর হতে থাকে এবং মঙ্গলকাব্যের একটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে ওঠে।

স্বর্গখণ্ড বা পৌরাণিক খণ্ডের ছবিও এই সমস্ত সাহিত্যে বিদ্যমান এবং মর্ত্যখণ্ডের চেয়ে তার প্রাধান্যই বেশি। শূন্যপুরাণে আদিদেব যোগসাধনায় রত হবার আগে গঙ্গাকে 'নিরিসন্' (নিদর্শন) দিয়ে গেলেন পুত্র তিনজনকে দেবার জন্যে; ওদিকে তিন দেবতা ধর্মের উপাসনা ক'রে এবং শেষ পর্যন্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে পৃথিবী ও জীব সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হলেন। নাথসাহিত্যের প্রাচীন গাথাতে শিব জলটুংগীতে বসে পার্বতীকে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শোনান; আদিসিদ্ধা চারজন মাছ হয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে তা শুনে নেয়; তাদের অলৌকিক সিদ্ধির পরীক্ষা নিতে পার্বতী ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন; একমাত্র গোরক্ষনাথ ভিন্ন আর তিনজন সে-ছলনায় ধরা পড়ে ও নির্বাসিত হয়; এর পরও পার্বতী গোর্খকে আবার পরীক্ষা করতে যান এবং শেষ পর্যন্ত তার কাছে পরাজিত হন এ-দুটি কাহিনীই সম্প্রদায় দুটির নিজ নিজ ধর্মতত্ত্বের আওতায় রচিত, এবং সে তত্ত্ব একদিকে যেমন বৌদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি কৌম। ব্রতকথায় স্বর্গের আভাস থাকলেও লীলা নেই; গাজনের গানেও নিজস্ব কোন দৈবকথা বিবৃত হয়নি। সমুদ্রমন্থন, পারিজাত হরণ, বাণরাজার কাহিনী প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-ওখানে গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যের স্বর্গখণ্ড পুরাণ-প্রভাবিত, কৌমদের স্বর্গীয় কথা সেখানে সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য হয়েছে; গম্ভীরাগীতিতে তারই আভাস।

প্রাথমিক কাব্যপর্যায়ে মানবখণ্ডের স্থান তেমন নেই; তবে যেটুকু আছে, তা বস্তু-অনুগামী। চড়কের গানে দেবতা মর্ত্যে নামেন, কপিলা গাভীও। শূন্যপুরাণে শিব বল্লুকার তীরে তপস্যা করেন আর চাষ করেন ভীমের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে। শিবায়ণের চাষ-পালা অংশটি একান্তভাবেই মর্ত্যকাহিনী এবং বাঙলার হতদরিদ্র চাষীগৃহস্থের একটি সজীব ও সত্য চিত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পনেরো আনা অংশই তো মানবিক কাহিনী ও রসে ভরপুর। মঙ্গলকাব্যগুলিতে চাষপালা পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে শিবদুর্গার গার্হস্থালী ছবি দিয়ে। দরিদ্র ভিখারী শিবের তরুণী ভার্যা ও বহুবচনান্বিত পরিবারে নাজেহালের কাহিনী নতুন করে বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখেনা।

এছাড়াও মঙ্গলকাব্যে আছে চাঁদ সদাগর কালকেতু ধনপতি শ্রীমন্ত বিদ্যাসুন্দর লাউসেন প্রভৃতির কাহিনী—যারা মাটির মানুষ, স্বর্গীয় দেবতা নয়, যদিও দৈবশক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হতে হয়েছে তাদের। প্রাথমিক কাব্যসরণিতে এ-ধরণের কোনো কাহিনীর সাক্ষাৎ মেলেনা, যেটুকু আছে তাও পুরাণ প্রভাবিত। অবশ্য সদ্যোক্ত কাহিনীর মধ্যেও পুরাণপ্রভাব আছে, মন্বন্তরাদির বর্ণনা যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে, দেবীর পূজা প্রচারের ও মহিমা প্রসারের জন্যেও বহু কথার সৃষ্টি হয়েছে, বহু লৌকিক কাহিনীকে গ্রহণ করতে হয়েছে। শেষত, দেশপ্রচলিত বহু উপকথা-রূপকথার প্রভাবও এর পশ্চাতে বর্তমান। সাঁওতাল ওরাওঁদের উপপুরাণ, উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন লৌকিক আখ্যায়িকাগুলিই শেষ দুইটি কারণের প্রমাণস্বরূপ। কিন্তু অতোদূরে যাবার দরকার কি? আমাদের ঘরের মধ্যেই রয়েছে, মেয়েদের ব্রতকথা', যার আদিমধ্যঅন্ত মর্ত্যখণ্ডের কাহিনীতে মানবরসে পূর্ণপাত্র হয়ে টলটল করছে। আর এইসব ব্রতকথার ঝাঁপি থেকে গল্প সংগ্রহ করেই যে গড়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের কথাশরীর, রবীন্দ্রনাথের সত্যসুন্দর আলোচনার পর সে-তথ্য নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

এই হল প্রাচীন বাংলা কাব্যের আঙ্গিকের ষড়ঙ্গ। প্রাচীন বাংলা কাব্যের এই আঙ্গিক সম্বন্ধে প্রচলিত মত, ওটি পুরাণ লক্ষ্মণাক্রান্ত। সিদ্ধান্তটি আধাসত্য, সম্পূর্ণ নয়।

পুরাণের লক্ষণ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরানি চ।

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ (বরাহ, ২য় অঃ)

—সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর ও চরিতাখ্যান, পুরাণের এই পঞ্চলক্ষণ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাংলা কাব্যের লক্ষণ ছয়টি। এবং আত্মপরিচয়কে বাদ দিলে বাকী পঞ্চাঙ্গেও পুরাণকে যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি। বন্দনা—দিগ্‌বন্দনা—স্বর্গখণ্ড ও মানবখণ্ড পুরাণেও আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে যেভাবে সেগুলিকে সাজানো হয়েছে, তা তার নিজস্ব। কোনটির পর কোনটি থাকবে এবং কিভাবে থাকবে—সে পরিকল্পনা বাঙালী কবির স্ব-কৃত। পুরাণ তাকে পথ দেখিয়েছে, বাকীটুকু তার নিজেরই সৃষ্টি। তাছাড়া, পুরাণকথা নিজেই বিশৃংখলায় পরিপূর্ণ, তার অঙ্গ-সজ্জা বিপর্যস্ত, লক্ষণগুলি অবিন্যস্ত; সে-হিসেবে বাংলা কাব্যের আঙ্গিক নিখুঁত ও সুবিন্যস্ত। অপিচ, পুরাণে বংশ ও চরিতাখ্যান যেভাবে বিবৃত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যের মানবখণ্ডের অন্তর্গত কথাগুলি মোটেই তার সমগোত্রীয় নয়। একটি ইতিহাসমালা, অপরটি সাহিত্যপদ্ম—যদিও সে রচনা দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথনে পঞ্চমুখরিত। এদিক থেকে সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রভাবও কম কার্যকরী হয়নি। তার ওপর, বাংলা কাব্যের ষড়ঙ্গ আঙ্গিকের উপাদান ছিল তার ঘরের মধ্যেই। কৌম উপপুরাণে উক্ত লক্ষণগুলি অস্পষ্টভাবে হলেও অবশ্যই সুলভ।

আদিতে দেবতার রূপগুণ বর্ণনা ও আবাহণ করে কথারম্ভ; কথার শুরুতে সৃষ্টিপত্তন; তারও পরে, বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে সংঘর্ষ ও একের পরাজয়ে অপরের বিজয়। লুশাই-কুকীদের গানে স্বর্গ-নরকের একটি সুন্দর ছবিও দেওয়া আছে; পিয়াল-রাল, সেখানকার বৈতরণী নদী। মানবখণ্ডও কৌম কথামালায় বিদ্যমান। দেবতারা মর্ত্যে নামেন, লীলা করেন, ধান্যাদি শস্য ও মনুষ্যাদি জীব সৃষ্টি করেন; আদি নরনারী—ভাইবোন। এমন কি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের ব্যবস্থাও এসব কাহিনীতে বিদ্যমান। তারপর দিক বন্দনা ক'রে নৃত্যগীতারম্ভ। ওঁরাও সাঁওতাল কোচ বোদো মুণ্ডা গোণ্ড এবং বাউড়ী বাগ্দী কেওট চামার প্রভৃতিদের মধ্যে এ ধরণের কাব্যকথা কোন-না-কোন আকারে আজও বিদ্যমান।

সুতরাং মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক-রচনায় বাঙালী কবিদের বাইরের শাস্ত্রের কাছে দেউলে হয়ে হাত পাততে হয়নি। তবে প্রভাব যে পড়েছে তা অনস্বীকার্য। একদিকে যেমন বৌদ্ধ সৃষ্টিভাবনা ও জৈন মূর্তিকল্পনা এবং এদুটি ধর্মমতের দেবদেবীর স্বর্গমর্ত্যলীলার ছায়া পড়েছে বাংলা কাব্যে, তেমনি পঞ্চলক্ষণান্বিত পুরাণের স্পর্শও লাভ করেছে। কিন্তু অন্ধ অনুকরণ হয়নি।

যতগুলি ধর্মমত প্রচলিত ছিল, সকলের মিশ্রণের সুন্দর পরিচয় আছে সৃষ্টিপত্তনে। তাই এর স্থান তৃতীয়, সিন্‌থেসিস্ বা সমন্বয়ের দ্যোতকরূপে। অন্য অঙ্গগুলি বাংলা কাব্যের সব বিভাগে পাওয়া যায়না (যেমন বৈষ্ণবপদে স্বর্গ ও মর্ত্যখণ্ড অভিন্ন), কিন্তু সৃষ্টিপত্তন সর্বত্র বিদ্যমান। আত্মপরিচয়-কথা সব কাব্যে দেখা যায়না, আগেই বলেছি। পরে যখন এসেছে, তখন তারই স্থান তৃতীয়। কেন, কবিমানসের সদ্যোক্ত আলোচনা থেকেই তা স্পষ্ট হবে। বাঙালীর আত্মচেতনা-উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই সমন্বয় চেষ্টা জেগে উঠেছিল সচেতনভাবে। অবশ্য জনগণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সমাহার, তা অনেকটাই অজ্ঞাতসারে। তাই কথা-শরীরের সঙ্গে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণের সম্পর্ক প্রায়-শিথিল। আর এই নবজাগ্রত অনুভূতিটিকেও সেদিনের বাঙালী ভালভাবে ধরতে পারেনি বস্তুজাগতিক কারণেই। তাই কবিপরিচিতি আত্মজীবনী হওয়ার চেয়ে দেবদেবীর মহিমা কীর্তনের দিকেই ঝোঁক দিয়েছিল বেশি, স্ব-আত্মাকে পরমাত্মার আশ্রয়ী করে তুলেছিল। শেষ দুই বিভাগে মানবিক রসের প্রাধান্য। কিন্তু সেখানেও আর্য-অনার্য ভাবনার দ্বৈত লীলা। স্বর্গখণ্ডে পুরাণকথার প্রাধান্য, মর্ত্যখণ্ডে পৃথিবীকথার। যদিও মানবিকতাবোধের দিক থেকে স্বর্গ ও মর্ত্যে ব্যবধান তেমন আকাশপাতাল ছিলনা ; যেমন, দ্বন্দ্বসত্ত্বেও এক সুতোর বেশি পার্থক্য ছিলনা সেদিনকার বাঙালীর উচ্চ সংস্কৃতি ও লৌকিক সংস্কারের মধ্যে।

ব্যবধানকে স্বীকার করে নিয়েও সমূহিক মিলমিশের এই যে বোধনা প্রাচীন বাংলা কাব্যে রূপলাভ করেছিল, তারও মূলে তার আঙ্গিক। মধ্য যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও কাব্য-গোষ্ঠীর মধ্যে যতোই সাম্প্রদায়িকতা থাকুক না কেন, দেবদেবীর মধ্যে শক্তিলাভের প্রতিযোগিতা যতোই প্রকট হোক না কেন—এই একটি মাত্র আঙ্গিকই ছিল সব কাব্য-ধারার সবেধন নীলমণি। আর তারই ফলে তাবৎ কাব্য শতযোজন ব্যবধান সত্ত্বেও হয়ে উঠেছিল সমগাত্রীয় সমাস্বাদ্য সমন্বিত। মনসার কাহিনী বলতে উঠে চণ্ডীর বন্দনা, ধর্মের প্রতাপ প্রচার করতে গিয়ে শিবের অনুধ্যান, দ্বৈতলীলার বর্ণনায় অদ্বৈতের ইঙ্গিত, দেবতার নামে মানবকথারসের পরিবেষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অসহ্য বা অবান্তর মনে হয়নি। এমন কি, ইসলামী ও খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বকেও অনায়াসে এর অঙ্গীভূত করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে ; একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। নিরাকার আল্লাহ্ এসেছেন নিরঞ্জন ব্রহ্মের পাশে, সবাহন শিববিষ্ণু বিনাবাধায় প্রবেশ করেছেন বেহেস্তে ইসলামী কাব্যে। মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র তার ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী।

কিন্তু সমাজ যেমন স্থাণু নয়, গতিশীল, সাহিত্যও তেমনি। সাহিত্যের ভাবান্তর হয়, সেই সঙ্গে আঙ্গিকেরও রূপান্তর ঘটে। বাঙলার ষট্‌পদী আঙ্গিকও নিজ কর্তব্য সমাধা করে এক সময়ে গতাসু হল। বেজে উঠল পদাবলীর ঝংকার। মঙ্গলকাব্যের কথারস আর বৈষ্ণব কাব্যের গীতিরস নিয়ে হল শাক্তপদের সৃষ্টি। সমাজ গতানুগতিক পথ ধরে যেখানে এসে পৌছল, সে এক ক্রান্তিকাল। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, নতুনের অদর্শন, জীবন হল আবিল, সাহিত্য পংকিল; আর বাংলা মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়, পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল কণায় কণায়। বাংলা পদকে ভেঙে কবিগান, তর্জা, আখড়াই ইত্যাদি দেখা দিতে লাগল। যে লিরিক দিয়ে প্রাচীন বাংলা কাব্যের আরম্ভ, সেই লিরিকেই এসে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল সে। মধ্যের কটা দিন কেটে গেল কথা ও কাহিনীতে।

তারপর আধুনিক বাংলা সাহিত্য। নতুন ভাবের জোয়ার, আঙ্গিকেরও পালাবদল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, রূপান্তরের সেই সনাতনী চক্র। অভিন্ন আঙ্গিক যেমন প্রাচীন কাব্যে সাম্প্রদায়িকতাকে উগ্র হতে দেয়নি, তেমনি ব্যক্তিচেতনাকেও উদ্বুদ্ধ হতে দেয়নি। তাই তা হয়ে উঠেছিল গতানুগতিক পল্লবগ্রাহী একঘেয়ে। আধুনিক যুগের নবজাগ্রত ব্যক্তিক-সামাজিক ধ্যানধারণা এই পুরাতনী বেড়ী ভেঙে বেরুতে পেরেছিল বলেই আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, বাইরে থেকে ঘরে-আসা বন্যাকে নতুন বাঁধ দিয়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। নতুন ভাবনা নতুন আঙ্গিককে সঙ্গে নিয়েই দেখা দিল। তাই-ই স্বাভাবিক। পুরাতন কলাকৌশলে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতে গেলে সেদিন ব্যর্থ হতে হত ১৯শ শতাব্দীর কবিসাহিত্যিকদের; তা সম্ভবও ছিলনা। আধুনিক সংস্কৃতির এইখানেই আধুনিকতা, সবযুগের সবসংস্কৃতির প্রগতিশীলতাও এইখানে।

চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী

সে এক আশ্চর্য ইতিহাস! রূপকথা আর রোমান্সের চেয়েও রোমাঞ্চকর, উপন্যাস আর গল্পের চেয়েও মনোহারী। সেই হাজার হাজার বছর আগের মানুষ কিভাবে প্রকৃতি আর পরিবেশের সঙ্গে কব্‌জির লড়াই সুরু করেছিল, তাদের আয়ত্তে এনে শান্ত ও জয় করতে চেয়েছিল, অমিত্র প্রতিবেশে মেটাতে চেয়েছিল দেহমনের স্বাভাবিক ক্ষুধা! জীবনসংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজনে তারা কর্মক্ষেত্রে কল্পনা করেছিল প্রমথ-প্রমথিনীর, যাদুবিদ্যার, নাচগান ব্রতানুষ্ঠানের; তাদের মাধ্যমে ও সহায়ে আশা রাখত কর্মসাফল্যের, শস্য-শিশু-পশু সমৃদ্ধির। অনেকদিন পরে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির ফলে একদল মানুষ সরে আসতে পারল কাজের মাঠ থেকে, স্বল্প পরিশ্রমসঞ্জাত অবকাশকে ভরিয়ে তুলল ধর্ম ও সাহিত্য, শিল্প ও নাটকাভিনয় দিয়ে। দেবদেবীর পূজা তখন পার্থিব উন্নতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, আধ্যাত্মিকতার অভিমুখী, মানসিকতার অভিসারী, ধর্ম দর্শন ও সাধনতত্ত্ব। তারও পরে, ধর্মকে আশ্রয় করে ও পাশ কাটিয়ে দেবদেবী হলেন শিল্পের মডেল, কাব্যের নায়ক-নায়িকা, দৈব কথা হল রসাত্মক, একেবারে শেষে তাঁরা জীবনদর্শন।...এই হচ্ছে সংস্কৃতির পালাবদলের ইতিহাস। তার মধ্যে কতো দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, আবর্তন ও বিবর্তন, পিছিয়ে আসা ও এগিয়ে চলা। নানাদিক থেকে নানা উপাদানের সহায়ে এই বিস্ময়কর রূপান্তরের ইতিবৃত্তের ছবি আমরা এঁকে নিতে পারি, তার সবটাই আবছা নয়। কিন্তু সেই রূপ-বিবর্তনের পাশে দাঁড়িয়ে যদি ছবিগুলো প্রত্যক্ষ দেখা যেত! যদি চোখের সামনে দুলে উঠত সেই ময়ূরকণ্ঠী স্রোতের নানারঙের ঢেউগুলি!

পাল আমল পর্যন্ত বাঙলার সংস্কৃতির আকাশে নানান্ দেবতা ও ধর্মের ভীড়। কিন্তু ভীড়ই! ধাক্কাধাক্কি নেই, এর ওকে আঘাত করা নেই: যেন এক আকাশ তারা। সকলেই আছে, চলছে পাশাপাশি নিজ নিজ পথে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ, আলো দেওয়া-নেওয়া আছে; কেউ থেমে

যাচ্ছে মাঝপথে, ফুরিয়ে যাচ্ছে, কেউবা নতুন জন্ম নিচ্ছে। সবই নিজে-নিজেই।

এ অবস্থা বেশীদিন চলল না। সেন যুগে নতুন হাওয়া-বদল, ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হল রাজধর্ম, বৌদ্ধধর্ম সরে আসতে বাধ্য হল রাজসভা থেকে; জনসভাব, জনস্রোতে তার যে ধারাটি বহমান ছিল, এবার জোর পড়ল সেখানে। আত্মপ্রসারণের তাগিদে ব্রাহ্মণ্যধর্মও এল লোকায়তের বিস্তৃত আসরে। প্রতিঘাত থেকে মিলমিশ। কিন্তু মিশ্রণই, সমন্বয় নয়। তুর্কী বিজয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নবাবী দরবারের সমাদর হারাল; এবার তাকেও সরে এসে মিশতে হল জনতার দরবারে সবার সাথে; গৃহরক্ষার বাসনাও তাকে জনসমাজে উত্তীর্ণ করে দিল। সুরু হল দেবদেবী ধর্মকর্ম কথাকাব্যের সংঘাত, গ্রহণ-বর্জন এবং তার পরিণতিতে সমন্বয়ের সূচনা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বাঙালী সংস্কারের নেতৃত্ব পেল, লোকায়ত সংস্কৃতি পেল অভিজাত স্বীকৃতি। এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফলে বাঙলাব নিজস্ব কৃত্যের দেবতার প্রচার প্রসার উজ্জীবন উদ্বর্তন। তাঁদের ঘিরে যে সব গ্রাম্য কথা ছড়িযে ছিল, সেগুলিকে প্রসাধিত ও প্রসারিত করে নিয়ে আসা হল আখ্যান-কাব্যে; পুরাণাদি থেকেও সংগৃহীত হল অনেক আখ্যান; কোথাওবা একেবারে নতুন কথার ধারাপাত। ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র, মনসার ধন্বন্তরী, চণ্ডীর মঙ্গলদৈত্য ইত্যাদি আদি কাহিনী ক্রমে ক্রমে অপসারিত হল; সে জায়গায় স্থান নিল চন্দ্রধর শ্রীমন্ত ধনপতির দল।

এইভাবে বহুর সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ কবল বাঙলার সংস্কৃতি; পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে তার স্বাক্ষর ফুটে উঠল কাব্যে-শিল্পে। তার একদিকে অভিজাত, অন্যদিকে লোকাযত সংস্কৃতি, মধ্যভাগে সমন্বিত সংস্কৃতি—মূলত কাব্য যার বাহন। কিন্তু অখণ্ড হলেও নির্দ্বন্দ্ব নয। মঙ্গলকাব্যের কথাশরীরে দেবতায-দেবতায় বিবাদ ও শক্তিপরীক্ষা। চাঁদ ও ধনপতি শৈব সদাগব, তাঁদের সঙ্গে বিবাদ মনসা ও চণ্ডীর; ব্যাধ কালকেতু রাজা হয়ে ভুলে যায় দেবীকে। অন্যদিকে, লৌকিক দেবতার নিষ্ঠাবতী পূজারিণী নারী—সনকা, বেহুলা, খুল্লনা, কর্ণবতী। এর থেকে বোঝা যায়, এই ধর্ম-কলহ সমাজের ওপরতলার ও নীচের তলার সাধ্য-সাধনের এবং মেয়েরাই প্রথম প্রকাশ করেছিল কৌম ধর্মকে। তাই এ কলহ পরুষ আধ্যাত্মিকতা ও ব্রতিনী নারীরও দ্বন্দ্ব। ক্রমে প্রাথমিক সংঘাতেব স্তর পেরিয়ে মিশ্রণ গাঢ় হয়,

উগ্রতা কমে আসে, ঢেউ শান্ত হয় ; জটিলতর ও সুন্দরতর হয়ে উঠতে থাকে মঙ্গলকাব্য—ধর্মে ও সাধনায়, কথায় ও কুশীলবে, ঝংকারে-অলংকারে, সংগীতে আর ভংগীতে, সংঘর্ষে ও সমন্বয়ে।

তাই 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণের ব্যাখ্যা এক নয়, একাধিক। মঙ্গলের দেবতার কথা, মঙ্গল দৈত্যের কাহিনী, শ্রবণে মঙ্গল, মেলার গান, বিবাহের গান, যাত্রা, মঙ্গল সুর, অষ্টমঙ্গলা—এগুলির এক বা একাধিক কারণে এই সাহিত্যকৃতির নাম মঙ্গলকাব্য। দেবতা ও দৈবতত্ত্বেও ওই বহুবচনের লীলা। মনসার রূপে গুণে মনচাম্মা জাংগুলী কাকেতুকা শীতলা ষষ্ঠী কালী উমার সংশ্লেষ ; তাঁর বেহুলা-লখীন্দর কাহিনীর সংগে মেলে মিশরের পিরামিড টেক্‌স্‌ট্‌এর সমজাতীয় গল্পে, অন্যদিকে বাঙলার চাঁদবেনে। ধর্মদেবতা ধর্মেশ সূর্য বিষ্ণু বুদ্ধ, আবার শিবও ; তাঁর পূজাবীতিতে কৌম বৌদ্ধ বৈষ্ণব শৈব শাক্ত তান্ত্রিক প্রলেপ ; তাঁর কাহিনী ইতিহাস ও রূপকথা। চণ্ডী চান্দী চণ্ডিকা কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী গজলক্ষ্মী তারা, আবার ডাকিনী যোগিনী হাকিনীও ; তাঁর কথায় ব্যাধ ও বেনের জীবনী—অভিজাত ও লোকায়ত মানসের মিশ্রণফল। দুই পক্ষই খুশীখুশী।

মঙ্গলকাব্যের ষড়ঙ্গ আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও বহুসঞ্চারী পদধ্বনি শোনা যায়। বন্দনা-দিগ্‌বন্দনা-সৃষ্টিপালা-গ্রন্থোৎপত্তি-স্বর্গখণ্ড-মানবখণ্ডের সর্বত্রই আর্য-আর্যেতর মনন-মানসের যুগ্ম ছায়াপাত ঘটেছে। প্রবন্ধান্তরে তার আলোচনা করেছি। বলাবাহুল্য, উপনিষদের আদিদেব-আদ্যাদেবীও জনগণের অস্পৃশ্যতা বাঁচিয়ে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য শুচিতা বজায় রাখতে পারেন নি।

মঙ্গলকাব্যের সমগ্র কথা-শরীরের দুটি ভাগ—স্বর্গ ও মর্ত্য, দেবত্ব ও মানবত্ব। আকাশ থেকে উপাসনা নেমে এল মর্ত্যে, মানুষের মধ্যেই হল দেবতার প্রতিষ্ঠা। ঠিক তেমনি, মানবতা শুধু পৃথিবীতে নয়, সে অধিকার বিস্তার করেছে অমরাবতীতেও। কাব্যরচনার লক্ষ্য দৈবী মহিমা প্রচার : That a God inspired his soul (Ency. Brit.)—একথা ভোলেন নি কবি কোথাও। তবু কাব্য হল সাহিত্য, ধর্ম নয়। দেবদেবী তার কাছে শৈল্পিক চরিত্র মাত্র। তাই শিব-উমার বিবাহ নিয়ে কালিদাস লেখেন কাব্য, শিব-পার্বতীর প্রেম নিয়ে বিদ্যাপতি লেখেন পদ, দুজনকে ঘিরে দরিদ্র সংসারের কলহমুখরতা ফুটিয়ে তোলেন মঙ্গলকবি। পুরাণে এর সবগুলির আভাস আছে ; কিন্তু তা সাহিত্য নয়, দৈব কথা। মনসাকে কেন্দ্র করে শিব-চণ্ডী-

গঙ্গার বিসম্বাদ বাঙালীর নিজস্ব পরিকল্পনা। ধর্মমঙ্গলে ধর্মদেবতাকে অবলম্বন করে এমন ছবি নেই বটে, আছে শিব-শিবানীকে আশ্রয় করে। শিবায়নে শিবের জীবন যেভাবে চিত্রিত, সেতো মানুষেরই জীবন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এই মানবরসায়ণ গাঢ়তর। তাই কৈলাসের শিব-শিবানী পার্বতীয় দেব-দেবী মাত্র নন, সংসারভারপ্রপীড়িত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের স্বামী-স্ত্রী, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, দরিদ্র গৃহপতির ধনীকন্যা গৃহিণী, অকর্মক কর্তার মুখরা কর্ত্রীকারক।

সংস্কৃতির প্রত্যেক বিভাগেরই আত্মনেপদী স্বাতন্ত্র্য আছে। ধর্মের কক্ষপথ সাহিত্যের নয়। আধ্যাত্মিকতা দেবতা ও দৈবকথা যতক্ষণ মন্ত্র ও প্রার্থনায় আত্মনিবেদিত, ততক্ষণ তারা ধর্মের এলাকাধীন; কিন্তু যখনই তারা সাহিত্যকে আশ্রয় করে, তখনই তাদের বাসাবদল ও রূপবদল ঘটতে থাকে, সাহিত্য সেই ধর্ম ও দেবতাকে শিল্পরূপ দান করতে থাকে স্বকীয় আঙ্গিকের সাহায্যে। ফলে, একদা যা ছিল ধর্মতত্ত্ব, পরে তা পর্যবসিত হয় কথাকাহিনীতে। ধর্ম-সাহিত্যের স্রষ্টা ভক্ত ও সাধক হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবিও। তাঁর অনুভবের সবটাই স্বর্গীয় নয়, তাতে মর্ত্যের ধুলোমাটির স্পর্শও থাকে, এবং প্রচুর পরিমাণেই থাকে। তাই দৈবীকাব্যে পাই মানবিক সুখদুঃখের আলোআঁধি, পার্থিবতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। স্বর্গের দেবতা, তাঁদের লীলা ও তত্ত্ব—এই নিয়ে ধর্মকথা; স্বর্গের অধিবাসী মর্ত্যে এল বা মর্ত্যের নরনারীর মাধ্যমে প্রচারিত হল দেবতার মহিমা ও পূজা—এই হল পাঁচালী ও ব্রতকথা। কিন্তু মঙ্গলকাব্য ধর্মত্ব সত্ত্বেও সাহিত্য, পাঠে মঙ্গল ও আনন্দ। তার শাপভ্রষ্ট দেবতা-গন্ধর্বের চোখে পড়ে পৃথিবীর আলো, মনে জাগে রঙীন আবেশ, তাদের অন্তরে-বাহিরে ফুটে ওঠে বাস্তবের সজীব মানুষ, মাটি-ঘেঁষা ভাবনাচিন্তার সুখে-দুঃখে তারাও বিচলিত হয়, হাসে কাঁদে, লড়াই করে ও আঘাত পায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কালকেতু-ফুল্লরা দেবীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি, তথাপি নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র নয়; তাদের পাই সাধারণ মানুষের মতই ব্যথা ও বেদনায়, আনন্দে ও শোকে।

তাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত কবিকঙ্কণ চণ্ডীও আখ্যানকাব্য। ঘটনা ও চরিত্রের যে বাঁধুনী ও দ্বান্দ্বিক বিবর্তন গদ্যে উপন্যাসকে সম্ভাবিত করে, তাইই পদ্যে নাম নেয় আখ্যানকাব্য। বস্তুজীবনের তথ্য ও তত্ত্ব চিন্তা ও চেতনা তার শৈল্পিক উপাদান, কবির কল্পনা তার অন্তর্নিহিত সূত্র। কালকেতু-ফুল্লরার জীবনকাহিনীর মধ্যে উপন্যাসোচিত ঘটনা-চরিত্রের টানা-পোড়েন

লক্ষণীয়। আবার এই কাব্যে ব্রতকথার সরলতা, রূপকথার অলৌকিকতা, মহাকাব্যের ব্যাপকতা মিশ্রিত। তাই আখ্যানকাব্য সর্বাংশে উপন্যাস নয়। চণ্ডীকাব্যের কথাঅংশে এই মিশ্র জটিলতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

সর্বোপরি, ইষ্টদেবতার নিয়ন্ত্রী শক্তি। মঙ্গলকাব্যের অন্তরে মানবতার স্বাদ, দেহে দৈবী মহিমার নামাবলী। ভেতরের সবুজ বাইরের এই গেরুয়া বসনটিকে কোন সময়েই ভুলতে পারেনি। মাঝেমধ্যে দেবতার আবির্ভাবে ঘটনা ও চরিত্রের স্বাভাবিক গতি বারে বারে ব্যাহত হয়েছে; আকস্মিকের উৎপাতে, যা হতে পারত উপন্যাস, তা হয়ে উঠেছে রোমান্স। মাটির পৃথিবীতে স্বর্গীয় দেবদেবীর হঠাৎ-আগমনে ঘর হয়ত ভরে উঠেছে সুখসৌভাগ্যে, কিন্তু সাহিত্যের শিল্পকলার অপমৃত্যু হয়েছে; কবির মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু মানবতা আত্মহত্যা করেছে। কালকেতু-ফুল্লরার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং তার সুখদুঃখ যখন আমাদের মনকে রসাস্বাদের আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে, ঠিক তখনই এলেন গোধিকারূপিণী দেবী চণ্ডী। তখনও নায়ক-নায়িকাকে মানুষ বলে চিনে নিতে বাধা হয় না। ফুল্লরার দেবীকে নিরস্ত করার জন্যে যুক্তিজালের অপূর্ব বিস্তার, কালকেতুর হতচকিত ভাব, আর মোহরের ঘড়া কাঁধে সেই বারবার পিছু ফিরে দেখা—দেবী তাঁরই দেওয়া ধন নিয়ে পালালেন কিনা! কিন্তু যে-মুহূর্তে দেবীর বরে কালকেতু হল রাজা আর ফুল্লরা রাণী, সেই মুহূর্ত থেকে তাদের সমস্ত স্বাভাবিকতা নিঃশেষে ঝরে গেল; তখন তারা আর সেই মানুষ নয়, অন্যচালিত পুত্তলিক মাত্র। ফলে সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যেই কবিকঙ্কণের মানবতাবোধ নিঃশেষিত হয়েছে, বাস্তবের সত্য প্রতিচিত্ররূপে জীবনদর্শন হয়ে উঠতে পারেনি, জীবনসত্যের সন্ধান দিতে পারে নি। শিবদুর্গা ও কালকেতু-ফুল্লরার প্রাত্যহিক জীবনের ছবি সমজাতীয়। দুটি সংসারের গতানুগতিকতা দারিদ্র্য আশা-বিশ্বাস সংগ্রাম ও ব্যর্থতাকে কবি সুন্দর সূক্ষ্মতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু মহৎ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি। চাঁদ সদাগরের মহতী বলিষ্ঠতা ধনপতির মধ্যে ফুটে ওঠেনি। সমস্ত রকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন চরিত্রই 'সম্পূর্ণ মানুষ' হয়ে ওঠেনি, অনেক রঙের আভাস সত্ত্বেও 'রাউণ্ড' হতে পারেনি। দেবতার রোষ অথবা আশীর্বাদ তাদের স্বাভাবিক চলার পথ থেকে বারেবারে সরিয়ে এনে প্রচার-যন্ত্রের প্রত্যঙ্গরূপে নিযুক্ত করেছে। ফলে সম্ভাবনা সত্ত্বেও এরা 'হোমো ফিক্টাস্' নয়, প্রাণহীন টাইপ—তাও স্মল পাইকা! সমগ্র কাব্যের মধ্যে একমাত্র

ভাঁড়ু দত্তকেই রবীন্দ্রনাথ ব'লছেন সম্পূর্ণ চরিত্র—অধিকতর বাউণ্ড। দেবতার অনুগ্রহ লাভে সে বঞ্চিত, জীবনের সঙ্গে তার প্রতিপদে লড়াই ও জয়লাভের চেষ্টা (অবশ্য অসৎ পথে, কুৎসিৎ) বাস্তবতা ও চলতাশক্তির লক্ষণ। সে অনেকটাই মানুষ, টাইপ নয়, শ্রেণী।

মুকুন্দরামের প্রবণতা ও সৃষ্টিক্ষমতা ঘটনা বর্ণনার দিকে যতটা, ভাবের চরিত্র সৃজনে ততটা নয়। তাঁর দৃষ্টি খণ্ডের প্রতি, অখণ্ড সমগ্রে নয়। তাঁর কাব্যে জীবনদর্শনের সম্পূর্ণতা নেই, জীবনের ও মানুষের প্রতি আছে অসীম দরদ। তাঁর মানবকথার মূলে দুঃখ ও দারিদ্র্যের বাস্তব চেতনা, সেই কথা বর্ণনার ভিত্তিতে সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাতের প্রতিভা। এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। নিজ জীবনের যন্ত্রণার যে অভিজ্ঞতা, তারই শিল্পরূপ তাঁর কাব্যজগৎ। তিনি আভিজাত্যের কবি নন, দারিদ্র্যের কবি। শিবদুর্গার সকল ঐশ্বর্য ঘুচিয়ে তিনি তাঁদের এঁকেছেন দরিদ্র দম্পতী রূপে, মানবখণ্ডের নায়ক-নায়িকারূপে বেছে নিয়েছেন ব্যাধ-ব্যাধিনীকে; বলেছেন যে কাহিনী, তা রূপকথা নয়, গরীব বাঙালীরই ঘরের কথা। যেখানে অভিজাত কথার আলাপ, সেখানে তিনি সার্থক হতে পারেন নি। কালকেতুর রাজকাহিনী শুধু নয়, ধনপতি-শ্রীপতির ঐশ্বর্যময়ী আখ্যানেও তিনি প্রাণসঞ্চার করতে পারেন নি; তাঁর অচলায়তনের সজীবতা যেটুকু সে কেবল খুল্লনার মধ্যে, তাও ঘর থেকে পথে নামার ভগ্নাংশের মধ্যে।

কবিকঙ্কণ জীবনের কবি, জীবনবোধের নন; তাঁর কাব্যে বাস্তবের বর্ণনা যতটা নিখুঁত, সত্যের সন্ধান ততটা নয়। এবং এই বাস্তবতা ও মানবতাও ক্ষণে ক্ষণে উধাও হয়ে যায়, যে মুহূর্তে ধর্মচেতনা সমাজচেতনার স্কন্ধে ভর করে। শিব-শিবানী যেখানে দেবতা কিংবা যখন ব্যাধ পায় রাজসিংহাসন, তখন আর সেই স্বাভাবিক জীবন ও মানুষকে আর কোনরকমেই ফিরে পাই না। রাজা-কালকেতু ব্যাধ-কালকেতুর প্রেতাত্মা, রাণী-ফুল্লরা ব্যাধিনী-ফুল্লরার প্রেতছায়া মাত্র, আর ধনপতির কথা তো সবটাই ছায়াছায়া।

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' যেমন জীবনবেদ নয়, তার দুঃখবর্ণনাও তেমনি দুঃখবাদ নয়। দুঃখবাদ জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ও সমগ্র দৃষ্টিভংগি। এই সমগ্র দৃষ্টির অভাব ও ধর্মবোধের অতিভাব কবির জীবনবোধকে যেমন সম্পুর্ণতা দান করেনি, তেমনি তাঁর কাব্যকে বাঁচিয়েও দিয়েছে দুঃখবাদী নৈরাশ্যের অতল অন্ধকারের কবল থেকে। দুটো নেগেটিভ থেকে একটা পজিটিভ: দুঃখবর্ণনার

কবি তাই দুঃখবাদী কবি নন—না ষ্টোইক্, না সিনিক্, না পেসিমিষ্ট্। তিনি জেনেছেন, জীবনে দুঃখ নিষ্ঠুরভাবে সত্য কিন্তু একমাত্র ও শেষ সত্য নয়। এই বিশ্বাসই তাঁকে নিরাশার ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়েছে। কবি দারিদ্র্যের অন্তে দেখেছেন ঐশ্বর্যকে, ব্যাধকে করেছেন রাজা, রাজাকে পাঠিয়েছেন স্বর্গে, দুঃখান্তে সুখরসে কাব্য সমাপ্তি লাভ করেছে। পথচল্‌তি, যেখানে দুঃখদারিদ্র্য দেখেছেন ও এঁকেছেন, তার ওপর দিয়ে লঘু পদক্ষেপে চলে গেছেন, সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছেন হালকা হাসির টুকরো। তাতে দুঃখ হয়ত অসীম পাথার পার হল না, কিন্তু লঘু হাস্যরসের সিঞ্চনে যন্ত্রণার বোঝা অনেক সহনীয় হয়ে উঠেছে। তাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে কবির ধর্মবোধ—এই দুঃখ এই দারিদ্র্য এই যন্ত্রণা ক্ষণিকা মাত্র, দেবতার দান, ভক্তের শোধন, দৈবী মহিমা প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যের সহায়িকা; নইলে, মানুষের জীবন?—সে তো আলোয় আলোয় ভরা!

বলা বাহুল্য ধর্মচেতনা ও সমাজচিন্তার এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয় একমাত্র কবিকঙ্কণ চণ্ডীরই বৈশিষ্ট্য নয়, মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার অন্যান্য কাব্যের ও কবির মধ্যেও পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য পরিমাণগত, সৃষ্টি-ক্ষমতাগতও বটে, কালগত বিবর্তনও তার জন্যে অনেকখানি দায়ী। মাণিকদত্ত থেকে মুকুন্দরাম অনেক দূরের পথ। মাণিক দত্তের রচনা বিচ্ছিন্ন ও বৌদ্ধভাবাশ্রিত; দ্বিজমাধবের রচনা অধিকতর সুবিন্যস্ত ও তন্ত্রভাবাশ্রয়ী। তিনি মঙ্গলদৈত্য ও মহিষাসুরকে এনেছেন কালকেতুর আগে-আগে। মুকুন্দরাম পুরাণ-অনুগত ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুগামী, তিনি দৈত্য-অসুর বাদ দিয়ে এনেছেন শিব-উমার ঘরোয়া ছবি; এবং কালকেতু-ফুল্লরার বাস্তববৃন্তবিধৃত জীবনী। মাণিক দত্ত লিখেছেন যা, তা পাঁচালী; দ্বিজ মাধব লিখেছেন দেবী মাহাত্ম্য, তাতে সাহিত্যের আভাস দ্যোতিত; মুকুন্দরাম লিখলেন কাব্য—বাস্তব ও কল্পনার সুসম মিশ্রণে অপরূপ সাহিত্য। মাধবাচার্যের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' দেবতার মহিমা ও পূজা প্রচারের জন্যে যখন ব্যস্ত ও দ্রুতগতি, লক্ষ্যে উপনীতির জন্যে অপ্রাসঙ্গিক বিস্তারে অনিচ্ছুক, কবিকঙ্কণ চণ্ডী তখন ধীরে ধীরে রয়ে বসে মানুষের ঘরের কথা মনের কথা বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে রসগভীর করে বর্ণনায় প্রবৃত্ত। ভাবটা যেন এইরকম—দেবীর কথা তো আছেই, সেই অনিবার্য লক্ষ্যে পৌঁছব তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্যে তাড়া কেন? চলার পথে প্রান্তরে যে সব ছবি আর গান, তাদের যদি আর একটু ভাল করে দেখে

নিই, মনের ক্যামেরায় তুলে নিই তাদের প্রতিচ্ছবি—ক্ষতি তো নেই বরং লাভ ষোল আনা। দেবীকেও পেলুম, জীবনকেও দেখলুম, শুনলুম দেবীর পাঁচালী আর পথের পাঁচালী।...মুকুন্দরামের এই কাব্যিক মেজাজই তাঁর রচনাকে কাব্যত্ব দান করেছে। এই মেজাজ ভারতচন্দ্রেরও ছিল; কিন্তু আদিরস ও হাস্যরসের উচ্ছল আবেগে জীবনের ছবি স্থির হয়ে দেখতে তিনি পারেন নি, আঁকতেও না; লিখলেন—জীবনের ভাষ্য নয়, টীকা।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী অধিকতর জীবনঘনিষ্ঠ। লাউসেন-চন্দ্রধরের বেশির ভাগটাই কেটেছে পথে পথে, যেখানে ঘরে এসেছেন, সেখানেও ঘরোয়া ছবির খুঁটিনাটির অভাব। সেইদিক থেকে মুকুন্দরাম অধিকতর সুযোগ পেয়েছেন কল্পনার লীলা-প্রদর্শনীতে। কিন্তু আগেই বলেছি, সে ঘটনার ক্ষেত্রে; তাঁর চরিত্রচিত্রণ সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। কালকেতু-ফুল্লরার মানবিক সত্তাকে পাতার কুটিরেই পাই, সোনার প্রাসাদে নয়। চাঁদ ও ধনপতি দুজনেই সওদাগর—সমান পরিবেশে সমজাতীয় চরিত্র। কিন্তু ধনপতি-শ্রীমন্ত দেবীর প্রচারযন্ত্র মাত্র, চাঁদসদাগর মানুষ এবং মহৎ মানব। লাউসেনের গার্হস্থ্যালী ছবি অপ্রতুল, কিন্তু সে জংগী প্রাণবান, লড়াই করেছে সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে; তার ভালবাসাও জংগী। কিন্তু শ্রীমন্ত ও তার পিতা অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের, বেঁচেছে দেবীর কৃপায়; চাঁদ সদাগরের সংগ্রামের কাছে এদের কারোরই লড়াই দাঁড়াতে পারে না। লাউসেনকে পদে পদে সাহায্য করেছেন তার ইষ্টদেবতা। চন্দ্রধরের উপাস্য দেব শিব ভক্তকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, নিষ্ক্রিয় থেকেছেন বরাবর এবং প্রকারান্তরে কন্যা মনসাকেই সহায়তা দিয়েছেন; চণ্ডীর সহযোগিতা ভক্তকে রক্ষা করতে পারেনি। তারপর পুত্র-পুত্রবধূর কাছে স্নেহ-প্রীতির সেই মধুর পরাজয়—হয়ত আদর্শের বিচ্যুতি, কিন্তু পাই সম্পূর্ণ মানুষটিকে। এমন চরিত্র মুকুন্দরামে নেই। তবে নারীচরিত্র অঙ্কনে তিনি অনেক সুপটু। সনকা, বেহুলা, কর্ণবতী, ফুল্লরা, খুল্লনা—বাঙালী কবিদের জীবনপ্রতিমা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনকে টানে বেহুলা ও ফুল্লরা। ফুল্লরা প্রথমদিকে উজ্জ্বল, বেহুলা শেষদিকে; দুজনেই দুঃখভোগ করেছে, তার সীমা নেই শেষ নেই; ফুল্লরার যন্ত্রণা সাংসারিক দারিদ্র্যে, বেহুলার বেদনা স্বামীর অকালমৃত্যুতে। গরীব স্ত্রীর চেয়েও স্বামীহারা স্ত্রীর ব্যথাই আমাদের মনকে বেশি করে টানে—ফুল্লরাকে আমরা স্পষ্টভাবে চিনি, বেহুলার সবখানি জানি না, তবুও। ফুল্লরার কিছুই নেই তবু স্বামী

আছে, বেহুলার সব থেকেও কিছু নেই। ফুল্লরা মেটে ঘর থেকে উঠল রাজপ্রাসাদে, বেহুলা রাজার ঈর্ষাজাগানো ঐশ্বর্য ফেলে দিয়ে ভেসে চলে অজানা আশার অন্ধকারের উদ্দেশে; প্রথম জনের দুঃখে আমরা চোখের জল ফেলি, শেষজনের শোকে আমরা কাঁদতেও ভুলে যাই। সে বেদনা প্রকাশের তো ভাষা নেই, ভংগি নেই, সে শুধু মন দিয়ে অনুভব করার! ফুল্লরা বাস্তবের জীবন্ত চিত্র, বেহুলা কল্পনার সজীব ছবি। মুকুন্দরাম অভিজাত কবি নন, অভিজ্ঞতার কবি।

নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে দোলা তিনি দেখেছেন, তাকেই প্রকাশ করেছেন সমস্ত দরদ দিয়ে। তাঁর মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে বাঙালীর মনন ও মানস সংস্কার ও সংস্কৃতি। তাঁর কাব্যে আর্য-আর্যেতর, ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ, নাগরিক-গ্রাম্য, প্রাচীন-অর্বাচীন, দেবত্ব-মানবত্ব, পৌরুষ-নারীত্ব, দুঃখ-হাস্য, বীরত্ব-দুর্বলতা, অতিলৌকিক-বাস্তবতা, অভিজাত ও লোকায়ত একই সঙ্গে যুগ্ম রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে শতদল পদ্মের মত, একের কথা হয়েছে বহুর কথা—যে কোন কবিপ্রতিভার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। মুকুন্দরামের কাব্যকৃতিত্ব সৌখিন মজদুরি নেই, দৈব কথার কারিগরিই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। তাঁর কবিচিত্তে ছিল জীবনঘনিষ্ঠ মানবপ্রীতির ও সংবেদনশীল সহানুভূতির প্রত্যক্ষ অনুলেপন। তাই মুকুন্দরাম চারণকবি, তাঁর কাব্য বাঙালীর জীবনপদ্মের, বাঙলার মহাকাব্য।

অ্যাবারক্রম্বি বলেছেন—It is of man and man's purpose in the world that the epic poet has to sing, not of the purpose of Gods (The epic)। যে যুগে নির্দলায় ও নির্দৈব সাহিত্যের প্রবেশ নিষেধ ছিল শ্রোতার আসরে, সেই যুগে দেবতার কথা বলতে বসে মানুষের জয়গান গেয়েছেন যে সব মহৎ কবি, তাঁদের মধ্যে একটি আসন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীরও।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম

উপনিষদের ঋষি জেনেছেন—পরমপুরুষ যখন একাকী তখন তিনি অসম্পূর্ণ; কারণ একাকী লীলা হয় না, আর লীলা না হলে আত্মোপলব্ধিও হয় না। মানুষ যে স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভালবাসে, সে কি তাদের জন্যে? সে তো নিজেকেই ভালবাসা, নিজের জন্যেই ভালবাসা! তাই তিনি আত্ম-বিভক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয়াকে সৃষ্টি করলেন এবং তার সঙ্গে লীলায় রত হলেন:

একাকী স তদা নৈব রমতে স্ম সনাতনঃ।

স লীলার্থং পুনশ্চেদমসৃজৎ পুষ্করেক্ষণঃ॥ (সাত্বত সংহিতা)

সেই লীলাময় মিলন কি রকম? উপনিষদের উত্তর—তদ্ যথা প্রিয়যা স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চ ন বেদনান্তরম্। সাগরপারের মরমী সাধনায় এর প্রতিধ্বনি, যেখানে 'তিনি' সকলকে আকর্ষণ করেছেন এই ব'লে—Come my bride and enjoy my Godhead (সন্ত মেথচাইল্ড)।

বৈষ্ণবের প্রেম লীলাময়। রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের পালাগীতিতে সেই প্রেমলীলার ছবি ও গান। নিখিল প্রেমামৃতমাধুরী শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করছেন, রাধা তাঁর দিকে এগিয়ে চলছেন একটু-একটু ক'রে: পূর্ণের দিকে অপূর্ণের চলা, সুমিতার দিকে অমিতার অভিসার। ওদিকে উথলে ওঠে সাগর নাচের ছন্দে, এদিকে শতদল পদ্ম একটি একটি পাপড়ি মেলে ধরে। একদিকে অস্থির প্রতীক্ষা, অন্যদিকে অধীর প্রত্যাশা! সংশয়-সংগ্রামের কাঁটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে ভালবাসাকে উপলব্ধি করা, আনন্দসমুদ্রে অবগাহন করা, সূর্যমুখীর আত্মনিবেদন নিয়ে তিল তিল করে নিজের হৃদয়কে দান করা, দুটি মনের এক হয়ে যাওয়া।

বৈষ্ণব পদাবলীর এই প্রেমধারণার পশ্চাতে সমাজশক্তি এবং সংস্কৃত কাব্য-অলংকার শাস্ত্রের পটভূমিকা; তথাপি তার প্রেমের লীলা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিজস্ব অবদান, বাঙালীর স্বকীয় সংস্কৃতি, অন্তরঙ্গ সাধনার এক অপরূপ বিশিষ্ট প্রকাশ। সে যেন সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনী।

নদীর উৎপত্তি নিঃসঙ্গ গিরিচূড়ার অজানা উৎসে; তার চলতি পথের সুরুরেখায় ঢেউতোলা পাহাড়ের কঠিন অসমতল, আলোছায়ার ধূসরতা-উবরতার দ্বন্দ্ব: সেখান থেকে গিরিদরী বিহারিণী হরিণীর লাস্যে সে নামে সমতল ভূমিতে, সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলে সামনে দ্রুতলয়ে দেশদেশান্তরের সীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে; তার দুই তটে কতো না নগর রাজধানী, কতো নির্জন অরণ্য প্রান্তর, লোকালয়ের অনন্ত জনতা। তার এক-এক ঘাটে এক-এক দৃশ্য, বন্দরে-বন্দরে সংখ্যাহীন জাহাজের ভীড়—কতো উত্থান আর পতন, আনন্দ আর বেদনা, মানবিক সভ্যতার বিচিত্র রূপলেখা। একদা নদীর আঁকাবাঁকা যাত্রা শেষ হয়, পথ ফুরিয়ে আসে, সামনেই মোহানার বিপুল ব্যাপ্তি ও অতল গভীরতা। নতুন প্রসাধনে নবমিলনের আকাংক্ষায় সজ্জিত হয়ে ওঠে নদী; তার সোনালী আঁচলে ছোট ছোট দ্বীপের চুমকি, পাড়ে শ্যাম বনানীর সবুজ, সামনে সীমাহীন রূপহীন তলহীন সমুদ্র নীলিম আকাশের ছবি বুকে নিয়ে। মুহূর্তের জন্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নদী, এতদিনের বিরহে কান্নায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরের বিরাট বিস্তৃত বুকের ওপর। দুই তীর মিলিয়ে যায় তাদের সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে, নদী হারিয়ে ফেলে তার নাম রূপ আকার, সাগরের নিতল শান্তির অসীমতায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মিলিয়ে দিয়ে শান্ত হয়। জপের মালা শেষ প্রান্তে এসে ঠেকে, এক আর একে মিলে এক হয়। লীলার অবসান হয় জন্ম-মৃত্যুর মহাসঙ্গম সমুদ্রে। আবার নতুন দিনে নতুন করে জন্মলাভ, নব নব লীলার সনাতনী পালাগীতি। বৈষ্ণবের প্রেমসাধনায় এই লীলায়িত আরাধনার পরম সুন্দর প্রকাশ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। সাধনার সুরু দ্বৈতে, অদ্বৈতে তার সমাপ্তি। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আদিতে অদ্বিতীয় একক; লীলার্থে তিনি সৃষ্টি করলেন দ্বিতীয়াকে, হ্লাদৈকময়ী শ্রীরাধাকে। পূর্বরাগ-অভিসার-মান-প্রেমবৈচিত্ত্য ইত্যাদি ফুল দিয়ে মালা গাঁথা হতে থাকে বিরহ-মিলনের। তখন তার কতো কলরব আর জনরব, সচিত্র বিচিত্রতা। একসময়ে মালা গাঁথা শেষ হয়, খেলা ফুরিয়ে যায়, নিরবতা আনে অসীমতাকে; চরম বিরহের মধ্যে দিয়ে হয় পরম মিলন। আস্বাদনের তুরীয় লোকে রাধাকৃষ্ণ অভেদ আত্মতনু, সাকার নিরাকারে আকারহীন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী এই ভেদাভেদ তত্ত্বের লীলারূপ, নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমসন্ধিমুখে অবস্থিত যেখানে দ্বৈতের অভিসার অদ্বৈতের অভিমুখে।

নদীর আদি উৎস সমুদ্র; রাধার উৎপত্তি কৃষ্ণে। নদীর প্রাথমিক গতির উচ্ছলতা আভাসিত হয় রাধার বয়ঃসন্ধিজাত রসোচ্ছল রূপে। চকিতা হরিণীর চাঞ্চল্য পার্বতীয়া ধারার ঢেউতোলা দেহে, গৌরী রাধাতেও—দুজনেরই তখন রহস্যময়ী বন্যতা দেহের দুই তটে—শৈশব যৌবন দুহু মেলি গেল।...ক্রমে বয়স বাড়ে, রূপের বদল ঘটে, লাবণ্য হয় দেহের অলংকার। ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর তখন ভরাট যৌবন, চপলতা পরিহারে গতি গজেন্দ্রগামিনী, লাস্যময়ী চলনে-বলনে ধীরা: আর রাধার—কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব। ইনকে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব॥ চরণ চলনগতি লোচন পাব। লোচনক ধৈরজ পদতল যাব॥ ঝর্ণা নেমে আসে সমতলে, অসমতল ও অসরল ভূমিতে। রূপ পেল, নাম পেল—নদী; তখন তার পদক্ষেপে ক্ষিপ্র ভারসাম্য, হৃদয়ের লক্ষ্য সুদূরের সাগর। রাধার চিত্তে নতুন আলোর শিখা—কৃষ্ণরতি; তাঁর পদচারণা একের চরণ-অভিমুখে—অনন্তবৈভবামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে। তারই নাম পূর্বরাগ—মদনদীপের প্রথম শিখা। তার স্পর্শে গৌরী হয় নবীনা নদী, লাল হয় নবীনা কিশোরী। ভাবের আবেগ আর চলার বেগ ঘর থেকে টেনে আনে পথে—অভিসারের জ্যোৎস্না-তামসী বর্ষণমুখরিত কুঞ্জপথে। নদীর দুই তীরে দেখা দেয় ধুসর-ঊসর বিজন প্রান্তর, শস্যশ্যামলী সোনার মাঠ, লোকালয় হাট বন্দর ঘাট; তার তটে বিশ্রাম করে পথিক, গাছে বসে পাখী, জলে ভাসে বণিক, জলে নামে বধূ, কতো কথা আর ব্যথা, আনন্দ আর নন্দনবিলাস: পূর্বরাগোত্তর রাধা জীবনের তীরে তীরে সংসার-সমাজের টানা-পোড়েন, বন্ধনের বেদনা আর মুক্তির আনন্দ, সোপানে সোপানে ভাব-ভাবনা। বিচিত্র ভাঙাগড়া, তার সুনীল জলে জটিলা-কুটিলার সতর্কতা, তার নীলিম জলে সখীদের সহৃদয় অবগাহন। মান-প্রেমবৈচিত্ত্য-আক্ষেপানুরাগ-বংশীলীলা-রাসনৃত্য: মিলনের বহুবিচিত্র রূপান্তরিত পালাবদল।...ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর ঘট ভরে ভরে নদী এসে উপনীত হয় মোহানায়। আঁকাবাঁকা পথের দুই তীরের দ্বৈত বাঁধ ও বন্ধন সরে যায় বহু দূরে, সামনে কূলহীন কূলনাশা অদ্বয়ের প্রতীক মহাসমুদ্র। শেষ মিলনের অব্যবহিত পূর্বের শেষ বিচ্ছেদ: তার নাম রাধাবিরহ। পেছনে সীমিতগণ্ডী অতীত, দুই পাশে তটহীন অরূপ বিস্তার, সমুখে অসীম অকুল সাগর—তার ওপরতলায় উত্তাল ঢেউ, তলহীন তলদেশে নিস্তরঙ্গ ধ্যানমৌনতা। অথবা মহাসাগরের মুখোমুখি হয়ে মন শেষবারের মত ছুটে চলে পুরাতনের টানে, অনুভব করে পায়ের তলায় নিতল গভীরতা। এতদিনের এতো বিচ্ছেদ

আব মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সব একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, বিরহের দিক্‌সীমানাহীন অনুভবে উথাল পাথাল হৃদয়—নাম না জানা বেদনায় আকুলি বিকুলি করতে থাকে, অসহ্য মনে হয় নিঃসঙ্গ একাকীত্বের সীমাহীন যন্ত্রণা; মুহূর্তের জন্যে গতি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে; পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে, মহাশূন্যোপম আনন্দামৃত সমুদ্রের নিবিড়কৃষ্ণ বাহুডোরে। কালোয়-আলোয় একাকার হয়। নদী অবগাহন করে সাগরে।...এরই নাম ভাবসম্মিলন—সংযোগবিয়োগস্থিতি: রূপকথা থেকে চুপকথার জগতে উত্তীরণ। সেখানে সব হারিয়ে সব পাওয়া যায়, আত্মবিলয়েই আত্মবিলসন। এক হয়েও যেন এক নয়—দ্বৈতাদ্বৈতের ভেদাভেদের এক অচিন্ত্য তত্ত্ব। সমস্ত বন্ধন বৈচিত্র্য আর পৃথ্বিচেতনার উর্দ্ধে উঠে 'সুন্দরী ভেলি মধাই'—দুই থেকে এক; তবু যেন পরিপূর্ণ একত্ব নয়। যেন সমুদ্রের সর্বদেহে বিলিয়ে-যাওয়া নদী, তবু বিলীন নয়। প্রেমিক হৃদয় প্রেমের মধ্যে ডুব দিয়েও ডুবে যায় না, বিগলনেও চলে আস্বাদন; ভূমি থেকে উত্তীর্ণ হয় ভূমায়, তবু উপলব্ধি করতে পারে, তখনও বলতে পারে—কি কহবরে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

তাই সমুদ্রেব কোলে আবার নতুন করে নদীর জন্মপত্রিকা রচিত হয়; কাছের থেকে চলে যায় দূরে, রূপ হতে রূপে প্রাণ হতে প্রাণে জন্মমৃত্যুর তোরণ পেরিয়ে পেরিয়ে কাছেব মানুষ আবার চলে আসে কাছে। রাধাকৃষ্ণের আবার বিচ্ছেদ হয়, ছেদহীন অভিসার ও রাধার অপসরণ, পুনরায় মিলন। এমনি করে বিরহমিলনের নিত্যলীলা চলে নিত্যকাল ধরে নিত্য বৃন্দাবনে—নদী ও সমুদ্রে, রাধা ও কৃষ্ণে, দ্বিতীয়ায় ও অদ্বিতীয়—এব' সাধকে ও সাধ্যে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রমতে, বৈষ্ণব সাধক 'লীলাত্মক'—আত্মারামশ্চ, মুনয়োঃ নিগ্রন্থ অপুরুক্রমে। কুর্বন্তী অহৈতুকীং ভক্তিমিত্থভূতো গুণোঃ হরিঃ॥ (ভাগবত ১ম স্কন্ধ)। অহৈতুকী ভক্তিতে তাঁরা কাছে আসেন, দূর থেকে লীলারস আস্বাদন করেন, সাযুজ্যের মাধ্যমে এক হয়ে যান না। কারণ—জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।...কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর। কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥ (চৈ, চ)। জীবের পক্ষে গোপীপ্রেমই সর্বসাধ্যসার, মহাভাবস্বরূপা রাধাঠাকুরাণীর সাধনা তার অনধিগম্য। মায়াধীন জীব সাধনবলে 'তটস্থা' হতে পারে, স্বরূপে পৌছতে পারে না: সেখানে রাধাই একেশ্বরী। বৈষ্ণব তাই সখী, রাধাকৃষ্ণলীলার দর্শক ও প্রদর্শক।

কিন্তু যেখানে মরমীয়া সাধনার অন্তরঙ্গ প্রেম, সেখানে—The relationship of soul to Christ as His betrothed wife is the key to the feeling (প্যাটমোর) কিংবা একহার্টের—It I am to know God directly, I must become completely He and He I so that this He and this I become and are one I। কবীরের ভাষায়—এহ্ তো ঘব হৈ প্রেমকা। যব্ শোয়ো তব্ দুইজনা যব্ জাগে তব্ এক॥ বৈষ্ণব সাধনা মূলত মরমীয়া না হলেও অন্তরঙ্গ। তার প্রেমলীলা অতীন্দ্রিয় রাধাকৃষ্ণের শুধু নয়, ইন্দ্রিয়গোচর ভক্ত এবং ভগবানেরও। তখন রাধা জীবাত্মার প্রতীক এবং বৈষ্ণব পদাবলী জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন-বিরহের দ্বৈতাদ্বৈতের পালাগান। একইভাবে লীলার মাধ্যমে উভয়ের ক্রমনৈকট্য ঘটতে থাকে। সংসারচেতনায় অবশ চিত্তে জাগে ভাগবত চেতনার আবেশ। ঘরে মন টেঁকে না, সে বেরিয়ে পড়ে পথে দূরকে নিকট করার আকুল প্রত্যাশায়। পূর্বরাগ থেকে অভিসার, মান থেকে প্রেমবৈচিত্ত্য, বিরহ থেকে মিলন: ত্যাগ ক'রে ক'রে নিজেকে নিঃস্ব, চিত্তকে নগ্ন করে তোলা, দৈবী প্রেমের আলোয় পথ চিনে চিনে এগিয়ে চলা, প্রতি পদক্ষেপে কার ছোঁয়ায় তিলে তিলে হয়ে-ওঠা। কখনও কাছে স'রে আসা, কখনও বা কাছে থেকেই দূর রচনা করা। অবশেষে দূর হয় নিকট, নিকট হয় অন্তরতর, অন্তর হয় অনন্তে বিলীন। পথের আঁকাবাঁকা থেকে আনমন মোহানায়, বিরহের গাঢ়তা থেকে রহঃসখার প্রেমের গভীরে। একের মধ্যে আরের বিলসন ও বিলয়, পরমাণুতে জীবাণুর পরমা গতি। সেখানে সমস্ত কলতান নৈঃশব্দ্যে, অনুভব নির্ভাবনায়, ব্যক্তিসত্তা নৈর্ব্যক্তিকতায় পরিণত। রাধিকা ও সাধিকা তখন অভিন্ন, উপনীত একই বিন্দুতে, অসীম একে তিনের সমাহার।

বৈষ্ণবের এই প্রেম আধ্যাত্মিকতা, এই লীলা ধর্মসাধনা। অথচ এর মণ্ডন শিল্প যে-শাস্ত্রের অনুগত, তা ধার্মিক নয়, মানবিক। মানবপ্রেমের প্রতিচ্ছায়ায় বৈষ্ণব প্রেম পরিকল্পিত। এই দুইয়ের সম্বন্ধ কি? সে কি শুধুই সেতু বন্ধনের?

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—Divine love is not merely a sublimation of human emotions, it is a different consciousness with a different quality, movement and substance। মানুষের ভালবাসা ও দৈবী প্রেমের মধ্যে যোজনবিথারী ব্যবধান; তবে আধ্যাত্মিক সাধনায়

মানবিক প্রলেপ কেন? বিদেশী সন্ত উত্তর দেন—He became Man so that we might be made God। জীবকে পরমার্থ দানের জন্যেই পরম-এক নেমে আসেন নীচে। আবার একথাও তো সত্য যে—'পার্থিব প্রেম ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম এই দুইয়ের মধ্যে একটা তফাৎ থাকিলেও সাংসারিক প্রেমের মধ্য দিয়া এমন একটি সন্ধিস্থলে পৌঁছান যায়, যেখানে আকাশ ও দিগ্‌বলয় পরস্পরকে ছুঁইয়া ফেলে, গাছের ডালটিকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ স্বর্গের ফুল ফোটে, এই প্রেম সেইভাবে জড়রাজ্য হইতে আনন্দলোক দেখাইয়া থাকে' (রবীন্দ্রনাথ)। শুধু তাই নয়, ভালবাসার তীব্রতায় দেবতা হয় প্রিয়, প্রিয় হয় দেবতা; পার্থিব প্রেম ও স্বর্গীয় প্রেম একই বৃন্তের ফুল. তাই দিয়ে মালা গেঁথে 'কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলার।'

বঁধুর প্রেম ও বধুর প্রেম দুইই ভালবাসা। একই ভালবাসার দ্বিবিধ প্রকাশ। ধর্মকে আশ্রয় করে সাহিত্য রচিত হলেও ধর্মসাধনা ও সাহিত্যসাধনা অভিন্ন ব্যাপার নয়। প্রথমটির মূল ভাব ভক্তি, দ্বিতীয়টির স্থায়ী ভাব প্রেম। ধর্মে আধ্যাত্মিকতা, উপাদান শাস্ত্র, উপাস্য দেবতা; সাহিত্যে হৃদয়াবেগ। উপাদান বিশ্বজগৎ, উপজীব্য মানুষ। একটিতে বিশ্ব-বিবহিত হয়ে বিশ্বনাথে আত্মসমর্পণ, অন্যটিতে বিশ্বকে আত্মগত করে বিশ্বমনে উপনীতি; একটি তত্ত্ব অন্যটি রস। প্রেম সাধনের বিষয় ও সাহিত্যের বস্তু, সাহিত্যের লক্ষ্য ধর্মায়ণ নয়, সৌন্দর্যের উপলব্ধি। সুন্দর বিচার করে শিল্পের আলোয়। আর্টের দৃষ্টিতে প্রতিমার কোন ধর্মরূপ নেই, আছে শিল্পরূপ। অধ্যাত্ম দর্শনের বিচারে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব; কাব্যদর্শনের বিচারে তাঁরা প্রেমিক-প্রেমিকা। বৈষ্ণবী প্রেমধারণা ভারতীয় সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রের অনুগামী, তার লীলা সাহিত্যের সামগ্রী, তার আস্বাদন কাব্যরসাত্মক, বৈষ্ণব পদকর্তা সাধক, আবার কবিও। তাঁর একদিকে ধর্মশাস্ত্রের প্রত্যাদেশ, অন্যদিকে সাহিত্য-শাস্ত্রের নির্দেশ। সাধনার দিক থেকে লীলাকে তিনি যেভাবেই গ্রহণ করে থাকুন, যে মুহূর্তে তাকে গানে গানে ভরিয়ে তুলেছেন তখনই তিনি কবি এবং কবি হিসেবে বস্তুগত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে রূপায়িত না করে পারেন না। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমে তাই পার্থিবতার অনুলেপন অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। কবির ইন্দ্রিয়গোচর ভালবাসা ও প্রেমের পুত্তলিকা পদাবলীর প্রেমভক্তি এবং রাধিকার রূপে ও ভাবে উদ্বর্তিত। এই জন্যে বৈষ্ণব পদ সাধন-সহায়িকা হয়েও রোমান্টিক গীতিকাব্য; প্রিয়ই দেবতা, মানবীই মানসী।

অপিচ সাকার থেকে জাগে নিরাকারের উপলব্ধি, মূর্তি থেকে অমূর্ত আরাধনা। প্রেম সম্বন্ধে যার কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতি নেই, তার পক্ষে ভাগবত অথবা মানবিক কোনজাতীয় প্রেমেরই অনুভব করা সম্ভবপর নয়। পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত ক্রমিক উর্ধ্বগতি ও উদ্বর্তন কেবল রাধাচিত্তের নয়, প্রেমেরও। এ শুধু রাধার লীলা নয়, জীবের লীলা নয়—প্রেমের লীলা, তার তত্ত্ব। মানব-প্রেমকে ভিত্তি ক'রে চিত্তের জাগরণ, তারপর নানা প্রক্রিয়া ও পর্যায়ের মাধ্যমে উদ্বোধন ও উর্ধ্বগমন; পার্থিব প্রেমের নীড় থেকে ভাগবত প্রেমের আকাশে বিচরণ। নীড় যার নেই, তার আকাশও নেই। বৈষ্ণবের সাধনা সেইজন্যে দেহ থেকে দেহাতীতে, ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয়ে। 'পদাবলীতে' আহৃত রাধাভাবাত্মক শ্লোকগুলি কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ধর্মপুষ্পাঞ্জলিমাত্র নয়। রাধা-রূপের মূল মানবিক, ফুল আধ্যাত্মিক। তাঁর অনুভব ও অনুভাব লোকসম্মত, স্থানবিশেষে বিশেষ অর্থবহ ও অলোকের আলোকবাহী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম শুধু ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে নয়, রসসাধনার ক্ষেত্রেও দ্বৈতাদ্বৈত: মানবতায় দেবত্বের আরোপ এবং দুয়ে মিলে এক অপরূপ ভাবে পরিণতি।

ধর্মসাধনার অঞ্জন যাঁরা মনে মেখে নেন নি, তাঁদের কাছে বৈষ্ণব পদ স্বপ্নসম্ভব গীতিকাব্য, রাধাকৃষ্ণ শাশ্বত প্রেমের প্রতীক, উভয়ের মানসাভিসার উচ্ছ্বসিত ও শিল্পসুন্দর কল্পনাবিলাস। একদা এক সুন্দর প্রভাতে অনভিজ্ঞ হৃদয়ে আসে প্রেমের চেতনা, হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত। তখন আর পুরাতন পরিবেশে মন বসে না, নূতন মোহাবেশে অন্তর হয় অধীর, ব্যাকুল হয়ে ছুটে যেতে চায় প্রিয়তমের কাছে, আকুল হয়ে শোনে তার কথা, দেখে তার ছবি। উথালপাথাল করে হৃদয়সরোবরের ঢেউ, চিত্ত চকিত চমকিত হয়ে ওঠে—হঠাৎ যদি পথে সাক্ষাৎ মিলে যায় সেই পথিকের! প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে একজন অভিসার করে আরেকজনের উদ্দেশে; অন্যজন করে প্রতীক্ষা। অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক সংশয় পেরিয়ে দুজনে মিলন হয়। কিন্তু মিল হয় না। চিত্তে তখনও অনেক প্রশ্ন, বাইরে অনেক বাধা। কাছে থেকেও দূর, যতি ও ছেদের ব্যবধান, মান-আক্ষেপ প্রেমবৈচিত্ত্যের বিচিত্র লীলা, ছেদহীন বিচ্ছেদ-ভাবনা। অবশেষে আসে সেই বিরহ—যার আগুণে পুড়ে খাক্ হয়ে যায় সব দ্বিধা আর বাধা সংশয় আর শংকা, যার গভীরগহণ অতলে অবগাহন করে পাওয়া যায় সত্যকার উপলব্ধিকে, সত্য প্রেমকে। তারপর আর কোন পাঁচিল নেই; মনের মধ্যে ডুবে যায় মন, দুটি মন এক হয়ে যায়, পুরোহিতের কণ্ঠে নয়, সমগ্র অন্তর

দিয়ে বলতে পারে—যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। রাধাকৃষ্ণ তখন এই বিশ্বের নরনারী, পদাবলীর প্রেম পৃথিবীর প্রেম। বৈষ্ণবের গান শুধু বৈকুণ্ঠের গান নয়, মানবের সর্বজনীন সর্বকালীন প্রেমগীতিও।

বৈষ্ণব পদাবলীর একদিকে রূপের প্রসারসৌন্দর্য অন্যদিকে রসের গভীর মাধুর্য। আবেগ-থরথর ভাব ও নানারঙের ছবি অলংকার ও ছন্দের দ্বৈত ডানায় ভর ক'রে অদ্বৈত ব্যঞ্জনার অভিমুখী। আখ্যানের বিভিন্ন পর্যায় ও খণ্ড মিলিয়ে, বিশ্লেষিত হৃদয়ের সামগ্রিক চরিত্রায়ণে বৈষ্ণবপদ পালাকীর্তন—নাট্যপালা। তার মধ্যে আছে নাটকীয় অ্যাক্সন্; গতি সঞ্চারিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের কায়িক-বাচিক অভিনয়ে, পথচলায় ও মানসদ্বন্দ্বে, সখীদের লীলাময়ী সহযোগিতায় এবং প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যপটে—ঘর, পথ, বন, কুঞ্জ, কালিন্দী আর হৃদয়মঞ্চে। তারই মাঝে মধ্যে গীতিকবিতার ছোট ছোট অতল সরোবর, তাতে সমস্ত মন ডুবিয়ে অবগাহন, রূপসায়রে ভাবের অরূপরতন। গীতিনাট্যের মধ্যে গীতিকাব্য, চলচ্চিত্রের মধ্যে স্থিরচিত্র; দীঘিতে সাঁতার কেটে কেটে নদীর পথ চলা, কিছুক্ষণ থেমে থাকা, আবার এঁকে-বেঁকে এগিয়ে যাওয়া, চলতে-চলতে হঠাৎ নেচে ওঠা।

বৈষ্ণবের বৃন্দাবন কবির কল্পলোক, স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক অপরূপ রূপকথার জগৎ। তার পথঘাটকুঞ্জ কদম্বকালিন্দী সবই যেন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পরপারবর্তী এক ধূপছায়া স্বপ্নপুরীর রচনা। মঙ্গলকাব্যে স্বর্গ নেমে এসেছে পৃথিবীতে, দেবদেবী মানবমানবী; বৈষ্ণবকাব্যে বৃন্দাবন উঠে গেছে বৈকুণ্ঠে, মানুষ হয়েছে দেবতা—যেখানে সবপেয়েছির দেশ, যেখানে নাবলা বাণীর আকুলতা, নাপাওয়া প্রেমের পরিতৃপ্তি: যেখানে একটি হৃদয় আর একটী হৃদয়ের কানেকানে শোনাতে পারে সেই একটী কথা সুখজাগানিয়া—I am thou, thou art I, উপলব্ধি করতে পারে সেই একটী অনুভূতি ব্যথাসুন্দর—the sadness in the sweet, the sweetness in the sad (ফ্রান্সিস টমসন)।

বৈষ্ণব ও শাক্ত

বৈষ্ণব ও শাক্ত। একের আরাধ্য বিষ্ণু তথা কৃষ্ণ, অপরের ইষ্ট শক্তি তথা কালী। কৃষ্ণ ভগবান, রাধা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি; কালী ভগবতী, শিব তাঁর চিন্ময় সত্তা। একজন সঙ্গিনীকে সৃজন করেন লীলার্থে, অন্যজনা সঙ্গীকে জাত করেন সৃষ্টিমানসে। একে পুরুষ প্রধান, অপরে প্রকৃতি প্রধানা। বৈষ্ণব সাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করে মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের ব্যাকুলতা; শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করে মা-মা ডাকে পাওয়া-না-পাওয়ার আকুলতা। বিষ্ণুপদ মধুর-রসাত্মক, শক্তিপদ স্নেহ-রসায়িত; একে ভক্তি, অপরে শক্তি।

ভাবরসের এই দ্বিধাবার উৎস-সন্ধানে আমাদের উজিয়ে যেতে হয় ইতিহাসের পাতা পেরিয়ে পেরিয়ে সেই আদিমকালে। যখন আদি মানুষের একদল ছিল যাযাবর পশুপালক; পশু ও শিশু পালনের দায়িত্বে তাদের জীবন ছিল জঙ্গম, সমাজদেবতা ছিল সূর্য, খাদ্যভাণ্ডার ব্রজভূমি, শক্তির আশ্রয় শিকারী পুরুষ; সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক, ভাগ্যবিধাতা পিতৃদেব। আর একদল ছিল গৃহস্থ কৃষিজীবী; পশু ও শিশু লালনের দায়ভাগে তাদের জীবন ছিল স্থাবর, সমাজদেবতা ছিল পৃথিবী, খাদ্যভাণ্ডার ক্ষেত্রভূমি, শক্তির আশ্রয় অন্নপূর্ণা নারী; সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, ভাগ্যবিধাত্রী মাতৃদেবী। (এই দুই ধারার প্রথমটি পরিণত হয়েছে যোগাচারে, দ্বিতীয়টি উপনীত হয়েছে তন্ত্রাচারে)।

কালক্রমে, বাস্তববুদ্ধির শ্রীবৃদ্ধিতে মিল হয়েছে ধারণা দুটির। সেকালীন মানুষ বুঝতে শিখেছে, লীলা বা সৃষ্টি একাকী সম্ভব নয়, তার জন্যে 'মিলিতে হইবে দুইজনে'। আধাভৌতিক অনুষ্ঠানে, উৎসবেব্যসনেচৈব দেবদেবী দেখা দিলেন যুগল রূপে—'আদিপিতা-আদিমাতা' হয়ে। অনেক পথ ঘুরে এঁরাই হলেন সাংখ্যের তত্ত্বলোকের পুরুষ-প্রকৃতি, তারপর উপনিষদের ব্রহ্ম-শক্তি, বৌদ্ধের প্রজ্ঞা-উপায়, চীনাচারের তাও-তেই ইত্যাদি, কথনও বা অহুরা-মাজ্‌দার মত অর্ধনারীশ্বর।

জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে আদিম মানব প্রকৃতিকে দৈবরূপ দান করে তাকে কাছে এনেছে, সভয়ে সভক্তিতে পূজা করেছে, নিজে পশু সেজে নাচ-গানের মাধ্যমে কামনা করেছে ইচ্ছাপূরণ। অন্যদিকে চাষের মাঠে শস্য বা তার প্রতীকের সঙ্গে নিজেকে নানা উপায়ে অভেদ কল্পনা করেছে কৃষক—সাযুজ্যলাভের মাধ্যমে শস্যের প্রাণ-শক্তিকে অমরত্ব দান করতে চেয়েছে যাদুবিদ্যার আশ্রয়ে; মাটির বুকে শস্যের জন্ম-মৃত্যুর যে আবর্তন, তার পটে কল্পনা করেছে শস্য-দেবতার বিবাহ-মৃত্যু-পুনর্জন্ম, সেই সঙ্গে তাঁর প্রতীকেরও। অনুষ্ঠান জন্ম দেয় উপকথার, পরিণত হয় ধর্মতত্ত্বে, উঠে আসে কাব্যে। তখন দেবদেবী নায়ক-নায়িকা ; তাঁদের বিবাহ-মৃত্যু-পুনর্জন্ম—হয় পথে প্রান্তরে মিলন-বিরহ-ভাবসম্মিলন, নয় অন্তঃপুরে বিবাহ-বিচ্ছেদ-পুনর্মিলন : প্রথমটির ফুল রাধাকৃষ্ণ, দ্বিতীয়টির ফল শিবশিবানী। আদিম সাযুজ্যবোধ পরিণত হল আত্ম-নিবেদনে, প্রাচীন অনুষ্ঠানের পাশে এল প্রেম-ভক্তির আলোকচেতনা। যা ছিল জীবননির্ভর, তা হল হৃদয়ঘনিষ্ঠ। রিয়েল থেকে আইডিয়ালে।

রাধাকৃষ্ণ—শিবশিবানীর উদ্ভব সমাজভূমি থেকে, বিকাশ সমান্তরাল শাখায়, উপনীতি একই কূলে। এঁরা একাত্মক না হলেও পরম আত্মীয়।

বৈষ্ণব সাধনার ভিত্তি ভাগবত পদ্মপুরাণাদিতে ; সাধন রাগানুগা প্রেমভক্তি, লীলা পঞ্চরসায়নে। শাক্ত আরাধনার ভিত্তি তন্ত্র কালিকাপুরাণাদিতে ; সাধন মাতৃমুখী শক্তি, ত্রি-আচার ষটচক্রপথে। কৃষ্ণের বাস বৈকুণ্ঠে ও বৃন্দাবনে, কালীর আবাস কৈলাসে ও বিন্ধ্যাচলে। কৃষ্ণের হাতে বাঁশী পৃষ্ঠে পীতবসন, কালীর হাতে অসি পৃষ্ঠে মেঘবরণ কেশ। একজন ঘনশ্যাম আরজন ঘন শ্যামা। একজন কালীয়-দমন, আরজন কুলকুণ্ডলিনী। কৃষ্ণের প্রকৃতি 'সহজই গোর', কালীর পুরুষ 'রজতগিরিনিভ' শুভ্র। একজন খুশী কদম্বতলে, অন্যজনা জবাফুলে ; একের একাদশী, অপরের অমাবস্যা ; বাসন্তী ও হৈমন্তী, কালা আর কালী।

বৈষ্ণব আরাধকের লক্ষ্য ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণ, পথশেষে 'সোহম্' ; তান্ত্রিক সাধকের লক্ষ্য ব্রহ্মাণীস্বরূপা কালী, পথশেষে 'সাহম্'। প্রথমজনের অবলম্বন রাধা, উপায় হৃদয়সাধনা ; দ্বিতীয়জনের অবলম্বন শিব, উপায় দেহসাধনা। কৃষ্ণ প্রিয়তম সখা পুত্র, কালী প্রিয়তমা কন্যা মাতা। কখনও কখনও ভক্ত রাধাভাবিত হন, শাক্ত হন শিবভাবিত। রাধা শুধুই প্রিয়া, শিব প্রিয় জামাতা ও পিতা। এপারে মধুরারতি, ওপারে শ্রীবিদ্যা। এদিকে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্', ওদিকে 'তারা আমার নিরাকারা'—মাঝখানটিতে পূজারীচিত্তের মিলনমধুর শ্রী।

বৈষ্ণব সাহিত্য লিরিকের আভাস সত্ত্বেও আখ্যানপ্রধান, তার নাটগীতিতে কাব্যরস ; শাক্ত সাহিত্য আখ্যায়িকার আভাস সত্ত্বেও লিরিক-প্রধান, তার ভাবগীতিতে কথারস। বৈষ্ণব পদে, ভাগবতের অঙ্গে রূপকথার আভরণ—কুজনে ও গুঞ্জনে ইঙ্গিতে ও ভংগিতে ব্যঞ্জনাধূসর স্বপ্নলোকের সঞ্চরণ ; শক্তি পদে, তন্ত্রদেহে বস্তুকথার আবরণ—হাসিকান্নায় হীরাপান্নায় অশ্রুসজল পৃথ্বিলোকের অবাধ সঞ্চার। বৈষ্ণব রস আবেগমধুর, বাৎসল্য তার প্রেমপ্রবাহের একটি কণিকা। শাক্তরস বাৎসল্যে ভরপুর, মধুরতা তার স্নিগ্ধধারার একটি ভগ্নাংশ। বৈষ্ণব মূলত কৃষ্ণের সখী গৌণত তাঁর মাতাপিতা ; শাক্ত মূলত কালীর সন্তান গৌণত তাঁর মাতাপিতা। পঞ্চরস উভয়েই সেব্য, একটি রস উভয়েরই ভাব্য। কিন্তু সেই একটি রস এক রস নয়। তাই একে অনুভাব, আরে অনুভব।

কৃষ্ণ-কীর্তন চতুরঙ্গ, সে পশ্চিম বাঙলার মাটিঘেঁষা ; কালী-কীর্তন একাঙ্গ, সে পূব বাঙলার তীরছোঁওয়া। বৈষ্ণবের ভাষা লেখ্য ও সদরের, শাক্তের ভাষা কথ্য ও ঘরোয়া। বৈষ্ণবের ছন্দ শাস্ত্রসম্মত ও হিসাবী, শাক্তের ছন্দ চিত্তসম্মত ও বে—হিসাবী। বৈষ্ণব পদের অলংকারশাস্ত্র সংস্কৃতপাড়ার উজ্জ্বলনীলমণি, শাক্ত পদের অলংকারশাস্ত্র বাঙালীপাড়ার লোকশ্রুতি। প্রথম পদে প্রসাধিত সৌন্দর্য, দ্বিতীয় পদে সহজাত লাবণ্য।

কিন্তু সমান্তরাল প্রকাশ-আঙ্গিক সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সমানতার অভাব নেই। দেশকালের দ্বারা আবদ্ধ একই পাত্র থেকে দুজনের রসরূপ প্রাপ্তি, তাই ধারা দুটী যমজ না হলেও সহোদর। ব্যবধান শুধু বহিরঙ্গের।

বৈষ্ণব ও শাক্ত দর্শনের মূলে ত্রিতয় ধারণা—পুরুষ-প্রকৃতি সাধক : একদিকে রাধা-কৃষ্ণ-সখা, অন্যদিকে শিব-শিবানী-সন্তান। ভক্ত প্রথমে সখী তারপর রাধারূপে রাধানাথকে পাবার সাধনা করেন ; শাক্ত প্রথমে সন্তান হয়ে তারপর শিবরূপে শিবপ্রিয়াকে পাবার আরাধনা করেন। শেষে, তিনে মিলে একে উপনীত হয়। পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের দিক থেকে উভয় দর্শনের যাত্রা শুরু দ্বৈতে, সারা অদ্বৈতে। রাধা অভেদ হন কৃষ্ণে, শিব লয় পান শক্তিতে। উভয়ের মিলনে স্থির থাকে শুধু একটি বিন্দু, তার নাম 'পরমপ্রেম' কিম্বা 'পরাসম্বিৎ' ; বহমান থাকে একটি মাত্র অনুভূতি, তার নাম আনন্দ। সেখানে সাধ্য-সাধন-সাধকে, শক্তি-ভক্তি-মুক্তিতে ভেদহীন ধারণা ; এবং সেখানে রাধাকৃষ্ণ ও শিবশক্তি ভেদরহিত আত্মতনু। সহজিয়া উপাসনায় তাই স্থায়ী ভাব—'মন্দিরেতে আছে এক কিশোরী কিশোর' : সেই কিশোরী রাধা ও উমা, সেই কিশোর কৃষ্ণ ও শিব।

উভয়ের সাযুজ্যে 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল', 'ভুলি কালা কিম্বা গোরা'; তখন 'একঃ কেবলঃ'।

বৈষ্ণবী সুর শাক্ত স্বরে, শাক্ত ভাব বৈষ্ণব ভাবনায় মিলিত হয়েছে। হৃদয়ভাবের অনুশীলনের সঙ্গে যুক্তি হয়েছে দেহসাধনার পরিশীলন, বায়ুসাধনার চক্রপথ সরস হয়েছে আত্মনিবেদিত ভক্তির সিঞ্চনে। বৈষ্ণবে ও তান্ত্রিকে তখন ভেদরাহিত্য। দুটি আলোকশিখা, কিন্তু একই আলো। দুইই তখন সহজ সাধনা।

সাহিত্যের ছায়াপথিক আকাশে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদের সহজ সখ্যতা, সহজাত হৃদ্যতা। একের ভাব, অপরের প্রভাব। উভয় সাহিত্যে তত্ত্ব ও কাব্য একাধারে সমন্বিত, পার্থিব দুঃখ-শোক আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত—দুইই গানের তারা, বাঙালীর একই চিত্তগুহা থেকে বেরিয়ে-আসা ভাবনার পাখামেলা বলাকার দল। একটির পরিব্রাজনা বিধি-অসম্মত ও পথে পথে, অপরটির পরিক্রমা বিধি-সম্মত ও ঘরের মধ্যে। একটি অসামাজিক প্রেমবিলাসের ফুলবিছানো প্রাঙ্গণে, অপরটি সামাজিক দাম্পত্যলীলার কাঁটাছড়ানো আঙ্গিনায়। উভয় পদের আলম্বন-বিভাব দুটি হৃদয়ের মনোবিনিময়। রাধা ও উমা একই ভাবনার এপিঠ-ওপিঠ—উর্বশী ও লক্ষ্মী। রাধা প্রেয়সী, উমা জননী ও জায়া। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে—প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।'

বাঙালীর কাছে রাধা বিদেশিনী, দুর্গা ঘরের মেয়ে; বৈষ্ণবতা গৃহপালিত, শক্তিময়তা গৃহজাত। তবু এরই মধ্যে আছে বাঙলার মধু ও বাঙালীর মাধুরী। তাই অম্বিকা-পূজা আমাদের কন্যা-পূজা, গোপাল-উপাসনা পুত্র-উপাসনা। বালগোপাল ও বালিকা-উমা আমাদের ঘরেরই ধূলিমাটিতে আদরে আব্দারে চোখের জলে ও মনের আলোয় গড়ে-ওঠা—যাদের শিয়রে জেগে থাকে স্নেহবিহ্বল করুণাছলছল বাঙালী-হৃদয়, পলিমাটির মতই কোমল ও শ্যামল। দুজনের যখন বয়স বাড়ে, তখন বাঙালীচিত্ত এগিয়ে যায় রাধা হয়ে কৃষ্ণের কাছে নাবুঝ্ প্রেমের রসাবেশে, পেছিয়ে আসে শিব হয়ে কালীর কাছে অবুঝ্ স্বামীর রূপ ধরে। রাধা হন কৃষ্ণের বক্ষলগ্না, কালী শিবের বক্ষবিহারিণী। তখন বৈষ্ণব মহাজন বলেন, 'হৃদয় মন্দিরে কানু ঘুমাওল', শাক্ত সুজন বলেন, 'শ্মশান করেছি হৃদি···নেচে নেচে আয় মা শ্যামা।'

অন্যদের আছে দোহা অভংগ ভজন, বাঙালীর আছে কোমলকান্ত পদ। আমাদের সংস্কৃতির প্রাগাধুনিক পথটি বহুবিস্তৃত পদাবলীর পদচিহ্নিত—কখনও ভৈরবী, কখনও পূরবী কখনও বা বিভাসের সুরে বাঁধা, বহু হৃদয়ের চলায় চলায় বাজছে। আমাদের মনোভূমির ওপর দিয়ে আখ্যানকাব্য বয়ে চলেছে যেন মেদবহুলা নদীর মতো, আর তার দুই তীর পদাবলীর চন্দন-লেপনে বাঁধা—আদিতে চর্যাপদ, মধ্যে বৈষ্ণব পদ, অন্তে শাক্ত পদ। মহাকাব্যের তটে গীতিকাব্যের ঢেউ।

যেন জলকল্লোলের পায়ে নূপুরধ্বনি, তীব্র নিখাদের পাশে ললিতপঞ্চম।

কমলিনী রাই

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ধর্ম ও সাহিত্য শাস্ত্রমুখী ও শাস্ত্রবৈমুখী। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তিবাদে, সাধ্য ও সাধনে সে যেমন প্রবীণ, তেমনি নবীনও। তার এক কোটিতে ভারতীয় নরনারীর প্রেমধারণা, অন্য কোটিতে বঙ্গীয় গৌরাঙ্গের পিরিতি সাধনা, আর মধ্য-কোটিতে লীলা-রহস্য-প্রদর্শনীর শিল্পকলা কৃষ্ণের প্রতি রাধার (তথা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার) মানসাভিসারের চিত্রায়ণে পরস্মৈপদী উপাদান আহৃত হয়েছে শাস্ত্রীয় প্রেমভক্তি ও সাহিত্যিক কাব্য অলংকার থেকে, রাসায়নিক মিশ্রণ হয়েছে আত্মনেপদী আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়পরতার। বাঙালিনী রাইয়ের পরিব্রাজনা পূর্বরাগ থেকে, দর্শন ও শ্রবণ তার শুরুরেখা ; পথে পথে মানআক্ষেপ মিলনবিরহের নিত্যলীলা ; ব্রজপ্রাপ্তি ভাবসম্মিলনে—মনন ও নিদিধ্যাসন তার সমাপ্তিরেখা। সেই চলমান বিবর্তনে তিনি মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ; ধীরা অধীরা ও ধীরাধীরা তার ছোট ছোট আবর্তন। তার মধ্যেও কত চিত্র ও বৈচিত্র্য রূপ ও অরূপতা। শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে ও গুণশ্রবণে হৃদয়ের যে আকস্মিক উদ্বোধন, নিখিলরসামৃতির আনন্দসমুদ্রে তার বিচিত্র ধ্যানলীনতা। যেন শতদল পদ্মের এক একটি পাপড়িমেলা, সোনার ভ্রমরের সোনালী ফুল হয়ে ফুটে ওঠা, যেন—পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল···অনুদিন বাঢ়ল পেখন না গেল।

এই প্রস্ফুট পুষ্পের দলে-দলে সচিত্র কারুকার্য। উদ্দীপন বিভাবের অনুপ্রেরণায়, সঞ্চারী ভাবের সহযোগে, অনুভাবের কর্মকৃতিত্বে, স্থায়িভাব কৃষ্ণরতির স্থাপনা, আলম্বন বিভাব রাধাচিত্তের উদ্বর্তন। রসধ্বনির বৈদেহী সঞ্চরণে দেহজ রতি ও দেহাতীত আরতির, ইন্দ্রিয়জ কাম ও অতীন্দ্রিয় প্রেমের আলোছায়া খেলা।

দলের আছে উপদল, বৃতির উপবৃতি। রাধালীলার এক একটি পর্যায়ে তাই বিভিন্ন ভাব, ভিন্নতর রস। তার কোথাও গীতিকাব্যের নিশ্চল স্থিতি, কোথাও গীতিনাট্যের সচল গতি—যেন স্থির কেন্দ্রবিন্দু ও পরিধির অস্থিরতা।

পূর্বরাগে যিনি বিবশব্যাকুলা, অনুরাগে তিনি পরবশা ; সম্ভোগে যিনি সানন্দা, বিরহে তিনি বেদনবিমথিতা ; মিলনে অহংকৃতা, ভাবসম্মিলনে নিরলংকৃতা ; পথের শুরুতে অবিশুদ্ধা—দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা, পথের শেষে পরিশুদ্ধা--দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিযা। কমলহীরের বিগলনে বিমল আলোর উদয়।

সেই আলোকিত পাপড়িরই বা কি অসীম সুন্দরতা ও ব্যঞ্জিত ভাব-নিবিড়তা। বিষ্ণুপদের একটি একটি পদে রাধার একটি একটি রূপ। কোথাও তিনি প্রেমের আলোকে বেনারসীর আঁচলের মত ঝলমল, কোথাও বিরহের আঁধারেও পট্টবস্ত্রের মত পবিত্র; কোথাও প্রসাধিত সৌন্দর্যের স্বর্ণাভা, কোথাও সহজাত লাবণ্যের হিরকদ্যুতি। একবার দেখি তাঁকে থির বিজুরি কনক গোরি, আরবার বুঝি তাঁকে অথির বিজুরিক পাঁতিয়া। কখনও তিনি রূপসৌন্দর্যের লক্ষ্মী, কখনও প্রেমমাধুর্যের সরস্বতী—যেন বিভাস আর পূরবী। একটি চিত্র ও ধ্বনির অনুলেপে রূপসাহিত্য, অপরটি ভাব ও ব্যঞ্জনার বিলেপনে রসসাহিত্য। একবার কানে বাজে গীতিকাব্যের সুর, আরবার চোখে ভাসে গীতিনাট্যের স্বর। একে কেন্দ্রীয় গভীরতায় অবগাহন, অপরে বিকেন্দ্রিক প্রসারতায় সন্তরণ। তখন অনুভবের দ্বিবেণীসংগমলীলায় রস-রূপ অর্ধনারীশ্বর। তখন কবির কল্পদৃষ্টিতে এই ভুবনের একটি অসীম কোণ…যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন ; তখন ভক্তের হৃদিবৃন্দাবনে দুহুঁ দোঁহা হয় ; আর দার্শনিকের তত্ত্বলোকে—তদ্ যথা প্রিয়যা স্ত্রিযা সম্পরিষ্যক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চ ন বেদনান্তরম্।

এক থেকে দুই, দুই থেকে আবার এক। নদীর জন্ম সমুদ্র থেকে, লয়ও সেখানে। একসময়ে যাত্রা শেষ হয়; মোহানার বিঘিন বিথার পেরিয়ে গোরী নদী ঝাঁপিয়ে পড়ে মিলনের আকুলিত আকাংক্ষায় মহাসমুদ্রের অতল নীল বুকের ওপর—এক আর একে মিলে এক হয়।

কৃষ্ণৈকমুখী রাধার একাগ্র অভিসারের লীলাবিলাস শান্ত হয়ে আসে মাথুরের দিকসীমানাহীন মোহানামুখে। প্রাথমিক উচ্ছলতা স্থিতধী হয় ; বিরহের হাহাকারভরা আর্তি অবসিত হয় শরণাগতির মিলনানন্দে ; ফাটি যাওত ছাতিয়া তখন—বিরহ মরণ নিরদন্দ ; তখন, কি কহববে সখি আনন্দ ওর! চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর। শুধু হৃদিমন্দিরেই নয়, অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই। সকল পার্থিব চেতনা ও অহংকার মায়ামোহ ও ভেদবুদ্ধি বিরহমিলনের দ্বন্দ্বাভাস সমূলে বিলুপ্ত হয়ে একের মধ্যে

আরের নিমজ্জন, একের সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া। একদা পরমাত্মা আত্মবিভক্তি করেছিলেন লীলার্থে, বহুধা হয়েছিলেন নির্জনতাকে জনতায় ভরিয়ে তুলতে। দ্বিধান্বিত ও বহুবচনান্বিত বিরহ-মিলনের রসবিহারের অন্তিমে এসে তাঁরই মধ্যে জীবের ও দ্বিতীয়ার পুনর্বিলয়, তখনই পূর্ণ মিলন। সৃজন-প্রলয়ের মহাসংগমসমুদ্রের সেই কেন্দ্রবিন্দুতে রাধা ও কৃষ্ণ, ভক্ত ও ভগবান অভেদ। সীমার বুদ্ধি অসীমের বোধিতে, দ্বৈতের অপরা বিদ্যা অদ্বৈতের পরাসম্বিতে উত্তীর্ণ, ব্রাহ্মীস্থিতির অনির্বচনীয় উজ্জীবন। তখন কবির দৃষ্টিতে, সবই সেই এক কেবলই এক ; ভক্তের দৃষ্টিতে, রাধাকৃষ্ণ অভেদ আত্মতনু ; দার্শনিকের দৃষ্টিতে, তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞঃ হংস সোঽহং বিভাবয়। তখন—

শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা।
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ,
তার লঘু ছন্দ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। (পত্রপুট)

তখন, ব্রহ্মবিহার আর রসাস্বাদন ভেদরহিত অনুভব।

শাক্ত পদাবলীর ভূমিকা

আর্য পৌরাণিক ভাবনার স্পর্শে বাঙলার লৌকিক ধর্ম ও স্থানীয় দেবতাগণ যখন প্রকাশ ও প্রচারযোগ্য রূপ গ্রহণ করল, তখনই অখণ্ড বঙ্গ-সংস্কৃতির জাগরণ ঘটল। একদিকে দর্শনতত্ত্ব, অন্যদিকে কথা ও কাহিনীর যোগসমন্বয়ে বাঙলার মঙ্গলকাব্যগুলি হল নব্য পুরাণ, পদাবলী হল লীলাসাহিত্য। তাই চণ্ডীমঙ্গল পুরাণানুসারে যেমন ধর্মায়ন, অপর দিকে তারই পাশাপাশি শিবদুর্গার গার্হস্থ্য-জীবনের সাহিত্যায়ন। শিব-শিবানীর বিবাহ ও তার অন্তে সাংসারিক দুঃখ-ধান্দা, কলহ-প্রীতি এগুলি একান্তভাবেই বাঙালীর গৃহস্থজীবনের প্রতিচিত্র, বাঙালী কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত ভাবনা-বাসনার অষ্টমঙ্গলা।

শাক্ত পদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়া' অংশটি চণ্ডীমঙ্গলের এই বাস্তব অনুকৃতির পরিণত ধারা; শারদীয়া দুর্গোৎসব তার পটভূমিকা। পুরাণে যখন মেনকা ঘরজামাই শিবের প্রতি কটূক্তি করেন, শক্তিপদে প্রবাসিনী কন্যার জন্য মাতৃহৃদয় তখন ব্যাকুলিত হয়ে ওঠে; মায়ে-ঝিয়ে মনের আদান-প্রদান হয়। আসে যাবার দিন। ব্যথার সমুদ্র উদ্বেল হয়। চোখের জলের ঝালরে শেষ দৃশ্যটি সকরুণ হয়ে ওঠে। বাঙালী মা'র মনে জাগে তার অনুরণন।

চণ্ডীমঙ্গল ও শাক্ত পদাবলীর এই শিব-উমা-মেনকা কথা অশাস্ত্রীয়, সংসার-সীমার প্রাঙ্গণ থেকে আহরণ করা। তবে দুটি কাহিনী দুই কালের ও দুই মনের। চণ্ডীকাব্যে শিব-উমা, শাক্তকাব্যে উমা-মেনকা। প্রথমটির স্থান কৈলাস, দ্বিতীয়টির হিমালয়গৃহ। চণ্ডীকবি ছবিটি দেখেছেন শিবের চোখ দিয়ে, শাক্তকবি দেখেছেন মেনকার মন দিয়ে। চণ্ডীমঙ্গলের কবি সাংবাদিক, শক্তিপদে তিনি মেনকা। একটিতে দাম্পত্যলীলা ও মধুর রস, অপরটিতে মাতৃলীলা ও বাৎসল্য রস। একের সাধ্য আখ্যানপাতন, অপরের সাধ্য গীতিকাব্য। তথাপি উভয়ের লক্ষ্য ঘরোয়া লীলারস, পার্থক্য মননে ও প্রকাশভংগিতে।

এই পার্থক্যের মূলে বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্যের কাব্যময় অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলার পদে নন্দগোপাল ও যশোদারূপী কবির

লীলাবিলাস থেকেই শক্তিপদে কবি-মাতা ও কন্যা-উমার লীলাপ্রকাশ। আরও উজিয়ে গেলে, সেনযুগীয় সদুক্তিকর্ণামৃতে শিবদুর্গার দরিদ্র গৃহের চিত্র মেলে; বাঙলার লোকগীতির মধ্যেও মাতা ও কন্যার প্রীতিবিনিময়ের ছবি দুর্লভ নয়। শক্তিপদে এদের প্রভাবও ছায়াসঞ্চারী; কিন্তু আবেগের বেগ ও আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতার অন্তরঙ্গতাটুকু বৈষ্ণবী।

সবার ওপরে রয়েছে তন্ত্রের ধারণা, যে-তন্ত্র বাঙালীর আত্মসৃষ্টি। তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে, ইষ্ট-দেবতা মাতৃরূপিনী। তিনি জগজ্জননী, ঘোরা রুদ্রা, রক্তমাংসাস্তি ভৈরবা, ডান হাতে তাঁর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ। শাক্ত কবির দৃষ্টিতেও জগন্মাতা ত্রিপুরসুন্দরী, অতিবিস্তারবদনা, জিহ্বাললনভীষণা, প্রলয়ংকরী ভয়ংকরী রৌদ্রী; আবার তিনি করুণাময়ী স্নেহময়ীও: বাঙলার প্রকৃতি ও বাঙালিনী মা'র প্রতিচিত্রণে ভয়ানকসুন্দর—অন্নরিক্তা তিনি ভীষণা, অন্নপূর্ণা তিনি সুন্দরী, তাঁর দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র অগ্নিবরণ।

শাক্ত পদাবলীতে মা তাই বিশ্বময়ী ও লীলাময়ী। তিনি সনাতনী আদ্যাশক্তি-রূপে বিশ্বধাত্রী, আনন্দময়ী পুরুষপ্রকৃতিরূপে লীলারতা, স্নেহাতুরা মাতারূপে সন্তানের আশ্রয়। তাঁকে পেতে হলে, বৈধী উপাসনা বা দেহসাধনার চেয়েও বড়ো ক'রে চাই অন্তর-ভক্তি। তিনি শুধুই শক্তির আধার নন, করুণার আধেয়ও। মার আঁচল ধরেই তাঁর কোলে আশ্রয় মেলে। উপাসনা-অভিচার-দেহশোধন-আত্মশুদ্ধির স্তর পেরিয়ে ভক্তচিত্তে জাগবে মাতৃভক্তির নিগূঢ় কামনা, তার হৃদি হবে শ্মশান: আর তার ওপর নৃত্য করবেন শ্যামা—কখনও জ্যোতির্ময় সহস্রারে পা ফেলে ফেলে, কখনও হৃৎপদ্মদলের অণুপরমাণুতে নিরাকারা তারারূপে ছড়িয়ে প'ড়ে। শক্তির সোপান ও ভক্তির ভেলা সাধককে পৌঁছে দেবে 'সাহম্'-এ।

মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী ও শাক্তপদাবলীর শক্তির এইখানেই মূলগত পার্থক্য। মঙ্গলচণ্ডীও আদ্যাশক্তি ভক্তের অধীনা, কিন্তু শাক্তের মা নন তিনি, ভক্তের ডাকে সাড়া দেন, কোল দেন না, মুক্তি দেন, লীলা করেন না, সৃষ্টি করেন শিবকে, তাঁর সঙ্গে অভেদ মিলনে 'পরাসম্বিত'হন না। শাক্ত পদের এই 'ভক্তি' ও 'লীলা' বৈষ্ণব পদাবলীর দান, দেহসাধনা ও পরাসম্বিতের ধারণা তন্ত্রের আলো। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদ, তন্ত্র, লোকগীতি এবং লোকায়ত ধর্মের ও জীবনের যোগফলে শাক্ত পদাবলীর জন্মসম্ভাবনা। এই সমন্বয়েই শাক্ত কবির কৃতিত্ব। তাই কবিসাধক একদিকে যেমন মাতৃচরণ পাবার আশায়

কৃচ্ছ্রসাধনরত, অন্যদিকে তেমনি ঘরের মা'র মতই তাঁর কাছে তার আদর-আবদার-অভিমান। তত্ত্বদর্শন আর রসতত্ত্ব, আদ্যাশক্তিত্ব ও মাতৃত্ব, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, ভীতিবোধ ও আনন্দবোধনার গঙ্গাযমুনাসংগম।

চণ্ডীমঙ্গল আখ্যানকাব্য, শক্তাপদ গীতিকবিতা। মঙ্গলকাব্যে কথারস, পদাবলীতে গীতিরস। মঙ্গলকাব্য কথার মালা, শাক্তপদ গানের ফুল। তন্ময় ও ও মন্ময়। চণ্ডীমঙ্গলের মহাকাব্যিক বপু বৈষ্ণব পদাবলীর কাঁকনকিংকিনীতে ঠেকে গীতিকবিতারূপে ছড়িয়ে পড়েছে কণায় কণায়। বৈষ্ণব পদাবলীর নাম নিয়েই শাক্ত পদাবলী, কৃষ্ণকীর্তনের ভণিতা নিয়েই কালীকীর্তন; বৈষ্ণবী স্পর্শেই শাক্ত লিরিকের আবির্ভাব, বৈষ্ণবী সুরের শিখা থেকে আলো নিয়ে শাক্ত স্বর গানের তারা।

তথাপি শাক্তপদ স্বকীয়, স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ। বৈষ্ণবের জগৎ অভিজাত স্বপ্নহর ললিতসুন্দর, সে সীমাকে অসীম করে; শাক্তের সাধনা পটাকাশকে ঘটাকাশে বেঁধে রাখা, অনন্তকে সান্তের সীমালগ্ন করা। বৈষ্ণবের বাৎসল্য ঐশ্বর্যমুখ্যা, শাক্তের বাৎসল্য মধুরাখ্যা। তার রামপ্রসাদী সুর-ছন্দ অলংকারশাস্ত্রের ছককাটা নয়, সারি জারি বাউলের সহযাত্রী। তার অলংকার সংস্কৃতের স্বর্ণসিন্ধুক থেকে ধার করা নয়, বাঙলার লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে প'ড়ে পাওয়া।

বৈষ্ণব ও শাক্ত পদে ভক্ত ও কবি, সাধক ও সন্তান, অভিন্ন। স্থানকাল-পাত্রের ব্যবধানে বিষ্ণুপদ কেবলই মধুরং বন্ধনহীন সুখের নিলয়, শক্তিপদ মধুর-কষায় সুখ-দুঃখের আলয়। দুইই রোমান্টিক—একটিতে বাস্তব কল্পনার নিকট আত্মনিবেদিত, অপরটিতে কল্পনা বাস্তবের নিকট আত্মসমর্পিত। দুটিতেই শরণাগতি—একটিতে লীলাময় প্রেমিক হৃদয়ের কাছে, অপরটিতে শক্তিময়ী মাতৃচরণতলে। একের ইষ্ট পরম পুরুষ, অপরের পরমা প্রকৃতি। এক কবির সখীভাব, অপরের সন্তানভাব। একের সাধ্য প্রেমভক্তি, অপরের সাধন মাতৃভক্তি। বৈষ্ণবে যার শুরু, শাক্তে তার শেষ। দু'য়ের যাত্রা দ্বৈতসাধনায়, পরিণতি অদ্বয়সমুদ্রে। পথ হয়ত ভিন্ন, পথিক হয়ত পৃথক, কিন্তু পথশেষে যিনি অপেক্ষা করছেন তিনি এক—'নেয়ম্ যোষিৎ ন চ পুমান্।'

শক্তি ও শাক্ত

ঋগ্বেদে নারীদেবতার বন্দনা ও বর্ণনা দুর্লভ নয়। কিন্তু তাঁরা কেউই শক্তিময়ী দেবী নন। বাক্‌সূক্তের—

> ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
> অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নি অহমশ্বিনোভা ॥ ১
> অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
> তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং ॥৩
> অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ।
> অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥৬

—এই শ্লোকগুলিতে জগতের আদি কারণ একটি শক্তিতত্ত্বের কল্পনা থাকা সত্ত্বেও বৈদিক আর্যরা যে কোন শক্তি-দেবতার উপাসনা করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁকে প্রথম পাওয়া যায় যজুর্বেদোক্ত 'ত্র্যম্বকহোম'-এ রুদ্রভগিনী অম্বিকারূপে ; কেন-উপনিষদে ব্রহ্মের শক্তিরূপে উমা-হৈমবতীর আবির্ভাব ; ক্রমে অন্যান্য উপনিষদে তাঁর সাক্ষাৎ ও উল্লেখ পাওয়া যেতে থাকে ; ধীরে ধীরে তিনি শিব ও বিষ্ণুর সমতুল্যা হয়ে উঠলেন। দেবীর এই বিবর্তনের ইতিহাস তাঁর শক্তিসঞ্চয়ের ইতিবৃত্ত, আর্য পৌরুষ দেবমণ্ডলীতে অনার্য মাতৃদেবতার ক্রম-প্রতিষ্ঠা। তার ফলে নানা কাহিনীর অবতারণা ও সংযোজনা, দেবদেবীর বিচিত্র সম্বন্ধ-নির্ণয়। শক্তি প্রকটিত হলেন তত্ত্বরূপে—'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা' ; ব্রহ্মেও তিনি—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমাংসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী (শ্বেত. উপ). ; সাংখ্যতত্ত্বেও তিনি—পুরুষের প্রকৃতিরূপে। শক্তি হলেন তন্ত্রের, শক্তি হলেন শিবের।

গর্ডন চাইল্ড দেখেছেন The oldest concept in Sumerian Theology was the Mother Goddess। শুধু সুমের নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক অঞ্চলে মাতৃকা আদিতম দেবতা, বিশেষত কৃষি-সংস্কৃতিতে : গ্রীসের রী-আফ্রোদিতে, রোমের সিবিলি, জার্মাণীর নের্থাস, মেক্সিকোর ৎলিল্লি ইলল্লি,

ইসরাইলের যহু, বাবিলনের ঈশতার, মিশরের ঈসিস, আরবের অল্লাৎ-অল্উজ্জা, ফিনিসীয়দের আশতার্তে, বাইবেলের কুইন অফ্ হেভেন, ভার্জিন মেরী এবং ভারতের শক্তিদেবতা। এই সমস্ত শক্তিদেবীর উৎসস্থল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 'মা'।

মাতৃতান্ত্রিক কৃষি সমাজে মাতৃদেবতার কল্পনা। নারীরূপে সাধনা ও নারীসহ সাধনার বীজ ও উৎপত্তিও এখানে। সমাজকর্ত্রী মাতার উপলব্ধি থেকে বিশ্বকর্ত্রী মাতার ধারণা। আবার কৃষকের কাছে পৃথিবী অন্নদা; তাঁর গর্ভে শস্য প্রজাত, সেই শস্য প্রাণদায়িনী; ধারণ করে আছেন তিনি সসাগরা পর্বত অরণ্য প্রান্তর লোকালয়। অতএব তিনি জীব ও জড়ের সৃষ্টির আধার, পালয়িত্রী, আদিমাতা। ঋগ্বেদে তাই বলা হয়েছে, 'মাতা পৃথিবী মহীয়ং'।... ক্রমে মানুষ বুঝল, একাকিনী পৃথিবী সৃজন-অক্ষমা; আদি পিতারূপে কল্পিত হল আকাশ বা সূর্য, বর্ষা হল মিলনের দ্যোতক, উভয়ের যোগে জাত যা কিছুসব। অতএব মানুষ তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানায়—'দ্যাবা-পৃথিবী রক্ষতু নো অভ্বাৎ'। ক্রমে দ্যৌস্পিতর্ ও পৃথ্বিমাতার বিরহ-মিলন-বিবাহ কল্পিত ও কথিত হতে থাকে। অথর্ববেদের 'পৃথিবীসূক্তে' প্রার্থনা হয়ে উঠেছে গান: পৃথিবী দেবী ও জননী, কল্যাণী ও সন্তানবৎসলা, প্রকৃতিরূপা ও প্রাণরূপা; মানুষও শস্য ও প্রাণীর মত তাঁর সন্তান; তার বিশ্বাস—'পুত্রো অহং পৃথিব্যা'!

যাযাবর আর্যরা ক্রমশ কৃষিনির্ভর হয়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে আর্যেতর প্রত্যক্ষ প্রভাব—মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার মাতৃমূর্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মূর্তিগুলি প্রাণ ও প্রজনন শক্তির প্রতীক, পৃথিবী ও শস্যদেবী। এই জাতীয় দেবী ভারতের অনার্য সমাজে নানা নামে রূপে বিরাজমানা। ক্রমে ক্রমে তাঁরা আর্য স্বর্গে স্থান পেতে থাকেন। অম্বিকা এসেছিলেন ভারতের উত্তরের পাহাড়-তলী থেকে; হিমালয়ের কোলে তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলের দেবীদের সঙ্গে তাঁর যোগ-সাদৃশ্য বিদ্যমান। পুরাণের চণ্ডী নিজেকে বলেছেন বিন্ধ্যবাসিনী ব্যাধপুলিন্দশবরদের পূজিতা। দাক্ষিণাত্যের দ্রবিড়ী দেবী-অম্মদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ অনস্বীকার্য। প্রতিমার গঠনে বোঝা যায়, দুর্গা, কালী যুদ্ধ শিকারের দেবী; একজন অসুরবিমর্দিনী, অন্যজন শববিহারিণী। আদিমতার পরিচয় দুর্গার মধ্যে আজ সহজে চোখে পড়েনা, কালী-শ্যামার মূর্তিতে ও সাধনাচারে তা আজও স্পষ্ট। তার ভীতি ভয়ংকরত্ব রোমাঞ্চ আত্মনিপীড়ন রহস্যময়তা সাংকেতিক রীতি-মন্ত্র-বীজ-ন্যাস, যৌন আচারের সহযোগিতা ইত্যাদি

আদি কৌম সাধনার ইঙ্গিতবহ ও পরবর্তী পরিণতি। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আধুনিক—Saktism answers to many fears and passions that are deep in the human soul, and seems to be a part of the Universe (E. A. Payne)। এর আদিরস আদিমতা ও রৌদ্ররস। সব দেবতারই আদিরূপ প্রমথ-প্রমথিনী, তাঁরা উগ্র ও রুদ্র, বিশেষত যাঁরা ভয়ংকরের প্রতীক।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা। নিমগ্নরক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। দ্বিপীচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥

কালীর এই রূপের সঙ্গে তুলনীয়—

আদাদ :

When the lord is enraged, the heavens tremble before him,
When Adad is enangered the earth quakes before him.
Great mountains are cast down before him.
At his anger at his wrath,
At his roar at his thunder,
The Gods in heaven retire into the heavens,
The Gods of earth recede into the earth.

ঈশতার :

Thou art the light of heaven and earth, mighty daughter of sin,
Thou directest the weapons, arrangest the battle array,
Thou givest commands, decked with the crown of rulership,
O lady, resplendent is thy greatness, supreme over all gods. ...
At the mention of thy name, heaven and earth quake,
The Gods tremble.
To thy awe—inspiring name mankind gives heed,
Great and exalted are thou ! . . .
I moan like a dove night and day.
I am depressed and weep bitterly,
With woe and pain my liver is in anguish,
What have I done, O my god and my Goddess—I ?

ঈসাইআ :

And I will tread down the people in mine anger,

and make them drunk in my fury, and I will bring down their strength to the earth.

জোব :

his teeth are terrible round about, out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out. Out of his nostrils goeth smoke. His breath kindleth coals. Upon earth there is not his like who is made without fear.

আমাদের শক্তিও বলেন, 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা', এবং—

স্রষ্ট্যর্থং পুরুসাং যূয়াং ময়া স্রষ্টাঃ নিজেচ্ছয়া।
তৎ কুরুধ্ব মহাভাগে যথেচ্ছা মম জায়তে ॥ (মহাভাগবত)

পুরাণের অন্যতমা প্রধান দেবতা শক্তির শাস্ত্র তন্ত্র। তাঁর বিভিন্ন রূপের বর্ণনাসহ গুণাবলী ও পূজারীতি সেখানে বিবৃত হয়েছে। তিনি ব্রহ্মাণী জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি সর্বকারণ-কারণ সৃষ্টির আদ্যের ধাতৃ। তিনি ভীষণা ও মধুরা, প্রলয়ী ও স্নেহময়ী, কালভয়রূপিনী ও কালভয়হারিণী। তিনি সৃষ্টি করেন ও মুক্তি দেন—'শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তি হাস্যায় কল্পতে'। মহাকালতন্ত্রে তিনি পুরুষের বামে বামারূপিণী, কাশ্মীরী তন্ত্রে ভৈরবী ত্রিপুরসুন্দরী, রাধাতন্ত্রে রাধারূপা, মুণ্ডমালাতন্ত্রে রাধা কালী রুক্মিনী পার্বতী ইত্যাদি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, বাহির-ভারতের তিব্বতী ভুটানী চীনাচার প্রভৃতির যোগে শক্তির নানা রূপ-নাম-ভাব শাস্ত্র-সম্প্রদায়। বাঙালীর আরাধ্যা দেবী শ্যামা—দশমহাবিদ্যার প্রথম বিদ্যা। বৈদিক রুদ্রের ভয়ংকরত্ব ক্রমে শান্ত হয়ে এলে তাঁর ভীষণতা ফুটে ওঠে শ্যামায়, ভীষণমধুরা কালী মহাকালের শূন্যস্থান পূরণ করেন। রুদ্রের প্রলয়ী রূপ নটরাজ মূর্তিতে, তাঁর পদতলে অপস্মার দৈত্য দলিত। দেবী ছিলেন শবাসনা, ক্রমে শব হলেন শিব। একদিকে তিনি অসুর-নিসূদনী, অন্যদিকে শিবের বক্ষ-বিহারিণী। ধীরে ধীরে শৈব-শাক্তমত মিশে যেতে থাকে, সাংখ্যের তত্ত্ব তাকে সহায়তা দান করে। বলা হল—স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্বং পুরুষং শিবরূপিনম্। অভেদ চিন্তয়েদ্ বস্তু স এব দেবতাত্মকঃ (কুব্জিকা তন্ত্র)। শিব ও শক্তি পরস্পরের পরিপূরক হলেন; একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব নাস্তি। উভয়ের অদ্বয় যোগেই জ্ঞান ও কর্ম ইচ্ছা ও ক্রিয়ার প্রকাশ ও বিকাশ। আবার প্রত্যাহারের পথে—শিবমধ্যে গতা শক্তিঃ ক্রিয়ামধ্যে স্থিতঃ শিবঃ। জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তি ইচ্ছয়া॥ ইচ্ছাশক্তির্লয়ং যাতি যত্র তেজঃ পরঃ শিবঃ। (কৌল-জ্ঞান নির্ণয়)। একের মধ্যে আরের লয়, সেই মিলিত বিন্দুর নাম 'পরাসম্বিৎ',

যেখানে নিগু´ণ-সগুণের রূপ-অরূপের 'সামরস্য' (শারদাতিলক), যেখানে মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি, মহাসুখ ও মহৎ ঐক্য।

ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব শাক্ত ইত্যাদি ভেদে তন্ত্র বিভিন্ন। কিন্তু সে ভিন্নতা বহিরঙ্গ। তন্ত্র একটি ব্যবহারিক সাধনাচার, এবং সেইরূপে সকলের মধ্যে অনুস্যূত। তন্ত্রসাধনার আচার বা ভাব পর্যায় তিনটি—পশু-বীর-দিব্য। পশ্বাচারী সাধনায় ভোগবাসনা থেকে সংযমে উত্তীরণের প্রাথমিক প্রয়াস, সাধনকর্মের দ্বারা উচ্ছৃংখলতার নিয়ন্ত্রণ। এর জন্যে প্রয়োজন নারীসহ পঞ্চ ম-কারের সাধনা (মৎস্য-মাংস-মুদ্রা-মদ্য-মৈথুন। তুঃ শিখদের পঞ্চ ক-কার—কেশ-কৃপাণ-কংকণ-কাঁকই-কাছ)। বীরাচারী সাধনায় উচ্চতর শক্তির কামনা, ভোগবিবত চিত্তের পাশ-মুক্তির প্রচেষ্টা।এই অষ্টপাশ হল, ছয় রিপু, ক্ষুধাতৃষ্ণ, ঘৃণা ; মতান্তরে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘৃণা ভয় লজ্জা মান রাগ দ্বেষ। এই পাশমুক্তিতে 'বিরক্তচিত্তে' জাগে আত্মচৈতন্য, জীব এগোয় শিব হবার পথে। তখন তার অধিকার জন্মে শ্রেষ্ঠতম ও শেষতম আচার—দিব্যভাবের সাধনায়। এর রীতিনীতি নিয়মতন্ত্র ও আনুষ্ঠানিক কর্মের অতীত, মানসিক ও চৈতন্যঘটিত অন্তরঙ্গ সাধন। এই সময়ের করণীয়'অজপা জপ'। হংসমন্ত্রের উলট্ সাধনায় জাগে সোহং বোধ : 'তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞঃ হংসঃ সোহহং বিভাবয় (মহানিবাণ তন্ত্র)। তখন সমাধি, শক্তিতত্ত্বে নির্ব্যূঢ় সমাহিতি।

তন্ত্র দেহসাধনা। দেহভাণ্ডস্থিত আত্মার চৈতন্য-উদ্বোধনে সহায় হয় যে প্রাণশক্তি, তিনি কুলকুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে নিদ্রিত থাকেন। তাঁকে জাগ্রত করে ষট্চক্রের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বে তুলে সহস্রারে শিবের সঙ্গে একীভূত করাই তন্ত্রসাধনা। সাধনের শুরু দ্বৈতভাবে, সিদ্ধি অদ্বয়ত্বে। ষট্চক্রের প্রথম তিনটি চক্র পশ্বাচারের অধীন, শেষ তিনটি বীরাচারের। মূলাধার চক্রে দেহমন শুদ্ধি, স্বাধিষ্ঠানে ভক্তিলাভ, মণিপুরে জ্ঞান, অনাহত চক্রে শুদ্ধিভক্তি, জ্ঞানের স্থায়িত্বে বীরভাবের আরাধনার সূত্রপাত। বিশুদ্ধাখ্যে ত্যাগে প্রবর্তনা, প্রজ্ঞাচক্রে ত্যাগে প্রতিষ্ঠা। তারপরেই দিব্যাচার—সহস্রারে উপনীতি : যেখানে শিবলোক, অনন্ত ব্যোম, অখণ্ড চৈতন্য, পরমাত্মায় পরম সমাধি, ব্রাহ্মীস্থিতি।

তন্ত্রের এই দেহসাধনা বায়ুসাধন চন্দ্রসাধন লতাসাধনা নারীসাধনা ইত্যাদির যোগে জটিল ও রহস্যঘন। চুরাশি লক্ষ জন্ম, চৌষট্টি নাড়ী, চোদ্দ ভুবন, দশ দিক, দশ দ্বার, আট পাশ, ষড়রিপু, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি তান্ত্রিক উপাদান অধিকাংশস্থলে সংকেতে ব্যক্ত।

মরমী দার্শনিক নিউম্যান জেনেছেন—None can enter the heaven without becoming a child, guiltless and simplified। এই ভাবটি মাতৃসাধনায় নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাঙলার শাক্ত সাধক যেভাবে সন্তানরূপে মায়ের উপাসনা করে গেছেন, এমন আর কেউ না। গৌড়ীয় শাক্ত সাধনার বাৎসল্য রস এত উচ্ছ্বসিত যে আরাধনার পাত্রে তার সবটা ধরেনি, কাব্যের আধারে তাকে ধরে রাখতে হয়েছে। মানুষ প্রকৃতিজাত বলে দেবী আত্মার জননী; জীব শক্তিজাত বলে শক্তিস্বরূপ। কিন্তু জীবদেহে আত্মা থাকে সুপ্ত, প্রাণের মধ্যস্থতায় তার জাগরণ হয়। কুলকুণ্ডলিনীই এই প্রাণময়ী প্রকৃতি। তিনি নব জন্ম দেন আত্মার, তাই তিনি মা। দুজনে একত্রে শুরু হয় পথচলা, তখন জীব শক্তিসহ মিলনের জন্য ব্যাকুল; কারণ তিনিই জীবের চৈতন্যশক্তি। প্রজ্ঞাচক্রে উভয়ের মিলন, তখন তিনি আত্মার ভাষা। শেষে সহস্রারে শিবসহ শিবানী ও জীবাণুর মিলন—একের মধ্যে তিনের সমাহার। মেরুপথে দেবীর গতাগতিকে বলা হয় নৃত্য, সাধকের চলাচলকে অভিসার—যেমন রাধারও। একের অভিসার ষটচক্র পথে, অপরের বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগের আটটি পর্যায়ে। প্রতিটি চক্রে সাধক শিব-শক্তির বিভিন্ন 'যামল রূপ' দর্শন করেন, আবার ভেসে যান মেরুপথের অসীম শূন্যে। রাধারও মিলনের পর বিরহ, বিরহের পর মিলন। বৈষ্ণবের 'সখী' শাক্তের 'সন্তান'। বৈষ্ণবের লক্ষ্য রাধা নয়, রাধার সহভাবে রাধানাথের নৈকট্য; শাক্তের লক্ষ্য শক্তি নয়, শক্তির সহযোগে শক্তিমানের নৈকট্য, শিবত্ব প্রাপ্তি। তাই মাতৃচরণলাভে তার এত আকৃতি; ঐ চরণতলেই সব, ওইখানেই শব—অর্থাৎ শিব। সাধনশেষে জীব-শক্তি-শিবের অদ্বয়ত্বপ্রাপ্তি, যেমন জীব-রাধা-কৃষ্ণেরও (সেই আদিম আকাশ বা সূর্য-পৃথিবী-শস্যের ত্রয়ী ধারণা)। তখন—'জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ' (কুলার্ণব তন্ত্র)।

বাঙলার শাক্তধর্মে কৌম ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও তন্ত্র ধর্মের স্বাক্ষর পড়েছে। শাক্ত সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর যোগাযোগে শাক্ত পদাবলী। তার সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টিভংগি ভারতীয় ঐতিহ্যসঞ্জাত, আবার বাঙালীর নিজস্ব সংস্কারগতও। শাক্ত পদকর্তা সাধক ও কবি। কালীকীর্তন ধর্ম ও তন্ত্রের ভাষারূপ, জীবন ও মননের কাব্যরূপ, স্বর্গ ও মর্ত্যের সমন্বয়।

বৈষ্ণব পদ পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত, প্রেমের অসীম পাথার—তারই বেড়া ও বেড়াভাঙার ছন্দছবি। শাক্তপদ স্নেহের নিতল সাগর, তার মধ্যে

বস্তুজগতের আশা আকাংক্ষার ছোট ছোট ঢেউয়ের ছল্‌ছলানি। বৈষ্ণব কবি অনুভব করেন—এই বিশ্ব জড়রাজ্য নয়, এ-তো বৃন্দাবন ; একটি ঘরে দুটি মনের বিনিময়, সে-তো স্বর্গীয় প্রেমের লীলা ; পার্থিব যাকিছু সবের মধ্যেই অপার্থিবের আভা। রামপ্রসাদ দেখেছেন—মায়ের সংসার তো আর কোথাও নেই, সে আমাদেরই পার্থিব সংসার ; বিশ্বমাতা শুধু তো বিশ্বের মা নন, তিনি যে আমার ঘরেরই মা ; দিনরাত্রি করুণাবিহ্বল স্নেহছলছল আঁখি নিয়ে তিনি জেগে আছেন আমার শিয়রে। শাক্ত বাঙালীর এই ভাবদৃষ্টিতে তন্ত্রের ভয়ংকরী শক্তি হয়েছেন শুভংকরী পুত্রবৎসলা, ক্রোধভীতির দেবী হয়েও স্নেহপ্রীতির প্রতিমা, শক্তিময়ী হয়েও প্রেমময়ী। আদিমাতার শাস্ত্রীয় রূপকে ডিঙিয়ে সাংসারিক রূপে এই বিবর্তন—সাধকের দিব্য প্রতিভার দান ; যিনি দেখেন—ভীষণের মধ্যে মধুরকে, ক্রোধের মধ্যে বাৎসল্যকে, কালোর মধ্যে আলোকে :

ডানহাতে তোর খড়্গ জলে বাঁহাত করে শঙ্কাহরণ।
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাটনেত্র অগ্নিবরণ ॥

এর ফলে শুধু বিশ্বমাতা নয়, মানবী মা-ও মহত্ত্ব ও গৌরব লাভ করেছেন ; ঘরের মায়ের চক্ষে দেখেছি বিশ্বময়ীর ছায়া—If it be a fact, as the modern trend is to believe, that it is the human mother who has given rise to the Divine Mother, it has to be admitted on the other side that the Divine Mother, in her turn or in return, has added majesty and glory to the human mother (Evolution of mother worship in India : Dr. S. B. Das Gupta)। সন্তান-মাতার সম্বন্ধ নিকটতম। প্রিয় ও প্রিয়ার মিলন অভেদ বটে ; তবু ব্যবধান ঘুচতে চায়না, ভেদের সীমা বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু সন্তানের জন্ম মাতৃগর্ভে, মায়ের দেহের প্রতি কোষ, রক্তের প্রতি অণু-পরমাণুর সঙ্গে তার বত্রিশ নাড়ীর যোগ ; মায়ের দেহ-মন-প্রাণের শক্তিতেই সে জাত-লালিত, মাতৃ-দুগ্ধেই পুষ্ট তার নবজাতক প্রাণ। অন্যদিকে, বিশ্বমাতা-পৃথিবীরূপে তিনি দান করেন অন্ন-পানীয়, স্থান দেন বক্ষে, মৃত্যুঅন্তে লয় তাঁরই কোলে, আবার তাঁর গর্ভে প্রত্যাবর্তন ; আবার সেখানে নবজন্ম। রাধাকৃষ্ণ ও শিবশিবানী অর্ধনারীশ্বর। কিন্তু সন্তান সম্পূর্ণভাবে মায়েরই, উভয়ের নিবিড়তম একাত্মতা।

তাই বাৎসল্য রসের উল্টোপিঠে শাক্ত সাধক মা, শক্তি তাঁর মেয়ে। বৈষ্ণব ভক্তও মা যশোদারূপে কৃষ্ণের সেবা করেছেন তাঁকে সন্তান ভেবে, ইষ্টকে আরও

কাছে আরও আপন করে পেতে চাওয়ার প্রয়াসে। আমাদের সংসারে নারীমাত্রেই মাতৃসমা, মেয়েও মার প্রতিরূপ। আগমনী ও বিজয়া : একদিকে দেবীর শারদীয়া আবির্ভাব, অন্যদিকে ঘরের মেয়ের বৎসরান্তে পিত্রালয়ে আগমন ও গমন। কবি তখন মেনকা, মাতাকে কন্যারূপে পেয়ে নবভাবে বাৎসল্যের আস্বাদক। যাঁর পদতলে নিজেকে ও নিজের আকৃতিকে পৌঁছে দেবার জন্যে এত প্রয়াস আর আয়াস, এখন তাঁকেই কাছে এনে মনোমত করে নিবিড়ভাবে ভালবাসা ও চরমভাবে পাওয়া, তাঁর ওপর স্বীয় অধিকার বিস্তার করা। 'মা' হয়ত সবদা ছেলের কথা না শুনতে পারেন, কিন্তু 'মেয়ে' তো মা-বাবার অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না। তাই সাধক হন মেনকা ও হিমালয়। শাক্তের তন্ত্রসাধনা বাৎসল্যরসে সিঞ্চিত হয়ে বিচিত্ররূপ লাভ করেছে, মা হয়েছেন বিচিত্রা প্রতিমা। তন্ত্রের শক্তিরূপে তিনি সাধকের দেহে ভর করেন, তাঁর দেহের মধ্যেই থাকেন কুলকুণ্ডলিনীরূপে, জাগ্রতা হয়ে জাগিয়ে দেন আত্মাকে, পৌঁছে দেন তাকে সহস্রারে। এই সাধনাভিসারে তিনি কন্যা-মাতা-জায়া। গানে, তিনি ঘরের মায়ের মত সন্তানকে লালন পালন করেন, ঘিরে রাখেন স্নেহমমতা দিয়ে, সুখেদুঃখে সহায় হন, সান্ত্বনা দেন, আবার কন্যারূপে আসেন সাধকের কাছে, ভালবাসেন ও ভালবাসান, লীলার চাঞ্চল্যে দান করেন পরম পরিতৃপ্তি ও ঐকান্তিক ঐক্যবোধ।

শাক্ত কবির যন্ত্রণাবোধ ও দুঃখবোধ তাই দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক। তাঁর Religious misery is a real misery (কডওএল), সাধনঘনিষ্ঠ ও মাটিঘেঁষা। কিন্তু দুঃখের চরম অভিব্যক্তি হলেও শাক্ত দুঃখবাদী নন। তিনি মাতৃবিচ্ছেদে ও দারিদ্র্যের জ্বালায় কাতর, ব্যথিত কিন্তু ব্যাকুল নন। কারণ তাঁর বিশ্বাস, এই ছেদ এই দুঃখ মায়েরই দেওয়া, সন্তানের পরীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির মহৎ প্রয়োজনে। সময় হলে তিনি নিজেই টেনে নেবেন ছেলেকে কাছে, দূর করবেন তার সকল অভাব, দুঃখের সরোবরে ফুটবে আনন্দের পদ্ম। সাধক অভিযোগ করেন, অভিমান করেন, বিবাদ করেন, আর্তবিলাপের হাহাকারে ভরে যায় শাক্তপদের ভাবের আকাশ। সে কান্নায় জল আছে জ্বালা নেই, আশা আছে নৈরাশ্য নেই। কালী যে আলোময়ী!

এইভাবে শাক্তগীতে আধ্যাত্মিকতা ও মানবতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে গেছে, মাতৃসাধনায় মিশেছে ব্যক্তিভাবনা, এক হয়ে গেছে মাকে না পাওয়ার দুঃখ ও সংসারসুখ না পাওয়ার দুঃখ ; একই কবিতে, একই পদে দুই ভাব মিশে গেছে, একই মায়ের দুই রূপের মত। এই দ্বৈতভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও। এর

ভাষা চিত্রকলা একদিকে তন্ত্র ও সাহিত্য থেকে গৃহীত, অন্যদিকে ঘর ও পথের চোখে দেখা ছবি থেকে আহৃত। রূপবন্দনায় ও ভাববর্ণনায় চর্যাপদ-নাথসাহিত্যের সদৃশ অলংকার, আবার বাঙালীর নিজের তৈরী ঘরের নতুন গয়নাও আছে। অন্তরঙ্গ সাধনার স্পর্শে বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় ধর্মই মরমীয়। কিন্তু বৈষ্ণব ভক্ত 'লীলাশুক,' দূর থেকে লীলারস আস্বাদন করেন; লালার অন্তরঙ্গত্ত হন। শাক্ত সাধক শুধু অন্তরঙ্গ নন, ইষ্টের নিকটতম সাযুজ্য তিনি লাভ করেন। তাই বামাচারী তন্ত্রসাধনায় যে 'বামা'কে জাগালে সাধক শক্তিমান হন, তিনি যেমন কুলকুণ্ডলিনী, তেমনি সাধনসঙ্গিনীও। অন্যপক্ষে, দেবী সাধকের দেহে 'ভর' করেন। তিনি তখন সন্তানের মা; আবার পাবকা-কুলকুণ্ডলিনী রূপে তিনি সাধকের দেহের মধ্যে থাকেন, তখন তিনি (মেনকারূপী) সাধকের কন্যা। দুদিক থেকেই শক্তি—শক্তিসাধকে নিকটতম মিলন ঘটেছে। কাব্যে এই সাধন দৃষ্টি ভাব—রসে নূতন রূপ লাভ করেছে।

বৈষ্ণবের প্রেমপ্রীতি কৃষ্ণপদে নিবেদিত, শাক্তের সমগ্র হৃদয় মাতৃচরণে উৎসর্গীকৃত। বৈষ্ণব পদাবলীতে ধর্মচেতনা ও রতিচেতনায় ঐক্য, শাক্ত পদাবলীতে ধর্মচেতনা ও সমাজচেতনা একাকাব।

রবীন্দ্র-রূপকনাট্যে সমাজ-লক্ষণ

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি ১৩১৫ সাল থেকে ১৩৩১-এর মধ্যে লেখা। এই সময়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়—'বলাকা-পূরবী যুগ'-এর প্রাধান্য। প্রাচীন সামন্তসমাজের অনুবর্তিত বেশ হিসেবে যেসব অতীতমুখী ভাবনা-কামনা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার চিন্তাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল, প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্ররচনায় ('গীতালী' অবধি এর সীমানা) তাই-ই ছিল মূল সুর। 'বলাকাতে' সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল কবির প্রগতি-আধুনিকতা। অবশ্য, নবীন চিন্তাধারা—পুরাতন ঐতিহ্যের গোঁড়ামি থেকে আত্মা ও সমাজের মুক্তিকামনা রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম থেকেই আভাসিত হয়ে উঠেছিল। একদিকে, অন্ধ প্রকৃতিপ্রীতি, প্রাচীন ভারতের প্রশ্নহীন জয়গান, তপোবনরচনার মোহ এবং উপনিষদের কাছে নির্দ্বন্দ্ব আত্মসমর্পণ 'স্বদেশ', 'মালিনী' 'কথা ও কাহিনী'তে ধৃত কাব্যনাটিকা ইত্যাদির মধ্যে স্বতঃবিদ্যমান। রাজর্ষি, বৌ ঠাকুরাণীর হাট, নৌকাডুবি, এমনকি চোখের বালির মধ্যেও বঙ্কিমী রীতি ও রসবোধ লক্ষ্য এড়িয়ে যায় না। অন্যদিকে, সৌন্দর্যবোধসঞ্জাত প্রকৃতি-প্রেম, সনাতনী নীতিকে নিঃসংশয়ে মেনে নিতে দ্বিধা, বর্তমান সমাজব্যবস্থা—বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও (নৈবেদ্য স্মরণীয়) বর্তমান। এক উদার বিশ্বজনীনতার চেতনা এই সময়ের উপন্যাস ও নাটকে পুরাতনী ভাবনার পাশে পাশে চমকিত। 'রাজা ও রাণী' নাটকে স্বামী-স্ত্রীর সেই জীর্ণ অ-নবীন সম্পর্ককে মেনে নিতে সুমিত্রা এবং রাজা অনিচ্ছুক। নতুন সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হবার ব্যাকুলতা তাদের মনে—নতুন দৃষ্টিতে মানুষকে বিচার করার আগ্রহ তাদের হৃদয়ে। কাব্যে এই নবীন চেতনার সূত্রপাত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে। অন্ধকার গুহা প্রাচীন সমাজ, বাইরের আলো নতুনের দ্যোতক। অন্ধকার গুহায় আলো এসে পড়েছে, নির্ঝর আর নিজেকে আবদ্ধ থাকতে দিতে চায় না, ছড়িয়ে পড়তে চায় বাইরের বিশ্বে, নতুন অধিত্যকায় মুক্তধারা হয়ে। এর পরের কবিতাটি 'তারকার আত্মহত্যা'—বাঁধাধরা রুটিনে যে জীবন চলে ছক্‌কাটা

কক্ষপথে, তাকে অবজ্ঞা করে একটি তারকা খসে পড়ল, বিপথে উদ্‌ভ্রান্ত হল, কিন্তু সেই সঙ্গে পেল নবীনের স্পর্শ। এ দুটি কবিতাই কি বলাকা কাব্যের, বিশেষত 'সবুজ' কবিতাটির সহমর্মী নয়? দুয়ের সুর এক, মুক্ত আকাশের নীচে বেরিয়ে আসার কামনা। মানসী-সোনার তরীর—নিষ্ফল কামনা, সুরদাসের প্রার্থনা, নিরুদ্দেশ যাত্রা, সোনার তরী, প্রভৃতি কবিতার মধ্য দিয়ে কবিচিত্তের এই সমুখগতি ক্রমেই স্পষ্টতালাভ করেছে। এ যুগের প্রহসনগুলিও একই কারণে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উচ্চকিত। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন ভারতীয় আবেশে কবিচিত্ত তখনো এমনভাবে আবৃত যে পাশাপাশি প্রবহমান নবীন চেতনার ধারাটি নিতান্ত ক্ষীণকণ্ঠ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই রূপান্তরের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়; পুরাতনকে ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ নতুনকে, প্রাণকে গ্রহণ করেন দৃঢ়চিত্ততায়। 'খেয়ায়' তার সন্ধিক্ষণ। প্রকৃতি এখানে তাঁর লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ—বৃহত্তর সত্যে উপনীতির সোপান মাত্র; কবির মন আর অতীতমুখী নয়, গতির প্রাবল্যে সমুখচারী; অন্ধ ধর্মবিশ্বাস নয়, স্বকীয় দর্শনদৃষ্টি। 'নৈবেদ্যে' কবি উপনিষদকে গ্রহণ করেছিলেন প্রায়-আক্ষরিক ভাবে। এ পর্বে উপনিষদের বাণী কবির স্বাঙ্গীকৃত, স্ব-কৃত, নিজের মতো করে নেওয়া। শিল্পী মানসের এই বাঁকফেরার মুখে 'গোরা'র আবির্ভাব। প্রথম পর্যায়ে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের আবির্ভাবে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, যার পরিচয় ঐ সময়ের কাব্যে নাটকে উপন্যাসে প্রবন্ধে দুর্লভ নয়। এতোদিনে কবি সেই দ্বন্দ্ব থেকে, আত্মদ্বিধা থেকে মুক্ত হলেন। গোরাও প্রথমে ছিল ঘোরতর হিন্দু; তার মননের একদিকে যেমন অতীতচারণ, অন্যদিকে তেমনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনা। বাস্তব জীবনের সংঘাতে, মানবহৃদয়ের সঙ্গে মিলনে তার জীর্ণ পোষাকটি খসে গেল; কাহিনীশেষে গোরা এসে দাঁড়াল উদার আকাশতলে, বিশ্বপ্রেমী পরেশবাবুর পক্ষছায়ায়, সর্ববন্ধনমুক্ত মানব রূপে। গোরা রবীন্দ্রনাথের সামন্তসামাজিক মানসের প্রতীক, পরেশবাবু তাঁর নবীন চেতনার দ্যোতক। গোরার মোহভঙ্গ তাই এক হিসেবে রবীন্দ্র নির্ঝরেরও স্বপ্নভঙ্গ। সেই নির্ঝর এগিয়ে চলল 'বলাকার' পথ ধরে।

এতদিন কবি ছিলেন ভারতীয়, এবারে হলেন সর্বজাতীয়; স্বাজাত্যবোধ থেকে বিশ্বাত্মবোধে উত্তরণ। এ যুগে তাঁর যে ধারণা, তা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলনে গড়ে ওঠা। 'চতুরঙ্গে' শচীশ ধর্মসাধনার বিভিন্ন পথকে পরীক্ষা করে করে চলে, 'ঘরে-বাইরে'তে বিমলার মনে নিরীক্ষা চলে ভারতীয়-ইউরোপীয় দর্শনতত্ত্বের। সন্দেহ নেই,

এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিল্পী-মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। একদিকে ঔপনিষদিক দৃষ্টি, অন্যদিকে ইউরোপের বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিকতা—এ দুয়ের সমন্বয়ে রবীন্দ্রদর্শন গড়ে উঠল এই পর্বে। যে-দর্শন একান্তভাবেই তাঁর, জীর্ণ সমাজধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে যার জন্ম নয়, যুগের উপযোগী করে যা হয়ে-ওঠা। অন্যদিকে এই দর্শন একলা তাঁরও নয়। যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের প্রগত চিন্তাশীলদের মনেও তা আভাসিত হয়ে উঠছিল। বলা যায়, সমাজের প্রয়োজনে সমাজ-পরিবেশের তাগিদেই প্রতিভার আকাশে এই জীবনদৃষ্টির আবির্ভাব।

এই রূপান্তরকে একান্ত ব্যক্তিগত মনে করলে ভুল হবে, সমাজ-পরিবেশেও অবশ্যই তার কারণ নিহিত ছিল। গণতন্ত্রের তখন প্রসার-যুগ; প্রসারের কামনায় ভারতবর্ষও সে সময় কম্পমান। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বেড়া ভেঙে গণতন্ত্রকে আয়ত্ত করার বাসনাই এ-পর্বের রবীন্দ্রসাহিত্যে দিয়েছে গতি, এনেছে অচলায়তন স্থাণু সমাজকে ভেঙে নতুন শ্রীবৃদ্ধিকে স্বাগতম্ জানাবার দৃষ্টিভংগি। এক কথায় একে বলা যায়, সামন্ততন্ত্র থেকে শিল্পতন্ত্রে উত্তরণ। তাই নৈবেদ্যে যখন কবি ঔপনিবেশিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুক্তি পাবার পথ খুঁজেছেন পেছন দিকে তপোবনের ছায়াস্নিগ্ধ আশ্রয়ে, বলাকায় তখন সেই সাম্রাজ্যবাদ থেকে বন্ধনমোচনের পথ পেয়েছেন সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সংগ্রামের মধ্যে। প্রাচীন থেকে নবীন, যান্ত্রিকতা থেকে উদারতা, জড় থেকে চৈতন্যে উত্তরণের পালা। এরই সঙ্গে মিলিয়েছেন উপনিষদকে—উপনিষদ বলে নয়, তার মধ্যে মুক্তধারা প্রাণশক্তির গতি 'চরৈবেতির' চলন-মন্ত্র আছে বলে। কিন্তু শুধু উত্তীর্ণ হওয়াই নয়, তার শেষ তীর্থও এঁকেছেন তিনি এ-পর্বে।

এই নবীন চেতনা যেমন এ-যুগের কাব্যে-উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি নাটকেও। নানা রূপে নানা রূপকে একই কথা বলতে চেয়েছেন তিনি। মানুষ সংগ্রাম করছে অনবরত তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। যাত্রাপথে তার বিরতি নেই, বিরাম মানেই মৃত্যু। সংগ্রাম প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, মনের সঙ্গে। সকল ক্ষেত্রেই জড়তা প্রাচীনতা পঙ্গুতাকে কাটিয়ে উঠে উন্নততর বৃহত্তর ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার আগ্রহ। অধ্যাত্ম অনুভূতির সঙ্গে প্রথম মিলনেই তিনি যে স্মারকচিহ্ন উপহার পেলেন, সেতো মালা নয়, সে যে তরবারি-'জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্র হেন ভারি'। সেই তরবারিই জীর্ণতাজয়ের অস্ত্র হয়ে উঠল কবির হাতে। প্রকৃতির সঙ্গে বিরহ-মিলনের পালা গান হয়ে উঠল শারদোৎসব-ফাল্গুনীতে; অধ্যাত্মচেতনার ক্ষেত্রে সে সংগ্রামের আভাস পাওয়া

গেল রাজা-ডাকঘরে; মানুষ ও সমাজের স্থবিরত্বের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিরোধ রূপ পেল অচলায়তন-মুক্তধারা-রক্তকরবীতে। প্রথম দুটি ধারার আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে, শেষটিরও। কিন্তু এগুলির অরূপ ব্যঞ্জনা সমালোচকদের দৃষ্টি যতটা আচ্ছন্ন করেছে, সমাজ-লক্ষণা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। আমার আলোচনা তাই মূলত দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে মুক্তিলগ্ন বলে গণ্য করেছিল বিংশ শতকের চিন্তাশীল মন। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই যা কিছু জীর্ণ জড় পুরাতন অচল সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনে আবদ্ধ, তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, যা কিছু নবীন চেতন সবল সচল তাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি গণতন্ত্রের উদার প্রাঙ্গণে। এরই ভিত্তিতে সেদিন দেখা দিয়েছিল টলষ্টয়-শ'-ইয়েটস্-বের্গসঁ-শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির গতিবাদমুখর জীবনদর্শন—and there is the work of helping life in its struggle upwards—'জীর্ণ ঝরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরান্ ছড়িয়ে' দেবার জীবনগীতি। এই মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেই শ' জীবনবিরহী আকাশচর সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট বাইবেলী উপাসনার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর The adventure of the Black Girl in her search for God সেই বিশ্বাসেরই মরমীয়া কাহিনী। উল্লিখিত বইটির ভূমিকায় শ'র ঘোষণা মনে পড়ে: Why not simply bring it down to the ground and take it for what it really is? অন্যদিকে টলষ্টয়ের বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনাও ছিল এমনি church-cult বিরোধী; তাঁর দৃষ্টিও—of progress, that is, of the movement of humanity towards prefection-এর অদ্বয় লক্ষ্যে নিবদ্ধ। বলা বাহুল্য, ভিন্নতর পারিপার্শ্বিকে বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রদর্শনও এর সমগোত্র। এবং তা-ই তাঁর এ-পর্বের কাব্য নাটক উপন্যাসের অদ্বিতীয় উৎস।

এই যে নতুন ভাবনা, এও কিন্তু নিশ্চলভাবে এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেনি। কোন জীবনদর্শনই থাকে না। মূল তত্ত্বকে কেন্দ্র করে পরিধি ক্রমেই প্রসারিত হয়েছে। কবি যেখানেই দেখেছেন জড়তা, যান্ত্রিকতা, প্রাণের অভাব—সেখানেই আঘাত হেনেছেন। আঘাত করতে করতে এগিয়ে এসেছেন পেছন থেকে সামনে, প্রকৃতি থেকে সমাজে, অতীত থেকে বর্তমানে। প্রথমে, প্রাচীন ভারতের পুরাণপ্রভাবিত সংস্কৃতির মন ও মননহীন আচারমন্ত্রের বিরুদ্ধে; দ্বিতীয় পদক্ষেপ, বিজ্ঞানদর্পী যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে; তৃতীয় ভাগে, ধনতান্ত্রিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। যেখানেই মানবতার অবমাননা দেখেছেন, দেখেছেন প্রাণের

গতিরোধ, সমাজের কূপমণ্ডূকতা, অন্যায় অত্যাচারে মুষ্টিমেয়ের লাভ ও সংখ্যাহীনের ক্ষতি, সেখানেই কবিকণ্ঠ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। আর শুধু ভাঙনই নয়, ভাঙনের পরবর্তী গড়ার কথাও বলতে চেয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রেও দৃষ্টির পূর্ণতা এসেছে ধাপে ধাপে, ক্রমে ক্রমে। প্রথম দিকে যে নতুন অচলায়তন গড়ার কথা বলেছিলেন, দ্বিতীয়ভাগে তাকে মুক্তি দিলেন মুক্তধারার গতিবেগের সঙ্গে, তৃতীয় স্তরে শান্তির পথ খুঁজে পেলেন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এইভাবে, ধনতন্ত্রলালিত যে জীবনদর্শনকে রবীন্দ্রনাথ একদা মেনে নিয়েছিলেন সুস্থ সুন্দর সমাজগঠনের ইসারা রূপে—যার সাহায্যে পুরাণপ্রধান সংস্কৃতির সনাতন পাঁচিল ভেঙে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেই ধনতন্ত্রকেই ঘুরে আঘাত হানলেন তিনি। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনিকতন্ত্র, তা থেকে সমাজতান্ত্রিক চেতনা—কেবলই নিজেকে নিজে অতিক্রম করে যাওয়া—ক্রম-অভিব্যক্তির পথে পূর্ণতার দিকে এক-পা এক-পা করে অগ্রসর হওয়া—একেই বলা যায় রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এই অগ্রস্থতির মূলে ছিল কবির আন্তরিক মানবতাবোধ, অন্যায় নীচতা ও কুশ্রীতার প্রতি ঘৃণা আর উজ্জ্বল সত্যদৃষ্টি। তাই অরূপ ব্যঞ্জনার অন্তরালে তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকে সমাজ-লক্ষণা স্পষ্টভাবেই দ্যোতিত হয়েছে।

'অচলায়তন' প্রাচীন স্থাণু জড় শাস্ত্রবদ্ধ ভারতীয় সমাজের প্রতীক। সেখানকার মানুষ মানুষ নয়, শাস্ত্রের অক্ষবডোরে বাঁধা জীবমাত্র। পুঁথিনির্দিষ্ট পথেই তারা বিচরণ করে, জীবনে ভুলভ্রান্তির অবকাশ তাদের খুবই কম। গতানুগতিক সনাতনী নিয়মে তাদের চলাফেরা; পদস্খলনে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তবিধি তাদের পালনীয়। জীবনের উন্নতি, মনের ঊর্ধ্বগতি তাদেরও কাম্য—কিন্তু সে সাধনা মনুষ্যত্বের জাগরণ বা হৃদয়বৃত্তির উদ্বোধন নয়। মননহীন অর্থহীন বিধিবদ্ধ আচার অনুষ্ঠান তাদের সাধনরীতি; গণ্ডীবদ্ধ ঘরে আবদ্ধ তাদের সমাজ; মনের রসকে নিঃশেষিত করে শুষ্ক মরুভূমির জন্যে তাদের দুশ্চর তপস্যা। বাইরের কোন আলো তারা চায় না, বাঁধাপথের ওপাশে পা বাড়ায় না, ভুল করে না; তাই এগোয়ওনা। এই যে সমাজচিত্র, এ শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, মধ্যযুগীয় যে কোন ধর্মসমাজের নিখুঁত রূপায়ন। তবে ইউরোপ সে স্তর পেরিয়ে এসেছে অনেকদিন আগে, অচলায়তনে আটকে রয়েছে ভারতবর্ষ। বাইরে থেকে যে আলো যে ডাক এলো পরে, তা পাশ্চাত্ত্যের অভিঘাত। আমরা পুরাতন ভারতবাসী, বড়ো শ্রান্ত, বড়ো ক্লান্ত! আমাদের চারপাশে আজও সেই গুপ্তযুগের পৌরাণিক সংস্কৃতির নাগপাশ। আদ্যিকালের সেই জীর্ণ ছিন্ন খোলসটা গায়ে জড়িয়ে অতি

সাবধানে বাছবিচার করে শাস্ত্রবিধি মেনে পথ চলি আমরা—এখনও তার রেশ বেশ লুপ্ত হয়ে যায়নি। সারা দুনিয়া যখন এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে, আমরা তখন ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে মহাতামসীর তপস্যায় নিরত। অথচ আমাদের ধারণা—এইই জীবন, এইই সত্য। অচলায়তনে ভারতীয় আবহাওয়ার এই যে ছবি, এ তো কেবল ধর্মজগতেরই নয়; মধ্যযুগীয় সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের এইই সর্বতোভদ্র প্রতিরূপ। যেখানে ধর্ম মানসিক নয় পুঁথিগত, ব্যক্তি স্ব-অধীন নয় সমাজশাসনের অনুগত, হৃদয় নিজের নয় পরহস্তগত—সেখানে ব্যক্তির ধন ও মন বিকশিত হয়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই, তার আইনকানুন এমনিভাবে গড়া। অচলায়তনের পৃষ্ঠপোষক তাই স্থবিরপত্তনের রাজা, যিনি চণ্ডককে প্রাণদণ্ড দেন—পাঁচিল আরও উঁচু করেন জাতিভেদের পবিত্র আগ্রহে!

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলে না। সমাজ-বিবর্তনের নিয়মই এই, স্থিতাবস্থার মধ্যেই জাগে বিরোধী শক্তি, দু'য়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, জন্ম হয় নতুনের। তাই তো অচলায়তনের অচল শেকলে বাঁধা থেকেও জেগে ওঠে আচার্য অদীন পুণ্যের হৃদয়। হাজার বছরের নিয়ম বিশ্বস্তভাবে মেনেও তাঁর মধ্যে দেখা দেয় কিসের একটা অভাববোধ, কি যেন ব্যর্থতা। অন্যদিকে, পঞ্চকের সবল বিদ্রোহ। আচার্যের মনে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা যেমন স্বাভাবিক, পঞ্চকের মন যে নির্দ্বন্দ্ব তাও স্বাভাবিক। সমাজ-রূপান্তরের ক্রান্তিকালে এমনিভাবেই দোলা লাগে বিভিন্ন মনে; কারও মনে জাগে প্রশ্ন, কেউ বা খুঁজে পায় উত্তর। অন্যদিকে, পুরাতনের প্রতীক মহাপঞ্চক। পরিবর্তনকে সামনে দেখেও যার চোখ খোলে না, মন ভোলে না, হৃদয় টলে না। মধ্যপথে আবর্তিত উপাচার্য উপাধ্যায় সুভদ্র এবং পঞ্চকের সহপাঠীবৃন্দ। সুভদ্র ভুল করে, পশ্চিমের জানালা খুলে বাইরের আকাশে চোখ মেলে ধরে। কিন্তু পঞ্চকের মতো সে শেকল-ভাঙা সবুজ নয়, কিশোর হয়েও তার মধ্যে পুরাতন সংস্কার। তাই সে প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, আমাদের সমাজে এই ধরণের চরিত্র, এই দ্বন্দ্ব আজও দুর্লভ নয়, আজও তার ছায়াছবি আমরা চারপাশে দেখছি।

পাশ্চাত্ত্য অভিঘাতে নতুন অর্থনীতি-ভিত্তিক সমাজগঠনের সম্ভাবনায় পুরাতনের প্রতি বিতৃষ্ণা জানিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ক্রমে তা বিস্তৃতি লাভ করে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অসহনশীলতা উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। (ইংরেজ-বিদূরণের প্রথম বোমা-

বিস্ফোরণ হয় এই পর্বেই)। সেই অসহিষ্ণু মানসের সংকেত অচলায়তন। স্থবির ভারত তার সামন্ত নীতি, কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস আর নিরর্থক আচারমন্ত্র নিয়ে নিজেরই পুটপাকে আবর্তিত। ওদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের আলো, শিল্প-তান্ত্রিক ইউরোপের স্পর্শ, নতুন পৃথিবীর সংস্কৃতিচেতনা—যেখানে ব্যক্তির মুক্তি গতি ও শ্রীবৃদ্ধি। বন্দী মন তাই আঘাত হানছে দুদিকে—ঘরে ও বাইরে। ঘরে পঞ্চক ও আচার্য আর বাইরে থেকে দাদাঠাকুর ও শোণপাংশু—যুবশক্তির প্রাণোচ্ছল কর্মপ্রেরণা। দাদাঠাকুরকে কল্পনা করা যায় নব্য ইউরোপের প্রতীক রূপে। সংঘাত বাধল এবং সংঘাতে অচলায়তন যথারীতি ভেঙেও পড়ল। কিন্তু শোণপাংশুরা গড়তে জানেনা, ইউরোপও ভাঙে। কিন্তু ভাঙার পরেও কাজ থেকে যায়। পুরাতনকে নির্মমভাবে ত্যাগ করে এগিয়ে হয়তো যাওয়া যায়, কিন্তু সে চলায় স্থিতি থাকে না। প্রাচীনের যে অংশ প্রয়োজনীয়, প্রগত, গঠনের উপযোগী, নতুন সৃষ্টির কাজে তাকেও দরকার। তাই 'আধুনিক সমালোচক বিরোধিতা করলেও' কবি আনলেন মহা-পঞ্চককে, যার মধ্যে আছে নিষ্ঠা সংযম একাগ্রতা ও স্থৈর্য—যে গড়তে পারে তার শাস্ত্র দিয়ে নয়, শক্তি দিয়ে। গড়ে উঠল নবীন অচলায়তন, আরো বড়ো আরো ব্যাপক। অর্থাৎ গড়ে উঠল নতুন সমাজ, আরও প্রসারিত, আরও বিস্তৃত। যেখানে নেই 'পুঁথি প'ড়োর কাছে বিধিবিধান যাচা', যেখানে নেই কেবলই বাঁধা অথবা ভাঙা, নেই অন্যায় অত্যাচার আর অমানুষিকতা।

এই নতুন অচলায়তনের স্পষ্ট পরিচয় কবি দেননি। কিন্তু আভাসে এই কথাই বলেছেন (নাটকের উপসংহৃতিও তাই)। এই নতুন সমাজ ব্যক্তিকে খাটো না করে বড়ো করবে, সামনে এগিয়ে দেবে জীবনদর্শনকে। আর যদি কোনদিন সে জীবনদর্শনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেদিন তাকে ভেঙে গড়তে হবে আরও বড়ো অচলায়তন।

'অচলায়তনে' প্রাচীন ভারতীয় সামন্তসমাজের কথা কবি বলেছেন, যে সমাজে পুরাণ, শাস্ত্র, পুরোহিত, দেবদেবী ও তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে জনগণের মন ভোলানোর চেষ্টা চলে। 'মুক্তধারা' নাটকে দেখালেন সমরোত্তর ইউরোপের সমাজ আর তার সাম্রাজ্যবাদকে, যে সমাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করে তার জোরে দেশ-বিদেশের অগণিত জনগণকে শোষণ করে, শাসন করে, আধামানুষে পরিণত করে। সামন্তসমাজের বাহন পুরোহিত ও পুরাণ, শ্রীমন্তদের হাতিয়ার বিজ্ঞানী ও যন্ত্র। এই যন্ত্রকে কিভাবে শোষণের কাজে

লাগানো হয়, মুক্তধারা তারই ছবি : আর এই যন্ত্র কিভাবে সমাজগতিকে রুদ্ধ করে, সমাজপতিদের পিছিয়ে রাখে—তারও দর্পণ।

'অচলায়তন' রচিত হয় ১৩১৮ সালে। 'ডাকঘর' এবং 'তাসের দেশ'ও ঐ সময়ে লেখা। ডাকঘরের ঘর প্রাচীন সমাজ : তাসের দেশের বিচিত্র জীবেরা ঐ সমাজে লালিত 'পরম প্রাচীন পাকা, চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা'। দুটিতেই মুক্তি ঘর ভেঙ্গে, বাঁধন ছিঁড়ে। তাসের দেশের রাজপুত্র ইউরোপ, তিনি সাগর-দোলায় বাণিজ্য-পিয়াসী। এপযন্ত ইউরোপের নব্য জীবনদর্শনে কবির অটুট বিশ্বাস ছিল ; মুক্তধারায় সে দেশের যে ছবি আঁকলেন, তাতে অবিশ্বাসের আভাস দেখা গেল। কবিমানসের এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। মুক্তধারার রচনাকাল ১৩২৯ সাল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে একদা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নবাগত ধনতান্ত্রিক পরিবেশকে মুক্তিস্নান বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার অল্পকাল পরেই কবির মোহভঙ্গ হল। ব্রিটিশ সরকার পূর্বঘোষিত চুক্তি অস্বীকার করলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত প্রান্তরে তার সদর্প উত্তর দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের একক প্রতিবাদ আকাশ ছাড়িয়ে উঠল, সে প্রতিবাদ শুধু ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদেরই বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, মহাত্মা গান্ধীর নতুন সংগ্রাম শুরু হল জাতীয়তা ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে। রবীন্দ্রনাথও নাটকের মাধ্যমে এই সংগ্রামে নামলেন আন্তর ঘৃণাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে। মুক্তধারা তারই ফল। এক হিসেবে মহাত্মাজীর পটভূমিকাও রবীন্দ্রনাথই প্রস্তুত করেছিলেন 'প্রায়শ্চিত্তের' ধনঞ্জয়ের মাধ্যমে। মুক্তধারায়ও সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী—অহিংস সত্যাগ্রহের রাজনীতি তথা আত্মোন্নতির দ্যোতকরূপে তারও আবির্ভাব।

রাজার প্রয়োজনে যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বাঁধল যন্ত্রের সাহায্যে। ফলে, নীচের তলায় প্রজারা হল নিরন্ন ; মহামারী দুর্ভিক্ষ ক্ষোভ দেখা দিল। কিন্তু রাজতন্ত্রের সেদিকে দৃষ্টি নেই, নিজের দেশের উন্নতিই তার কাম্য। অধিকৃত পররাজ্য তথা উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধি তো নয়ই, বরং তাদের শোষণ করাই তার আত্মোন্নতির পথ। এদের মতে, দেশপ্রীতির অর্থই হল পরদেশ-অপ্রীতি। তার শাসন শোষণ আইন কানুন রীতিনীতি এমনকি শিক্ষাদানের ব্যাপারকেও এই বিশেষ দিকে চালিত করার চেষ্টা দেখা দিল। অনুগত গুরুমহাশয় ছাত্রদের পাঠ দেন রাজভক্তির, অন্ধ আনুগত্যের, জনসাধারণের মাথায় কানঢাকা টুপি। শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে জনগণকে এমনি অশিক্ষিত, অর্ধমৃত করে

রাখাই সাম্রাজ্যবাদী নীতি। উত্তরকুটের রাজা তাঁর উপনিবেশ শিবতরাই সম্পর্কে সেই বিধানই জারী করলেন। আর সবার পেছনে রইল দর্পিত যন্ত্রনিশানা, ধ্বংসাস্ত্রের ও পদদলনের প্রতীক হয়ে। সারা রাজ্যে একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ করতে লাগল।

সমাজ-আত্মাকে যন্ত্রের বাঁধনে বেঁধে, বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে তারই অধীন হয়ে এ যেন দাসত্বের শ্রীবৃদ্ধি সাধনা। সমরোত্তর ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রূপ আর নিপীড়িত ভারত তথা উপনিবেশগুলির স্বরূপের এ যেন এক জীবন্ত বাস্তব চিত্র: কেমন করে যন্ত্রবিজ্ঞানের দাস সভ্যতাগর্বী ধনিকবণিকবা পররাজ্য গ্রাস করে, তাদের আর্থিক বুনিয়াদ ও নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে—সাম্রাজ্যবাদীদের সেই ছলাকলা আজও মিলিয়ে যায়নি, যদিও রূপভেদে হয়তো একটু মোলায়েম হয়েছে তার চেহারা। এরা প্রাণ নয় বাণ দিয়ে মারে মানুষকে, পুরো নয় আধা। আধমরা প্রজাদের ওপর চলে শোষণ শাসন। বণজিৎ ও বিভূতি, রাজযন্ত্র এবং যন্ত্ররাজের অশুভ মিলনে সেই অসাম্যেরই সূচনা হল।

কিন্তু এরও সমাধান আছে, নইলে সমাজবিজ্ঞানের কোন অর্থই হয় না। প্রতিরোধশক্তি জেগে ওঠে ভেতরে ভেতরে, আঘাত আসে বাইরে থেকে। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে থেকেও প্রতিবাদ ওঠে মনুষ্যত্বের নামে; বাইরে থেকে প্রত্যাঘাত আসে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে। মুক্ত প্রাণের, উদার মানবিকতার প্রতীক অভিজিৎ সেই ভিতরকারই সত্যদ্রষ্টা মানুষ। অবশ্য, সে রাজপরিবারের কেউ নয়, তবু রাজচক্রেরই। ধনঞ্জয় ভার নিল প্রজাদের জাগানোর। এতদিন অন্ধ আনুগত্যে যারা ছিল পঙ্গু, তাদের আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত তার। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রে আঘাত হানল অভিজিৎ আত্মদান করে। প্রাণের অব্যাহত গতি, সমাজের অপরিহার্য ধারাপ্রবাহ কোন বাধা-কেই কোনদিন মানেনি, আজও মানবে না। মধ্যে দুদিন শুধু থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল মানুষের অহংকার লোভ নীচতা ও ক্রূরতার মুখোমুখী হয়ে। অন্যদিকে, ধনঞ্জয় আত্মোন্নতির জন্যে এগিয়ে গেল একা, সকল নির্যাতন সহ্য করে নিজেকে প্রস্তুত করতে কারাগার বরণ করে নিল সে। অভিজিৎ ও ধনঞ্জয়ের সাধনা একক সাধনা, অহিংসার সাধনা। শেষ পর্যন্ত প্রজাদেরও চোখ খুলল, কিন্তু মুক্তধারার বন্ধন-মোচনে তাদের আর প্রয়োজন হল না। সৌন্দর্যপিয়াসী প্রাণোচ্ছল বুদ্ধি-জীবী অভিজিৎ তা সম্পূর্ণ করে দিয়েছে।

লক্ষণীয় যে, যন্ত্রভেদ করেছে অভিজিৎ, অহিংস সত্যাগ্রহী ধনঞ্জয় নয়। সে শেষপর্যন্ত অনুগামীদের যথাযথভাবে দীক্ষিত করতে না পারার ক্ষোভে নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ হয়েছে, সরে গেছে একলা চলার আধ্যাত্মিকতায়। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির পথকে অস্বীকার না করলেও সর্বাংশে যে মেনে নিতে পারেন নি এ-সত্য ইতিহাস-সমর্থিত; তাঁর চরকা-বিরোধিতাও সর্বজনবিদিত। আগেই বলা হয়েছে, ধনঞ্জয় চরিত্রটি গান্ধীজির আদর্শে রূপায়িত। তবে কি কবি অহিংস সত্যাগ্রহের দুর্বলতার কথা বলেছেন ধনঞ্জয়কে উপলক্ষ করে? অথবা গলদ ছিল শিবতরাইবাসী তথা ভারতবাসীরই মধ্যে? আজীবন 'সরকার', 'গুরুদেব' 'রাজা' করে যাদের জীবন কেটেছে—সহস্র প্রযাসেও তাদের অভ্যাস ও সংস্কারগত পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত করা গেল না—এইই কি তাঁর বক্তব্য? এই শেষ দিকেই কি তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন? অচলায়তনের দাদাঠাকুর মুক্তধারায় অভিজিৎ ও ধনঞ্জয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন, রক্তকরবীতে বিশুদাদা ও কিশোরে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এই নাটকগুলিকে তার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

মুক্তধারা নাটকের আঙ্গিক-সৌষ্ঠব এক কথায় বিস্ময়জনক। পশ্চাদ্‌পটে যন্ত্র ও ত্রিশূলের প্রতিস্পর্ধা, সামনে পথ, আর তার ওপর দিয়ে আনাগোনা করছে শোষক ও শোষিত, যন্ত্র-সংগীত ও ধর্মসংগীত, উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের অধিবাসী; মধ্যে সংঘাতলীন চরিত্রচিত্র। রাজার মন্ত্রী যেমন অভিজিৎ-পক্ষে, তেমনি প্রতিরোধ শক্তি কঙ্করের শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ। মনে পড়ে, একদিকে সুভদ্র, অন্যদিকে রক্তকরবীর পালোয়ানটির কথা, যাদের মধ্যে এমনি সংশয়, দ্বিধা বা দুর্বলতা দেখা গেছে। যে দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ, যার মধ্যে অনুকুল-প্রতিকুল শক্তি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, রবীন্দ্রনাথ তাকে নিখুঁতভাবে রূপ দিয়েছেন পশ্চাদ্‌পটে ও প্রতিটি দৃশ্যে।

কিন্তু মুক্তধারার ভাবদৃষ্টির মধ্যেও অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান। ধনঞ্জয় মানুষ তৈরীর কাজে নেমে শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়াল একলা নিজেকে তৈরী করতে। যন্ত্রে হাত তো দিলই না, বরং এক আধ্যাত্মিক কুয়াসায় নিজেকে জড়িয়ে রাখল। মুক্তধারাকে মুক্ত করল একা অভিজিৎ। নেতৃত্বের যোগ্যতা তার ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু সুযোগ ছিল কি? অচলায়তনে দাদাঠাকুরের ছিল শোণপাংশুর দল, নন্দিনীর ছিল ফাগুয়া-বাহিনী। বিপ্লব নেতৃত্বনির্ভর হলেও একক সার্থকতালাভ প্রায় অসম্ভব; কিন্তু সেই ছবিই আঁকা হল এখানে।

অথচ, মুক্তধারায় শোষিত জনগণের মনে বাসনা আছে একটি (যা ছিল না বাইরের শোণপাংশুদের; তারা শোষিত নয়, নবচেতনার জোয়ার)—তা হল যন্ত্রবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। তারা চেষ্টাও করেছে বন্ধনমুক্তির পথে এগিয়ে যেতে। কিন্তু যন্ত্র স্পর্শ করার আগেই প্রাণশক্তি একক চেষ্টায় সেকাজ করে দিয়েছে। মনে হয়, সে সময়ে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধী-নেতৃত্ব যেভাবে সমগ্র দেশের মন ও বুদ্ধিকে বিধৃত করে রেখেছিল, তারই প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে এই একক বিপ্লব-সংঘটনের শিল্পরূপে।

আরও একটী দিক লক্ষণীয়। মুক্তধারার সমাজ-রূপান্তরের ক্রান্তিকালে নারীর কোন স্থান নেই। অচলায়তনেও নারী অনুপস্থিত! অথচ থাকা উচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যে নবজাগরণের সূচনা দেখা দিয়েছে, তাতে নারীরও স্থান এবং দান ছিল। 'তাসের দেশে' কিন্তু প্রথম ঘুম ভেঙেছে রাণীরই, রাজার নয়।

বিশেষত, যন্ত্রবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করিয়েছেন যে প্রাণশক্তিকে, সে ধর্ম-নির্ভর। ধর্ম যদি মনকে ধরে রাখে, যদি তা হয় মনুষ্যত্ব-জাগরণের সহায়ক, গতির দিশারী—তাহলে ধর্মের বিরোধিতা করার প্রয়োজন বিজ্ঞানেরও পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ যদিও শৈব ত্রিশূলকে তাঁর ধর্মের প্রতীক করেছেন, তবু বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই, সে ধর্ম মানুষের, মনুষ্যত্ব সাধনারই উদার আহ্বান। তা ছাড়া এও মনে হয়, অচলায়তনে যিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন চেয়েছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়ুরোপকে দেখে, তার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ এবং ক্ষীয়মান রূপ ও আভ্যন্তরীণ সংকট উপলব্ধি করে তিনিই নতুন পৃথিবী গড়ার ভার দিলেন ভারতের হাতে, যেখানে বিজ্ঞান নয় ধর্মই সমাজ। বলা বাহুল্য, এ-সম্পূর্ণভাবে অচলায়তনের বিপরীত ভাবনা—দস্তুর সভ্যতার স্বরূপদর্শনে ব্যথিত হৃদয়ের আশাভঙ্গ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সহজাত মমতা বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরতা।

কবির গতি অসম্পূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে। প্রতিটি ধাপে তিনি অতিক্রম করেছেন নিজেকে, নিজের ভাবাদর্শকে। অচলায়তনের ভাবগত অপূর্ণতা এবং আঙ্গিকগত শিথিলতা যেমন মুক্তধারায় সংশোধিত হয়েছে, তেমনি সত্যোক্ত ত্রুটীগুলি এবং আঙ্গিকের ধ্রুপদী কাঠিন্যও 'রক্তকরবী'তে তিরোহিত হয়েছে। সেখানে বৈপ্লবিক সমাজচেতনার অভিব্যক্তির দিকে কবি আরও অগ্রসর।

প্রাচীন সমাজের মোহবন্ধন তিরোহিত হল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে

কণ্ঠরব উচ্চকিতও হল। কিন্তু সেই সঙ্গেই চিনলেন নতুন শত্রু, নিষ্ঠুর ধনবাদকে। যে নব্যতান্ত্রিক অভিব্যক্তিকে কবি একদিন অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে মুক্তির দ্বার বলে—তার প্রয়োজন, কবির ক্ষেত্রে তো বটেই, নতুন বুদ্ধিজীবীদের কাছেও শেষ হয়েছে; তার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। বাইরে তার মনিবত্ব, অন্তরে কায়েমী স্বার্থবোধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-দের আভ্যন্তরীণ সংকট ও ক্ষতবিক্ষত দেহ কবি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, বিশেষ করে আমেরিকা ঘুরে এসে। ওদিকে অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াও সমাজ-মানসের তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়ছে। ধনতান্ত্রিক পরিবেশে গড়ে-ওঠা দর্শনেও তাই ফাটল ধরতে শুরু করল। কবির এই সময়কার সংশয়িত মনোভাব 'রাশিয়ার চিঠি'তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সভ্যতার অগ্নিশিখা ও পিল্‌সুজদের তিনি পৃথক করে দেখতে শিখেছেন এবারে। 'কালান্তর' ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ এরই পরিণত ভাবনা, বাস্তবের নিকষে আরো যাচাই করে নেওয়া। তাই রক্তকরবীতে যুধ্যমান শক্তি দুটি পরস্পরবিরোধী, সম্পূর্ণ আলাদা দুটি শিবির। সমালোচকদের মতে, 'রক্তকরবী' আমেরিকার ডলার-সাম্রাজ্যবাদী, স্বর্ণগোধিকা ধনতন্ত্রবাদী সমাজের প্রতিচ্ছবি। কালান্তরে আজও আমাদের তাই মনে হয় বটে; যদিও যে কোন পূর্ণায়ত ধনবাদী সমাজের প্রতিরূপ হতেও তার বাধা নেই।

অচলায়তন ও মুক্তধারায় দেখেছি রাজতন্ত্র, রক্তকরবীতে রাজা কিন্তু থাকেন নেপথ্যে। অর্থনীতির পরিভাষায় এ হচ্ছে লগ্নী মূলধনের যুগ। সোনা তোলা হচ্ছে তাল তাল মাটি থেকে, ব্যাঙ্কে অঙ্ক জমা হচ্ছে অসংখ্য সংখ্যার। পর দেশের এবং স্বদেশের মানুষকে অত্যাচার করে, তাদের গলায় লগ্নী মূলধনের বিনা সুতি ফাঁস পরিয়ে আসছে এই উদ্বৃত্ত। অচলায়তনে অত্যাচারীর উপকরণ ছিল ধর্মের আফিম, মুক্তধারায় যন্ত্রের প্রতাপ, রক্তকরবীতে দুই-ই। সেখানে সর্দার আছে চাবুক হাতে, গোঁসাইজী আছেন আফিম হাতে। জনমনে বিক্ষোভ জমা হলেই সর্দার তৎপর হয়ে ওঠে, তাতেও ক্ষোভের তাপ মরে না গেলে গোঁসাইজী এগিয়ে আসেন সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে। এখানে মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির গায়ে গায়ে; মুনাফাই ধর্মঅর্থকামমোক্ষ। এখানকার মানুষেরা সব কূর্মাবতার—তাদের তাই-ই বোঝানো হয়; মানুষ হবার চেষ্টা করলেই স্বরাষ্ট্র-বিভাগ তৎপর হয়ে ওঠে; স্বামীজিরা প্রাচীন ইতিহাসের পাতা খুলে সনাতন ধর্মের বিধান আওড়ান। অচলায়তনে সব কাজ চলত পুঁথির বিধানে, মুক্ত-

ধারায় বিদেশী রাজার খেয়ালী হুকুমে, রক্তকরবীতে অদৃশ্য আইনকানুনে। আর তা বজায় রাখবার জন্যে আছে আমলতন্ত্র। প্রতিরোধ মাথা তুলতে পারেনা; তুললেও সে ক্ষণিকের জন্যে। একদিকে আকাশচুম্বী দর্পিত প্রতাপ, অন্যদিকে সভয় আত্মগোপন—কোথাও আলো নেই হাসি নেই গান নেই নেই প্রাণ। ধনবাদী রাষ্ট্র যেন একটি যক্ষপুরী, তার ধন যক্ষের তৃপ্তির জন্যে—মানুষের ব্যবহারের জন্যে নয়।

কিন্তু এখানেই থামলেন না কবি, এই অন্ধকার হতাশার মধ্যেও আলো এবং আশার আভাস পেলেন। যক্ষপুরীতেও তাই আলোড়ন জাগল। সোনা জমানোর নেশায় মানুষকে অন্ধকারের জীব করে রাখার প্রচেষ্টা যাদের, তারা হয়তো জানে না, পাথর দিয়ে যতোই চাপা দেওয়া যাক রক্তকরবীকে, প্রাণকে—তবু কিছুতেই একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না তাকে। একটু আলোবাতাস পেলেই সে মাথা তুলবে পাথরের পাশে, আত্মমহিমায়। সেই আলোর ইসারা এনেছে রঞ্জন বাইরে থেকে, ভেতর থেকে সেই আলো জ্বালিয়ে রেখেছে নন্দিনী। নন্দিনীর আঘাত-হানা দ্বিমুখী, যেন সংগ্রামের দ্বৈত রূপ। একদিকে ঘা দিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে রাজার স্বর্ণদ্বারে, অন্যদিকে জনগণকে মাতিয়ে তুলে বিদ্রোহ ঘটাবার প্রয়াস। সে একাধারে অভিজিৎ ও ধনঞ্জয়—এ সংগ্রাম তাই আরো গভীর। অভিজিৎ যন্ত্রকে আঘাত করেছিল, যান্ত্রিককে নয়: ধনঞ্জয় মানুষ তৈরীর কাজে ব্রতী হয়ে শেষ পর্যন্ত সরে গিয়েছিল। নন্দিনী যুগপৎ আক্রমণ করল লোভী ও লোভতন্ত্রকে, অন্যদিকে জাগিয়ে দিল ঘুমন্ত পুরীর মানুষদের। শেষে নিজের আত্মদানে গণ-অভ্যুত্থানকে জয়যুক্ত এবং শেষ পরিণতিকে ইঙ্গিতে প্রকাশিত করে দিয়ে গেল। যারা ছিল সংখ্যা, তারাই জেগে উঠল মানুষ হয়ে। প্রথমে ভয়ে ভয়ে কম্প্রবক্ষে, পরে সচেতন দৃঢ়বিশ্বাসে এগিয়ে গেল যক্ষপুরীর দরজা তথা ধনবাদী অর্থতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দিতে। ওদিকে রাজা নন্দিনীর স্পর্শে রূপান্তরিত হয়েও বেরিয়ে আসতে পারছেন না নিজের তৈরী নিয়মকানুনের বন্ধন থেকে। সর্দার-গোঁসাইদের হাতে তিনি এখন ক্রীড়নক। লোভ ও স্বার্থের জটিল আবর্তে ধনতন্ত্র এমনি ভাবেই নিজের তৈরী অচলায়তনে বাঁধা পড়ে, আত্মক্ষয়ে নিজেরই কবর খোঁড়ে। কিন্তু যথার্থ গণতন্ত্র তো এভাবে বাঁধা পড়বার নয়, নিজের বাঁধন কেটে সে একদিন বেরিয়ে পড়বেই, লড়াই করবে নিজেরই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে। তাইতো রাজা বেরিয়ে এলেন নিজের গণ্ডী কেটে, প্রজাদের হাতে হাত মিলিয়ে লড়াইয়ে নামলেন সর্দারজী-গোঁসাইজীদের বিরুদ্ধে। অনেকের

মনে হতে পারে, এ মিলন রাজায়-প্রজায় ধনিক-শ্রমিকে আপোষ। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখলে, পথরোধকারী প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে এ নতুন সমাজশক্তিরই জয়লাভ।

অচলায়তন-মুক্তধারা-রক্তকরবীকে তাই স্বার্থপর লোভী রাষ্ট্রতন্ত্রের আবর্তন-বিবর্তনের ইতিহাসধারা আখ্যা দিলেও অসংগত হয় না।

'রক্তকরবী' ধনতান্ত্রিক সমাজের সুন্দর ব্যঞ্জনাময় চিত্র। 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারায়' যে অভাববোধ আমাদের পীড়া দেয়, এই নাটকে তার বাষ্পও নেই। কবির দৃষ্টি এখানে যুগধর্মী হয়েও যুগাতিক্রান্তী। শুধু তাঁর কালের কথাই তিনি বলেননি, বলেছেন আগামী কালেরও কথা—যতদিন না পাথর গুঁড়ো করে রক্তকরবীকে শ্বেতকরবীতে পরিণত করা যায়। এ-নাটকে ধর্মচেতনা আদৌ নেই। অচলায়তন ও মুক্তধারায (প্রথমটিতে গীতার কৃষ্ণ, দ্বিতীয়টিতে রুদ্র শিব অধিষ্ঠাতা দেবতা) যেমন ধর্মের একটি রূপক-রূপ আছে, সনাতন ধর্মকে নতুন অর্থে গ্রহণ করার ইঙ্গিত আছে, রক্তকরবীতে তেমন নেই। পরন্তু, দেশকালপ্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে কবির অভিযান এখানে সুস্পষ্ট। প্রকৃত ধর্ম যা, তা কেউ গ্রহণ করে না, বরং তাকে বিকৃত করে, ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, এ-বোধ কবির মধ্যে আজ আর অস্পষ্ট নয়। রক্তকরবীর গোসাইজী সেই ধর্মেব আফিমই বিতরণ করে বেড়ান। তাঁর প্রতি কবির বিরাগ ধর্মের প্রাচীনতার জন্যে ততটা নয়, যতটা কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার ঘৃণ্য বৃত্তিতে সে নিযুক্ত ব'লে। রক্তকরবীতে স্বর্ণলোভী শোষণজীবি আমলাতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে প্রাণ, যৌবন আর সুন্দর।

একদিকে যেমন নীলাক্ত সমাজের রথী মহারথী ও অনুচর-পার্শ্বচরদের ভূমিকা এবং মনস্তাত্ত্বিক আচরণ প্রায় খুঁতহীন, অন্যদিকে তেমনি রক্তাক্ত জনতার কর্তব্য, দুর্বলতা ও প্রতিরোধশক্তির ভুলভ্রান্তিও সমান অন্তর্দৃষ্টিতে চিত্রিত। অচলায়তনে লড়াই আছে ইঙ্গিতে; দাদাঠাকুর এলেন আর অচলায়তন এবং রাজার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। মুক্তধারায় জনতার ভূমিকা অস্পষ্ট, একক নেতৃত্বই সেখানে প্রধান। অচলায়তনেও নেতৃত্ব ছিল একজনের, শোণপাংশুরা অনেকটা উদ্দেশ্যহীন অনুগামী। রক্তকরবীতে কিন্তু সঙ্ঘনেতৃত্ব ও জনগণের সচেতন অংশগ্রহণ সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত। মানুষ জেগেছে, চিনেছে, এগিয়ে এসেছে, এমনকি নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহও প্রকাশ করেছে একসময়ে। নন্দিনী তাই শেষ পর্যন্ত বল্‌গা

তুলে দিয়েছে গণশক্তির হাতে, নিজে সরে গেছে, মিশে গেছে জনতায়। এখানে নারীর ভূমিকাও সুচিহ্নিত। অচলায়তন ও মুক্তধারায় নারীর স্থান ছিল না। সেই অভাবপূরণের প্রমাণ পাওয়া যায় রক্তকরবীতে। এখানে রঞ্জন থেকেও নেই: সংগ্রামের কেন্দ্র ও অনুপ্রেরণা (প্রায়) সম্পূর্ণরূপে নন্দিনী। সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডে নারীরও যে দায় এবং দায়িত্ব আছে, অধিকার ও শক্তি আছে—রক্তকর-বীর নন্দিনী সেই স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি নিয়েই আবির্ভূত।

ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ কামনা করেও ভবিষ্যৎ সমাজের কোন স্পষ্ট, যুক্তিগ্রাহ্য রূপ রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেননি, এমন একটা সন্দেহ অবশ্য থেকেই যায়। তার প্রমাণ 'রক্তকরবী' স্বয়ং। আর বলতে গেলে তা নাটকটির অনুস্যূত নবীন চেতনার একরকম বিরোধীও। যন্ত্রের বিরুদ্ধে কবি যে প্রাণকে দাঁড় করিয়েছেন তা কৃষিনির্ভর। নন্দিনীর পরনে ধানী রংয়ের শাড়ি, লড়াইয়ের মূল ধুয়া 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'। অচলায়তনে এ আহ্বান প্রকৃতির, মুক্তধারায় প্রকৃতিও ধর্মের, রক্তকরবীতে কর্ষণজীবী।

রক্তকরবীর ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন: 'রাজার সঙ্গে নন্দিনীর লড়াই যন্ত্র ও কৃষির মধ্যে লড়াই।' জাভাযাত্রীর পত্রেও রাম-রাবণের যুদ্ধকে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সংঘর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। সমাজের শেষ পরিণতি সম্পর্কে কবির মত স্পষ্ট না হলেও কৃষি ও যন্ত্রের মধ্যে সংঘর্ষ এবং তারই অনু-সঙ্গী হিসেবে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে যে তিনি পরোক্ষে স্বীকার করে গেছেন, এ-তথ্য সুস্পষ্ট। এবং তাঁর বিশিষ্ট মানসগঠনের কথা ভাবলে তা যথেষ্ট বিস্ময়করও। রক্তকরবীতে আভাসে হয়তো এমন কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে রাম যেমন রাবণকে হত করে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, কৃষি তেমনি যন্ত্রকে ধ্বংস করে মাথা তুলে দাঁড়াবে। বিশ্বাসটি কবির নিজস্ব, সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাসম্মত নয়। যন্ত্র ও যান্ত্রিক জীবনকে কবি চিরকালই ঘৃণা জানিয়ে এসেছেন, এ-পর্বে সে ঘৃণা আরও উগ্র এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রক্তকরবীতে নন্দিনীর বিরোধ এই যান্ত্রিকতারই বিরুদ্ধে। তার ধনতন্ত্রবিরোধিতার কারণও তাই। কেননা, এ-সভ্যতা মানুষকে যন্ত্র বানায়, সংখ্যা বানায়, তার মনুষ্যত্ববিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস-দর্শনাশ্রয়ী কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যন্ত্রসর্বস্ব ধনবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নি, চিরপ্রবহমান কিন্তু বর্তমানে অবরুদ্ধগতি প্রাণশক্তির পক্ষ নিয়েই বিদ্রোহ জানিয়েছেন। প্রাণের অব্যাহত গতির শত্রু বলেই ভেবেছেন বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী শক্তিকে, ধনবাদের সর্বগ্রাসী প্রতাপকে—অন্য কোন কারণে নয়। সেইজন্যেই

রাজা নেমে এসে হাত মেলাতে পারলেন প্রজার সাথে। এই মিলন কৃষি ও শিল্পের মিলন : এবং সেই হিসাবে কাল্পনিক বাসনা নয়, বাস্তব সত্যের দিশারী। যক্ষরাজ তাই একাধরে রাবণ ও বিভীষণ ; রাবণের মৃত্যু হল, এগিয়ে এল বিভীষণ ; অর্থাৎ যন্ত্রের-শিল্পের ধ্বংসশক্তির বিলোপ হল, এগিয়ে এল তার কল্যাণী শক্তি।

তিনটি নাটককে পাশাপাশি সাজালে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই এগোচ্ছেন অপূর্ণতাকে অতিক্রম করে পূর্ণতার দিকে। তিনটি নাটক মিলে যেন একটি সমগ্র চিত্র, একটি সম্পূর্ণ সমাজতত্ত্ব, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। অচলায়তন থেকে রক্তকরবী শুধু মানসিক বিবর্তন নয়, বস্তুজাগতিক রূপান্তরও। প্রথমটিতে অভি-যান পুরোহিততন্ত্র তথা ব্রাহ্মণ্য শক্তির বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়টিতে ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে, তৃতীয়টিতে বৈশ্যশক্তির বিরুদ্ধে। সমাজ-পরিক্রমা, বিপ্লব-চংক্রমণ এমনি করেই সমাপ্তির পথে এগুল। বাকী রইল শুধু শূদ্রশক্তির কথা। উল্লিখিত নাটক তিনটিতে অবশ্য তাদেরও আবির্ভাব আছে, ক্রিয়াকর্মের সচেতন আভাসও পাওয়া যায়। গোপনচারী শূদ্রসমাজের কথা তবু বুঝি কিছুটা অনুক্ত ছিল। সেই না-বলা-কথাই অপরূপ সাংকেতিকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল 'কালের যাত্রা'য়।

'কালের যাত্রা' ১৩৩৯ সালে রচিত ; 'বলাকা-পূরবী-পর্যায়ে' তার স্থান নেই। রচনাটি পুরোপুরি নাটকও নয়। তবু এর উল্লেখ না করলে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-দর্শনের সম্পূর্ণতাটি ধরা যাবে না। কারণ, সদ্যোক্ত তিনটি নাটকে কবি ক্রমে ক্রমে যে স্তরগুলি অতিক্রম করেছেন, ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের যে ধারাবাহিক রূপ এঁকে গেছেন, তার একত্র মিলন ও সমাহার ঘটেছে 'কালের যাত্রা'-য়। আদিকাল থেকে আবর্তিত-বিবর্তিত যে সমাজ ও সংস্কৃতি তার অর্থনীতি-রাজনীতি-ধর্মনীতি-ন্যায়নীতি নিয়ে, শোষণ-শাসনের ক্রমিক—রূপান্তরিত অগ্রসরগতি নিয়ে চলেছে সুস্থ পূর্ণতার উদ্দেশ্যে—তারই একটি সংক্ষিপ্ত ও সংহত ছবি আঁকলেন রবীন্দ্রনাথ এর অন্তর্গত 'রথের রশি' নাটিকাটিতে।

সমাজ এখানে জগন্নাথের রথ (একই শব্দ প্রয়োগ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ, যদিও দুজনের দেখায় কতো তফাৎ !), দড়িটি তার চলার শক্তি। রথ আজ অচল, দড়ি নির্জীব হয়ে পড়ে আছে পথের ওপর। কারণ অসাম্যে অন্যায়ে উঁচুনীচু হয়ে গেছে পথ। কতো পুজো উপচার দেওয়া হল, তবু রথ চলে না। ব্রাহ্মণ এসে মন্ত্রপাঠ করল, ক্ষত্রিয় এসে তরবারি ঘোরাল, বৈশ্য এসে সোনাপরা হাত

ছোঁয়াল ; রথ তবু চলে না। শেষে ডাক পড়ল শূদ্রের, বহুদিন যারা ডাক শুনেছে মনে মনে, কিন্তু রথের তলায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া যাদের এতদিন আর কিছুই করণীয় ছিল না। কম্প্রবক্ষে, কুণ্ঠিত পদে তারা এল—কিন্তু ভয় কেটে যেতেও দেরী হল না। টানতেও হল না তাদের, ছুঁতে-না-ছুঁতেই রথ এগিয়ে চলল আপনি। রথ চলল অসমতলকে সমতল করে, ব্রাহ্মণের দেবাগার ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রাগার বৈশ্যের ধনাগার ভেঙে চুরমার করে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বললেন —সমাজে অসাম্য এসেছিল, তাই রথ থমকে দাঁড়িয়েছিল স্থাণু হয়ে। আবারো যদি কোনদিন অসমান হয় পথ, উঁচুনীচু দেখা দেয় সমাজে, তখনও রথ এমনি অচল হয়ে পড়বে, এমনি চাপ দিয়ে আবার সব সমান করে নেবে। অসাম্য সমাজের অগ্রগতির বাধা : চলার পথ অসমান হলে তার গতি রুদ্ধ হয়, বিকাশ হয় স্তব্ধ। তখন পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পাহাড় জমে ওঠে, ক্লেদ দুর্নীতি ও অন্যায় স্তূপীকৃত হয়। কিন্তু সমাজ বসে থাকে না, পিছিয়েও যায় না—বাধা সরিয়ে দিয়ে আবার এগিয়ে যায়। সুতরাং রথের রশিতে কালের যাত্রার যে সাংকেতিক ইতিহাস তিনি লিখে রেখে গেছেন, সমাজ-অভিব্যক্তির দিক থেকে তা দ্বান্দ্বিক বিবর্তনেরই কাব্যনাটকায়িত রূপ। তাই এই সংলাপনাটকের বিশেষ কোন রূপ নেই, কাহিনী নেই, চরিত্র নেই, জাতি নেই, দেশ-কালের কোন পরিধি পর্যন্ত নেই। পথই এর স্থান, জনগণ এর পাত্র, কাল এর নায়ক।

আদিযুগ থেকে অদ্যাবধি কালের যে অপ্রতিহত গতি, সমাজের যে অপ্রতিরোধ্য বিবর্তন, তার বাধা-সংকট অতিক্রম করে যে পূর্ণতামুখী যাত্রা—একেই বলা যায়, রূপক-সাংকেতিক নাটকে প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন। অচলায়তন মুক্তধারা-রক্তকরবী সেই গতিপথের—বহিষ্ণু জীবনের, চলিষ্ণু মনের এক একটি বাঁক : যাত্রাশেষের সমন্বয়-সমুদ্র 'কালের যাত্রা'-য় এসে রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা পূর্ণায়ত হয়েছে।

কালের যাত্রায় গত্যমান লোকসমাজ, ক্রম-অভিব্যক্ত মানবসমাজের কথাই তিনি রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে বলেছেন সকলের জন্যে। তাই এদের আঙ্গিকও কাল এবং লোকজীবনের ধরণকেই আশ্রয় করেছে। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'তাঁহার নাটকগুলির অন্ততঃ তত্ত্বনাটকগুলির টেক্‌নিকের মূলে কোন বিদেশীয় নাটকের আদর্শ নাই, আছে দেশীয় লোকজীবনের pattern বা কাঠামোর আদর্শ।' বিদেশী নাটকের প্রভাব আদৌ নেই, একথা বলা হয়তো দুঃসাহসিক। তবে একথা সত্য যে, এসব নাটকে দেশীয় লোকজীবনের কাঠামোকেই কবি গ্রহণ

করেছেন ভাবপ্রকাশের আধাররূপে। প্রতি নাটকেই যে জনসমাবেশ, তা স্মরণ করিয়ে দেয় বাঙলাদেশের মেলাকে, ঠাকুর্দা দাদাঠাকুর ধনঞ্জয় বৈরাগী মনে পড়িয়ে দেয় বাঙলার বাউল ফকির দরবেশকে। আর গান। সামান্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, কথায়, সুরে ও অলংকারে এর বেশির ভাগ গানই সহজ ও স্বাভাবিক, অনাড়ম্বর ও অকৃত্রিম। প্রসাধিত সৌন্দর্য নয়, সহজাত লাবণ্যই এগুলির প্রাণ; আভিজাত্য নয়, লৌকিকতাই এদের আশ্রয়।

আর, সকলের পায়ের তলায় আছে পথ। রবীন্দ্রসাহিত্যে পথের একটি বিশেষ স্থান আছে। বিশেষত জরা থেকে যৌবন, বন্ধন থেকে মুক্তি যে-পর্বের কামনা, সেখানে তো পথই অনন্য আশ্রয়। ঘরের, শাস্ত্রের, যান্ত্রিকতার, সংখ্যা-তত্ত্বের গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরিয়ে উদার বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়া, জীবনকে বিস্তৃত করে দেওয়া, মনকে প্রসারিত করা—একমাত্র পথেই সম্ভব। তারই ওপর দিয়ে কালের যাত্রা, মানুষের চলন, ইতিহাসের গতি, সমাজের মুক্তি। তাই প্রায় সর্বক্ষেত্রে তত্ত্বনাট্যগুলিব রঙ্গমঞ্চ পথ। হয়তো বা পথই এদের নায়ক।

লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দরদ যেমন ক্রমেই প্রাণোচ্ছল রূপ পেয়েছে এই সব রূপকনাট্যে, তেমনি আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা ও বিক্ষিপ্তি থেকে তারা ক্রমে এগিয়ে গেছে পবিণামী দৃঢ়তা ও সংহতিতে। 'অচলায়তনে' ঘর ও পথের দ্বন্দ্ব আঙ্গিকের মাধ্যমেও প্রকাশিত। প্রথমে অচলায়তন, দ্বিতীয়ে মাঠ, তৃতীয়ে আবার অচলায়তন—এমনি পারম্পরিক সজ্জীকরণের মধ্য দিয়ে ঘটনা-চরিত্র আদর্শ কেবলই আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। ফলে, প্রথমে জরা, পরেই যৌবনের চিত্রদুটি বৈপরীত্য নিয়ে এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। এদিক থেকে 'ডাকঘরে'র আঙ্গিক আরও সংযত। ঘর—অমল: সেখানে মোড়ল ও পিসেমশায়ের বন্ধন প্রচেষ্টা। অন্যদিকে, ঘরের সামনেই পথ: আহ্বান আসে দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা, সুধার রূপ ধ'রে; ঠাকুর্দা তার দূত। ঘর থেকে মাঠ পাহাড় সবই দেখা যায়। দ্বন্দ্বটি আঙ্গিক-মাধ্যমে নিখুঁত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'মুক্তধারায়' ('রাজা'-তেও) রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন আরও সুন্দর করে। দ্রুত খণ্ডদৃশ্য পরিবর্তনের ফলে ভাবটি সহজেই মনকে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করে। কিন্তু সে আঙ্গিকের এত দৃঢ়তা ও কাঠিন্য যে মনে বিস্ময়বিমূঢ়তাই বড়ো হয়ে ওঠে, দ্বন্দ্বের প্রতিফলনটি ততো সহজ হয় না। রক্তকরবীতে এই কাঠিন্য তিরোহিত। একদিকে যক্ষপুরী—ধ্বজা, আর পাশে সোনা-গহ্বরে

নামবার সিঁড়ি। সামনে পথ। মন্দ-ভালোর কালো-আলোর সংঘাতলীলা চলেছে তার ওপর। ভয়ংকরত্ব নেই তার মধ্যে, সহজ স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম। রক্তকরবীর আঙ্গিক সংকুচিত নয়, শিথিলও নয়, ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী; তাই প্রকাশভংগির দিক থেকে সর্বোত্তম বলা যেতে পারে। 'রথের রশি'তে ঘর হয়েছে অচল রথ, দড়ির নির্জীবতা তার জড়ত্বের দ্যোতক। পথের ওপরেই সব অভিনয়, সকল দ্বন্দ্ব। ঘর এখানে পথেই নেমেছে; ঘরে যে দ্বন্দ্বের শুরু, পথেই তার সমাধান; পথেই গতিমুক্তি—নির্বাধ প্রাণশক্তির অবিরাম পথচলা।

নানা দিক থেকে বিবেচনা করে এই নাট্যপালাগুলিকে তাই একটি মাত্র নামের মালাতেই গাঁথা চলে: 'সভ্যতার সংকটপালা'।

উত্তর-তিরিশের রবীন্দ্র-কাব্য

সমাজ সাহিত্যের জন্মভূমি। সমাজ স্থাবর নয়, জংগম। তার চলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও চলতে থাকে, অবশ্য সে যদি সমাজসঙ্গী হয়। এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায়, এক রূপ থেকে আর এক রূপে—এমনি করেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে বারে বারে ঘটেছে পালাবদল। এক ঘাট থেকে ভিন্ন ঘাটে, এক ভাব থেকে ভাবান্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। মাঝে মাঝে তাই মনে হয়, গতিই রবীন্দ্রকাব্যের রূপ, চলতাশক্তিই তাঁর সমগ্র রচনাবলীর প্রাণ। ভাব অথবা ভংগির স্থবিরতা তাঁর পক্ষে হতো মৃত্যুর সমান। নদীর সঙ্গে সঙ্গে চলেই তার গতিপথ নির্ধারণ করতে হয়—তেমনি রবীন্দ্রপ্রতিভারও।

ছোটখাট বাঁকগুলির কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল সৃষ্টির তিনটি প্রধান স্তর লক্ষ্যগোচর হয়ঃ প্রথম থেকে গীতালী অবধি, বলাকা থেকে পরিশেষ, পুনশ্চ থেকে শেষলেখা। এই তিন স্তরে আমাদের সমাজেও ঘটেছে ত্রিমুখী ভাবান্তর—সামন্ততান্ত্রিক, ধনিকতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্রমুখী চেতনার জোয়ার-ভাঁটা। তারই ফলে রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে রূপান্তর—সমতালে সমমাপে।

প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রকাব্যের লক্ষণ হল—জাতীয়তাবোধ, প্রকৃতিপ্রীতি, মানবিকতা, জীবনদেবতাবাদ ও আধ্যাত্মিকতা। মোটামুটি এই ভাবগুলিই এক রোমান্টিক ব্যাকুলতা এবং জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে বহুবিচিত্র হয়ে উঠেছে। পৌঁছেছে—রুক্ষতা থেকে সুন্দরতায়, সংশয় থেকে বিশ্বাসে, বহু থেকে একে, কল্পনা থেকে মরমীয়ায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, সদ্যোক্ত ভাবধারার রেশ থাকলেও তা ক্ষীণতর হয়ে এল অথবা নতুনতর ব্যাখ্যায় নবালোকিত হয়ে উঠল। পাশাপাশি দেখা দিল নব্য চেতনা-ভাবনা, নবীন এষণা। এযুগের রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য গতিবাদ, জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব-সমাধান, জ্ঞানপথে ভগবৎ-অনুভূতি। পূর্বস্তরে, প্রকৃতিই ছিল কবির আরাধ্যা; এখানে প্রকৃতি ভাবগত সত্য-উপলব্ধির একটি অপরিহার্য মাধ্যম। বিশুদ্ধ কল্পনাবিলাস নয়, এক দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ-জীবন

মানুষ ও ভগবানকে নিরীক্ষণ এবং তাদের নিয়ে লীলারস। অনেকের মতে, এই পর্যায়েই রবীন্দ্রপ্রতিভার উজ্জ্বলতম আবির্ভাব, তার পরেই নাকি তার সসমারোহ সূর্যাস্ত! কিন্তু এ অস্তগমন যে আবার নতুন করে সূর্যোদয়, এসত্য তাঁরা চোখ মেলে দেখেননি। আর দেখেননি বলেই উনিশশো বত্রিশ-এর পরবর্তী রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি যথার্থ সুবিচারও করতে পারেননি। দিনের পর রাত্রি। তাতেই জীবনের সব শেষ বলে যাঁরা চিরকালের জন্যে দরজা বন্ধ করে রাখেন, নতুন দিনের আলোকে তাঁরা স্বীকার করবেন কেমন করে? চোখ মেললেও সে-চোখ ধাঁধিয়ে যায়; আবার বুজে ফেলে চলে অন্ধকারে কিছু-নেই-এর নেতিমূলক সাধনা।

রবীন্দ্রকাব্যের তৃতীয় পর্যায় পুনশ্চ থেকে। প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও নৈকট্য ছিল; দুইক্ষেত্রেই তিনি রোমান্টিক দার্শনিক। তৃতীয় যুগের রবিকাব্য প্রথম দুটির সঙ্গে নৈকট্য সত্ত্বেও মূলগতভাবে পৃথক। এখানে তিনি বিস্ময়করভাবে রিয়ালিষ্ট—শুধু ভাবে নয়, প্রকাশেও। উজ্জয়িনীর বদলে কলকাতার পচা গলি, মানসসুন্দরীর বদলে অধ্যাপিকা, জীবনদেবতার স্থানে দেহময়ী নারী, চতুর্দোলার স্থানে গরুর গাড়ী। তেমনি পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের সঙ্গে মুক্তবন্ধের যতোটা অন্তরঙ্গতা (দুইই পদ্য ছন্দ), গদ্যছন্দের ততটা নয়। চিত্রধর্মের ক্ষেত্রেও রংয়ের চেয়ে রেখার দিকে বেশি ঝোঁক, কমনীয়তার চেয়ে খুঁতহীনতা, তত্ত্বরসের চেয়েও স্পষ্টতা। তাই একালের কবিতার রাজ্যে এসে হতচকিত হতে হয়: মনে হয়, নতুন রাজ্য। এই রবীন্দ্রনাথই কি লিখেছিলেন—

> মন দেওয়া-নেওয়া অনেক করেছি,
> মরেছি হাজার মরণে,
> নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।

এ কাব্য তো নূপুর নয়, মালাও নয়, এযে তরবারি!

শেষ জীবনে এসে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেন এক বিরাট বিপ্লব হয়ে গেছে। বিষয়ে ভংগিতে যেন নতুন করে জেগে উঠেছেন তিনি রূপনারাণের কূলে; জেনেছেন, 'এ জীবন স্বপ্ন নয়'। তাই শুধু কাব্যেই নয়, রচনার সকল ক্ষেত্রেই এসেছে অদ্ভুত পরিবর্তন, অভূতপূর্ব নবীনতা—কি বস্তুতে কি রূপায়নে। উপন্যাসে এসেছে সংক্ষিপ্তি, দৃঢ়তা, অবান্তরত্যাগ। তেমনি বিস্ময়কর ছোটগল্পের সমষ্টি 'তিনসঙ্গী'। গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথকে এর মধ্যে খুঁজে বার করার চেষ্টা

অপচেষ্টায় পর্যবসিত হয়। ঋজুতা নিটোলতা তীক্ষ্ণতায় এরা অনন্য অনমনীয় অস্খলিত। কোথায় সেই কমনীয়সুন্দরতা, এযে ভীষণসুন্দর—বস্তুজগতের ঘনিষ্ঠ, জীবনদর্শনের আত্মীয়। ভাষার বলনে, ছন্দের চলনেও তেমনি প্রগত-আধুনিকতার অপ্রগল্ভ প্রৌঢ়মন্যতা! পদ্য হল গদ্য, আর গদ্য নিল বক্রোক্তির আশ্রয়—অপরূপ ও ধারাল, শাণিত অথচ সহজ।

পদ্য যেন সমুদ্র, সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি, ভাবাবেগের স্বল্প ধাক্কাতেও দুলতে থাকে, দোলা দেয়। গদ্যের আবির্ভাব আধুনিক; তার বিচরণ কঠিন মাটিতে—সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙ্গিনায় ভীড় করে:

কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।

কবি এখন সেই দুর্গমে, সেই অরণ্যে, বেড়াভাঙা ছন্দে ভর ক'রে। যা এনেছেন আহরণ ক'রে, তাতে

চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চল্‌তি কালের চাঞ্চল্য।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যে আছে এই দুটি ভাবই। তার যেটুকু চিরকালের, তা পূর্ব-পূর্ব স্তর থেকে ক্রমপরিণত, আর চল্‌তিকালের চাঞ্চল্যগুলি নব-উপলব্ধ ভাবের কণিকা—একান্তই বস্তুজাগতিক। যা কবির বচনায় আগে ছিল না, এখন তা সর্বত্র দৃশ্যমান, সর্বোচ্চ কণ্ঠে অভিব্যক্ত।

কবি নিজেই বললেন—

একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ:
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।

এইইতো আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা, সাম্প্রতিক সাহিত্যের মর্মবাণী। পদ্য-সমুদ্রে একক পাড়ি জমিয়ে গদ্যছন্দের দ্বীপে উত্তীর্ণ হয়েছে যে কবিশক্তি, বাঁধাধরা রীতি ভেঙে গুঁড়িয়ে, নিজের হাতে গড়া ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে সকলের জন্যে সমান অধিকার ছিনিয়ে এনেছে যে মানুষ—তাঁর প্রতাপ 'রাজপ্রতাপ' নয়তো কি! এখানেই রবীন্দ্রনাথ 'অগ্রগতির' নেতা।

তাই যেদিন তিনি সাধু বাংলাকে ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন চলতি বাংলা, পদ্যকে ছেড়ে 'অসংকুচিত গদ্যরীতি', কাব্যের সীমানাকে অনেক বাড়িয়ে দিলেন; যেমন দাদাঠাকুর দিয়েছিলেন অচলায়তনের সীমা বাড়িয়ে। সেদিন বাংলা

সাহিত্যের নতুন করে জন্ম হল আবার। গতানুগতিক পল্লবগ্রাহিতা থেকে মুক্ত হয়ে সে পেল গতিশক্তি, সমাজ-চেতনা, ইতিহাসবোধ।

শেষ স্তরের রবীন্দ্রকাব্যের লক্ষণ-পরিচয়ে তাই যেমন প্রাচীন নবীকৃত, তেমনি নতুনের আলোকও স্বতঃ বিভাসিত। সেই পৃথিবী-জীবন-মানুষ সবই দেখছেন তিনি। তবু কতো নতুন, কতো বিচিত্র! যে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়—তিনিই আজ জীবনের শেষভাগে এসে বরণ করে নিয়েছেন উদাসীন বৈরাগ্যকে। যিনি সীমার মধ্যে অসীমকে চেয়েছেন বারবার, তিনিই আবার চাইছেন :

আমার মধ্যে সেই অনেক কালের বুড়োটা
আজ বলছি পৃথক হবো আমরা।

আজ তাঁর গতি সর্বত্র—সমুখে পিছনে আশে পাশে ; রোমান্টিকদের মত কেবলই সামনে, পেছনে বা ওপরে নয়। তাই মৃত্যুর সিংহদ্বার পেরিয়ে পেরিয়ে তিনি পৌঁছেছেন সামনের মৃত্যুসমুদ্রে ; পূর্বজন্মের সিংহদ্বার পেরিয়ে পেরিয়ে উপনীত হয়েছেন পশ্চাতের সৃষ্টিসমুদ্রে। দুইই অভিন্ন, একই বিন্দুতে অবস্থিত। তাই তাঁর আজ অবগাহন—'জীবন-মৃত্যুর মহাসংগমসমুদ্রে'।

'মহাজীবন'-পরিক্রমণের বৃত্ত এতদিতে সম্পূর্ণায়িত হল।

এখন আর রঙীন চশমা এঁটে রোমান্টিকতা নয় : বলাকার দার্শনিকতা থেকেও কবি মুক্ত। ভাবুকের নিরাসক্ত দৃষ্টি তাঁর। যা কিছু দেখছেন, এক অপার ঔদাসীন্য, আলস্য-লালসে। তাই লীলারসও এখানে বাষ্প হয়ে আকাশমুখী। কবির লক্ষ্য আত্মানং বিদ্ধি ; যাত্রা—চিত্ত থেকে সত্তায় ; আস্বাদন—একের। কবি আজ একদিকে ব্রাত্য, পথচারী, জাতিহারা, অন্যদিকে তাঁর উপাস্য—কোন ধর্ম নয় দর্শন নয়, এক মহাসত্য যা জ্যোতির্ময়। তাঁর ব্যাকুলতা —'হে পুষণ! অপাবৃত করো তোমার জ্যোতি'—সেই হিরণ্ময় পাত্রটিকে উদ্‌ঘাটিত করেই তিনি জানবেন গুহায়িত সত্যকে, পরম জ্ঞানকে, বিশ্বের অন্তর্নিহিত রহস্যকে।

এই যে নবীন অধ্যাত্ম-চেতনা, এই সূর্যমুখী আকুলতা—রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের শেষ পর্যন্ত প্রকাশমান। শেষ সপ্তক, প্রান্তিক, সেঁজুতিতে সবচেয়ে বেশী গভীর ব্যাপক ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের এই আকূতি ঔপনিষদিক অথবা বৌদ্ধ, সে তর্ক এখানে নয়। কিন্তু আত্মসন্ধানের পথে এই যে নিরাসক্তি যা রবীন্দ্র-অনুচিত, তার মূল কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বে খোঁজার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের চিত্তভূমিই

তার আশ্রয়স্থল। তা যদি না হবে, তবে আশি বছরের জীবনে শেষ দশ বছরেই এই উপলব্ধির বিকাশ ঘটবে কেন? লক্ষণীয়, রবীন্দ্রসাহিত্য শেষ পর্বে প্রবেশের পরেই জ্যোতির্ময় সত্যের উপাসক সূর্য-পূজারী রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তার আগে পূরবীর 'সাবিত্রীতে'।

এর পাশাপাশি দেখি বস্তুদৃষ্টি; সৌরচেতনার পাশে পৃথ্বী-চেতনা। রোমান্টিক কবি দার্শনিক কবি আজ জীবনের শেষ লগ্নে এসে রিয়ালিষ্ট। শুধু অপ্রয়োজন নয় প্রয়োজনও, কেবলই সুন্দর নয় অসুন্দরও, আজ তাঁর চেতনলোকে অনুরণণ তোলে; প্রকাশলাভ করে অপূর্ব রূপ-ভংগিমায়। জীবনের তুচ্ছতম উপকরণও আজ কবির কাছে অবহেলিত নয়—কাব্যের উপজীব্য, পরম উপ-ভোগ্য। শহুরে এঁদো রাস্তা, গ্রাম্য নোংরা হাট, কাঁটা গাছ, মোষের গাড়ী, টিকটিকি, পচা চিংড়ির খোসা, কেরাণী, ছেলেটি—কোনটাই আজ তাঁর কাছে অবজ্ঞার নয়। সকলেরই সমান কদর সমান আদর। নিজেকে 'জন্ম-রোমান্টিক' বলে অভিহিত করতে চাইলেও তাঁর এই জাতীয় বস্তুভিত্তিক কবিতাগুলিই তাঁর সবচেয়ে বড়ো বিরোধী পক্ষ। এদের মধ্যে কল্পনার আবিলতা এতটুকু নেই। তা যদি থাকত, তবে ঐসব অভিজ্ঞতার যে সাংবাদিক প্রতিলিপি, ফটোগ্রাফিক প্রতিচিত্র তিনি দিয়েছেন, তা আদৌ সম্ভব হত না। কবি এখানে ভাবালুতায় অতিরেক নন, আত্মসচেতনতায় সংযত সংহত সংক্ষিপ্ত। খাঁটি রিয়ালিষ্ট।

অনেক বলবেন—থাক রিয়ালিজম, কিন্তু ওরই মধ্যে একটা আধবোজা মনের অলস ঔদাসীন্য থেকে থেকে উঁকি মারছে! কিন্তু তা যে নয়; তার পরিচয় আছে এযুগের আর-এক ধরণের কাব্যসরণীতে, যেখানে জীবনরসের পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে টল্ টল্ করছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যর্থতা যুদ্ধান্তেই অনুভব করেছিলেন কবি। তারও পরে দেখলেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের দম্ভের স্বরূপ, বিশ্বাসঘাতকতার নির্লজ্জতা। প্রতিবাদ জানালেন, বাঁক ঘুরলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব তখন তাঁর। অন্যায় অসত্য হিংস্রতার বিরুদ্ধে রবিকণ্ঠ প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠল। তখন সামনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তাল ঠোকাঠুকি।

'প্রশ্ন' কবিতায় এই নবচেতনার নবীনযাত্রা। শেষ দুই পংক্তিতে কবির বেদনার বোঝা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে, প্রতিবাদের তীব্রতা অপরূপ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি দেখলেন, শ্মশানবাসিনী ছিন্নমস্তার স্বরূপ, শোষণের প্রতিটি লীলাবিলাস, আধুনিক সভ্যতাগর্বীদের হিংস্র সংগ্রামের রক্তমাখা দন্তপংক্তি, শত শত নগর গ্রামের

অস্ত্র ছিন্ন করে বিভীষিকার পক্ষবিস্তার। বুঝলেন—'শিশুঘাতী নারীঘাতী হিংস্র যারা ক্ষুব্ধ যারা মাংস গন্ধে লুব্ধ যারা'—সেই সব 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস'। তুলে ধরলেন, 'জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দন্তুর সভ্যতা'র কালোছবি :

এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী পার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি।

কিন্তু এই যুদ্ধ কবিকে আর এক সত্যে পৌঁছে দিল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বাদের প্রতি ঘৃণা নিয়ে তিনি এসে উপনীত হলেন বিপ্লবী চেতনার পরবর্তী অধ্যায়ে। ধণিক-বণিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংকট ও স্বরূপ কবির চোখের সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। শুধু বিদেশী নয়, দেশী ধনিকও যে কেমন করে স্বদেশী ভাইদের রক্ত শোষণ করে, সে ইতিহাসও তাঁর অজানা রইল না। ধনিকতন্ত্র ও ধনবাদের বিরুদ্ধে সোজা আঘাত হানলেন তিনি—'নবজাতক'-এ, বিশেষ করে, 'রাজপুতানা' কবিতায়—

এদিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়।
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্যঝড়।
বণিকের দম্ভে নাই বাধা,
আসমুদ্র পৃথ্বীতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ন মর্যাদা।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মুখোস উন্মোচন করে তার সত্যকার রূপ, তার কুশ্রীতা হীনতা দেখে স্তম্ভিত হলেন কবি। কিন্তু সেইসঙ্গে বুঝলেন এতদিনকার সাধনার অসম্পূর্ণতাও। আত্মদর্শনের গণ্ডী থেকে সরে এলেন কৃষাণ-শ্রমিকদের পাশে, জনতার সামিল হয়ে :

হেথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস,
ওরা কভু আধামিথ্যারূপে
সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।

প্রয়োজনাতীত আনন্দলোক নয়, এই পৃথিবীর জনগণলোকই যে সাহিত্যের বিচরণভূমি, এই সত্যই আজ তাঁর পাকা বলে মনে হল। তাই ডাক দিলেন সেই কবিকে—'যে আছে মাটির কাছাকাছি', 'কৃষাণের জীবনের সরিক যে জন'।

ইতিহাসের সত্যরূপ নির্ধারণ করলেন শ্রমিক মজদুরদের রক্তাক্ত জীবনপটে :

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে,
ওরা কাজ করে।

১৯৩০ খ্রীঃ রাশিয়া-গামী রবীন্দ্রনাথের মনে এই নবভাব প্রথম দোলা দেয়। তখনও একে পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেননি। তখনও দ্বিধা সংশয়—"আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাইনে। অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।" ক্রমে ক্রমে জীবন দিয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে কবি উপলব্ধি করলেন সমাজের বিকৃতি, নেমে এলেন : 'নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদঘাটিত হল তা হৃদয়-বিদারক—"(সভ্যতার সংকট)।

তাই যে রবীন্দ্রনাথ একদিন 'সবুজপত্রে'র এই মুখপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, "সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনা, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে" (প্রমথ চৌধুরী), তিনিই পরে লিখলেন :

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে :
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে।

এ যেন মায়াকভস্কির কবিতা পাঠ করছি :

আমি চাই আমার কলম
পাল্লা দেবে বন্দুককে
থাকবে এক তালিকায়
কারখানার লোহার সঙ্গে।

বিপ্লবী চেতনার প্রথম ভাগে শত্রু-নিশানা ; দ্বিতীয় ভাগে আত্মচেতনা, জনতার সামিল হওয়া ; তৃতীয় ভাগে আপোষহীন সংগ্রাম। কবি বললেন :

রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান ;
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে

জাগুক হুংকার,
বাণীবিলাসীর কানে ব্যাপ্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার।

প্রার্থনা করলেন :

হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।

কিন্তু এও শেষ নয়। ভাঙনেই বিপ্লবের সমাপ্তি নয়। তার পরেও চাই গঠন—ভবিষ্যতের আশার ছবি। কবি শেষ পরিণতিকেও রূপ দিয়ে গেলেন অপূর্ব ভবিষ্যদৃষ্টির মাধ্যমে :

অবশেষে তপস্বীর তপস্যাবহ্নির শিখা হতে
নবসৃষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে।

যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে স্বাগতম্ জানিয়েছিলেন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি, চিন্তার প্রসারতা, ব্যক্তিচিত্তের মুক্তির শুভলগ্ন বলে, তিনি আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে চিনতে এতটুকু ভুল করলেন না। সত্যদৃষ্টিবলেই তিনি বুঝলেন, এযুদ্ধ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের স্বার্থে, এলড়াই ধনবাদীদের আত্মরক্ষার্থে। তাই প্রথম থেকেই সোচ্চারে তুলেছেন প্রতিবাদ, জানিয়েছেন ঘৃণা। বুঝেছেন, এ-লড়াইয়েও মুক্তি নেই। সেই চরম লড়াইয়ের জন্যেই ডাক দিয়ে গেছেন তিনি তাদের—

দানবের সাথে সংগ্রামের তরে
যারা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

সেই সংগ্রামের শেষেও তিনি দেখেছেন এক বলিষ্ঠ আশাবাদ এক ভবিষ্যৎ দৃষ্টির আদর্শালোকে। তাই নিঃসংশয়ে বলেছেন :

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে ;

এ কুৎসিত বীভৎসতা একদিন আর থাকবে না, কামাননির্ঘোষের মাধ্যমে হবে

নতুন সৃষ্টি, সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আসবে সর্বশান্তি, সর্বসাম্য। এই ভাবটি আরও নিখুঁত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'কালের যাত্রা'র অন্তর্গত 'রথের রশি' সংলাপ-নাটকে। অচল মহাকালের রথ সচল হল শূদ্রদের হাতের ছোঁয়া পেয়ে। এগিয়ে চলল সে ব্রাহ্মণের মন্দির গুঁড়িয়ে, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রাগার ধূলিসাৎ করে, ধনিক-বণিকের ভাণ্ডার মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে। যেখানে যা অসমতল অসমান ছিল, সব সমান হয়ে গেল। নতুন দুনিয়ার আবির্ভাব হল, যেখানে নেই অন্যায় অত্যাচার অসাম্য অসুন্দরতা। যেখানে : এ দ্যুলোক মধুময় মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি।

সমাজ-চেতনার এর চেয়ে সংক্ষিপ্ততর সত্যতর সুন্দরতর অভিব্যক্তি পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে ঘটেছে কিনা জানা নেই।

এই চেতনা, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে সর্বত্র সঞ্চরমান। এই মানবতাবোধ, এই জীবনদর্শন একটি আকাশচর আদর্শমাত্র নয়, মাটির তাপ থেকেই তিলে তিলে সঞ্চিত ; একান্ত বাস্তব, অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই, এযুগের কবিতার স্বধর্ম—বস্তু-অনুগমন ; মূল রস—সহজ রস।

রবীন্দ্রপ্রতিভার এই যে তিনটি প্রধান স্তর, এদের মধ্যে ঐক্য আছে, অনৈক্যও আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই। চিন্তা ও ধারণার ধারাবাহিকতা বহমান। কবি একে একে বাধা ডিঙিয়ে পথ অতিক্রম করেছেন। ভাবভাবনাও নব নব রূপ গ্রহণ করেছে, কোথাও তিনি বিশ্ব-রিক্ত জীবনবিরহী নন ; পার্থক্য দৃষ্টিভংগির : রোমান্টিক দার্শনিক ও সহজ দৃষ্টি। পার্থক্য প্রকাশের : পয়ার-ত্রিপদী, মুক্তবন্ধ ও গদ্য ছন্দ। সামন্ততান্ত্রিক চেতনা থেকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায়। এই তিনে মিলে এক রবীন্দ্রনাথ। এর একটিকে বাদ দিলে তিনি অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অজানা থাকবে তাঁর তিরিশোত্তর কবিতাগুলির বিচার বিশ্লেষণ করে না দেখলে। এর যোগেই তাঁর পূর্ণ পরিচয় ; শেষ পরিচয়ও। কারণ, উত্তর-তিরিশের রবীন্দ্রনাথই তিন স্তরের মধ্যে সবচেয়ে সমাজ-সচেতন ইতিহাস-সচেতন আত্ম-সচেতন শিল্পী। তাই মানুষের কাছে তাঁর পরম বাণী : 'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের'। এবং পরম জিজ্ঞাসা :

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে—

তার পরে ?

মহুয়া : রবীন্দ্রনাথের প্রেমধারণা

তেরশো ছত্রিশ সালে লেখা 'মহুয়া' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমধারণার এক বিশিষ্ট প্রকাশ হয়েছে।

'কড়ি ও কোমল'-এর দেহসীমার প্রেম আর নয়; এবার তীব্র নিখাদে দেহাতীত সীমাতীত ভালবাসার আস্বাদন। 'মানসীতে' কবি ধরতে চাইলেন সেই অধরাকে। রোমান্টিক কল্পনা কবিচিত্তকে নিয়ে গেল বিশ্বের সুন্দরের মাঝে—যেখানে প্রকৃতি মানুষ আর জীবনদেবতার প্রতি প্রীতিতে মমতায় কবির মনে এল প্রেমের দ্বৈধ রূপ। দাম্পত্য সম্বন্ধের বিচার করলেন তিনি 'রাজা ও রাণী', কিছুটা 'বিসর্জনে, নৌকাডুবি ও চোখের বালিতে' : বিশেষ পরিবেশে ও আবেশে বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহোত্তর অনুরাগের সম্বন্ধ নির্ণয়, বিরাগিনী বিধবার কুমারী-অনুরাগের স্বরূপ-বিশ্লেষণ। দ্বন্দ্ব বেধেছে সর্বত্রই; সে ব্যবধান সে অসবর্ণত্ব যতটা মানসিক ততটা সামাজিক নয়। কবি জেনেছেন প্রেমিক পুরুষের দুই রূপ—একজন ভোগী, অন্যজন ত্যাগী; নারীর মধ্যে রূপদ্বৈত—একজন উর্বশী, অন্যজন লক্ষ্মী। চরম আসক্তি ও নির্মম ঔদাসীন্য, অনন্ত যৌবনের চাঞ্চল্য ও কল্যাণময়তার স্থিরদ্যুতি। যেন প্লেটোব স্বর্গীয় আফ্রোদিতে ও পার্থিব আফ্রোদিতে, শেলীর ভূমৈব ও ভূমিজ প্রেম। 'প্রাচীন সাহিত্যে' কবির এই সময়কার প্রেমধারণার সুবিন্যস্ত প্রকাশ—'মোহে যাহা অকৃতকার্থ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব, এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনে যথার্থ শ্রী, এবং উচ্ছৃংখলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি।…নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা-অতিথিপ্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র-সৌভাগ্যে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়' (কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা)।

মহুয়া রবীন্দ্রসাহিত্য সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবির মনকে ভেঙেচুরে নতুন করে দিয়েছে, সেই 'নতুন' গড়ে উঠছে তাঁর মধ্যে, তাকে তিনি উপলব্ধি করছেন। পৃথিবী-পরিভ্রমণে বিশ্বকে দেখছেন, তার সঙ্গে গভীরভাবে

যুক্ত হয়ে মনে-মনে তিনি বিশ্বনাগরিক। দেশ-বিদেশের জীবন ও দর্শন কবির মননকে নতুন ভাব ও ভংগির পথে নিয়ে চলেছে। জাতীয়তাবাদী চিত্তে আজ আন্তর্জাতিকতা, রোমান্টিক কবি এখন দার্শনিক। গতির মাধ্যমে স্থিতি, সংগ্রামে শান্তি, ত্যাগে-ভোগে, মৃত্যুমাধ্যমে অমৃতলাভের পিয়াসী তিনি; দেশকালপাত্রে বিশ্বমানবতার রসায়ন। সমকালীন রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এই বিশ্বভাবনা ও দার্শনিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে। তাঁর প্রেমধারণার ভিত্তিতেও।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সভায় দুটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন: The message of the forest এবং রুদ্রের আহ্বান ও আশীর্বাদ। প্রাচ্যের জীবনদর্শন, তার তপোবন চতুরাশ্রম ও ত্যাগের বাণী কবির চিত্তভাবনায় প্রথম থেকেই প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। কালক্রমে পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিকতা এবং সগোত্রের রোমান্টিক কবিদের ভাবনা-কল্পনা তাঁর দৃষ্টি ও দর্শনকে দৃঢ়তা দান করেছে। বন্ধন থেকে মুক্তি তার মূল রাগ। ব্যক্তিজীবনে কবি আজ মুক্ত—'কোন বন্ধনই আমায় শিকল হয়ে বাঁধেনি কোনদিন। চিরদিন মনে মনে আমি উদাসী।' 'মানুষকে দেখতে চেয়েছেন তিনি মুক্তধারার স্বচ্ছন্দ তরঙ্গরূপে; তার চলার পথে কোন বাধা-বন্ধনই যেন না প্রবল হয়ে দাঁড়ায়, শুধু থাক দুপাশে তীরের বাঁধন। এই বিশ্বাসে তিনি স্বাক্ষর দিয়েছিলেন রোলাঁর এই আন্তর্জাতিক প্রচারপত্রে—We serve truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste. We work for it (humanity), but for it as a whole...we do not recognise nations, we recognise the people as one and universal।এই মুক্ত প্রাণের স্বচ্ছদৃষ্টিতে নতুন করে বিচার-বিশ্লেষণ করলেন ভারতবর্ষীয় বিবাহ, নারীর মনুষ্যত্ব ইত্যাদির। প্রেম সম্পর্কে প্রাচীন ধারণাই শুধু নয়, তাঁর নিজের পূর্বগামী ভাবনাকেও কবি অতিক্রম করলেন। কল্যাণবোধে যুক্ত হল কর্মৈষণা। সন্ন্যাস ও সংযম, সংগ্রাম ও তপস্যা, বিচ্ছেদ ও মুক্তি এই ভালবাসার লক্ষণ—যেমন নিবিড় মিলন তেমনি গভীর বিরহ; একদিকে ব্রাউনিং-ব্লেক-ড্যান, অন্যদিকে শৈব মহাভাব। ফলে, এ পর্বের প্রেম ত্যাগাঙ্গ ভোগের সাধনা: চতুরঙ্গ-শেষের কবিতা-যোগাযোগ, গৃহপ্রবেশ-তপতী-বাঁশরী, পলাতকা-পূরবী-মহুয়া। যাত্রীতে নরনারীর সম্বন্ধের নতুন বিশ্লেষণ, লিপিকায় কাব্যিক সংশ্লেষণ, রূপক-নৃত্য-ঋতুনাট্যে তাত্ত্বিক প্রকাশনা।

কবির এতদিন ধারণা ছিল, প্রিয়ার পরিণতি মাতায়, কল্যাণী গৃহিণীত্বে।

আজকের ধ্যান—প্রেম চালিত করে শক্তির পথে, বিশ্বমাঙ্গলিক কর্মোদ্দীপনায়। সে আত্মসমর্পণে উন্মুখ নয়, সে আত্ম-উপলব্ধি ও প্রকাশের জন্যে তপস্যা করে, সংগ্রাম করে, কামনা করে বিচ্ছেদের অগ্নিপরীক্ষা। সে বলিষ্ঠ গৌরবান্বিত বিশ্ববিধৃত। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রেমে কালিদাসের প্রভাব, এ পর্বে নটরাজ শিবের—'কালিদাস ছিলেন শৈব। সেই পথের পথিক কবিরা'। কবিকে ছেড়ে কবি-রাজকে আশ্রয় করেছেন কবিগুরু, সেই নাটের মহাগুরুর কাছে শিখছেন বাঁধন খেলার নিরাসক্ত ত্যাগের মুক্তিমন্ত্র। তাঁর বিশ্বাস—এই বিশ্বলীলা নট-রাজের, তিনিই এর ভাষ্যকার ও প্রযোজক, নাট্যকার ও মহানট; এই প্রেমের প্রকাশ-বিকাশ মানুষে-মানুষে ঋতুতে-ঋতুতে নীড়ে-আকাশে, বাহিরে-অন্তরে। 'শেষ বর্ষণে' কবি বলেন, 'মধুরের সঙ্গে কঠোরেব মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন' এবং 'এক প্রান্তে মিলন আর এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়' (নবীন)। শারদোৎসব-বসন্তেও এই তত্ত্ব, পূর্ণতা নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়। মহুয়া কবিচিত্তের এই মুক্তিপিপাসার একটি স্ফুলিঙ্গ, তাঁর এই অভিনব প্রেমধারণার কঠিন-কোমল অভিব্যক্তি।

মহুয়ার কাব্যবস্তুকে রবীন্দ্রনাথ দুই স্তবকে ভাগ করেছেন—প্রসাধনকলা ও সাধনবেগ। প্রেমের উপলব্ধির জন্যে প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষা, তদন্তে মিলনের অনুভব ও সম্ভোগ। মিলনের জন্যে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়, তিলেতিলে ক্ষয় করে সঞ্চয় করতে হয়, দেহেমনে হতে হয় সুন্দর—কারণ love is a growing; তার হঠাৎ-আসা নয়, ধীরে ধীরে হয়ে-ওঠা। প্রত্যাশা-প্রকাশ-অচেনা-অপরাজিত সবলা-প্রতীক্ষা ইত্যাদি কবিতায় অভিসারাত্মক প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষা। কিন্তু তার চলার শেষে আত্মসমর্পণ নেই, আছে দ্বন্দ্বসমাসের মত সাম্য ও পরস্পর স্পর্ধিত্ব। মহুয়ার প্রসাধন নারীকে রাধার মত 'দাসী' করে না, দাবী করতে শেখায়; পুরুষকে প্রলুব্ধ করে না, প্রজ্ঞাবান করে তোলে। মহুয়ার সাধনবেগ শুধুই আবেগ নয়, শক্তিও; তার সৌন্দর্য কোমল নয়, বীর্যবান। দুর্গমে চলে তার রথ দুঃখের অসমতলে, দুঃসাধ্যের অভিযানে, দুঃসহতম কাজে। বিজয়ী-দ্বৈত-বরণ-ডালা-পথের বাঁধন-মিলন ইত্যাদি কবিতায় প্রেমের সম্ভোগলীলা প্রকাশিত হয়েছে। সে-মিলন একের মধ্যে আরের লয় নয়, রসাপ্লুত মধুরতায় বিগলন নয়; সংগ্রামের মাধ্যমে শক্তিকে লাভ, হৃদয়ের স্পর্শে হৃদয়ের উদ্বর্তন, উজ্জীবন। মহুয়ার প্রেমগাথা কোমলকান্ত পদাবলী নয়, বীর্যসুন্দর সাধনসংগীত; অমৃতস্রাবী ভক্তির অভিসারী নয়, কলুষদ্রাবী শক্তির অভিযানী। প্রসাধনান্তে দুজনের

সাক্ষাৎ শ্যামল মঞ্জুকুঞ্জে নয়, গেরুয়া ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে; স্বপ্নলোকে মধুর লীলা-সঞ্চরণ নয়, কর্মলোকে কঠিন পদচারণা। একের শরণাগতি নয়, বিশ্বের অনুসরণ।

কবিতাগুলি দ্বিধাবিভক্ত হলেও প্রসাধন ও সাধনের সীমারেখা সর্বত্র খুব স্পষ্ট নয়; সম্ভবও নয়। কারণ একের সীমানাই অপরের সীমান্ত। প্রস্তুতির মধ্যেই রয়েছে উপলব্ধির দ্যোতনা, সম্ভোগের মধ্যেও প্রসাধিত হতে থাকে মন। তবু প্রাধান্যের বিচারে এরা দুই শ্রেণীর। আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর কতকগুলি কবিতা আছে মহুয়ায়, বিশেষত শেষের কবিতাগুলি—শেষের কবিতার 'বিদায়' যাদের মধ্যমণি। আগের দুটির অনুসরণে এই তৃতীয় স্তবকের নামকরণ করা যেতে পারে—'শোধন পালা'। রবীন্দ্রনাথ এর কথা বলেননি সূচনায়, কিন্তু প্রসাধন ও মিলনসাধন, এইখানেই মহুয়ার সুর থেমে থাকে নি। তার পরেও বেজে উঠেছে বিদায়ের রাগিনী; করুণ পূরবীতে নয়, নিষ্করুণ বিভাসে। যে ত্যাগ ও মুক্তির ভাবনা কবির মানসিকতায় ও মননশীলতায়, মহুয়ায় তার প্রকাশ না হয়ে পারে না। প্রথম দুটি ভাগে মুকুল ধরা, শেষভাগে মুকুলঝরা। বলাকায় কবি জেনেছেন, চাওয়া ও পাওয়া যেমন সত্য, ছেড়ে-যাওয়া তার চেয়ে কম সত্য নয়। মিলনে চিত্তের জাগরণ, বিচ্ছেদে তার বন্ধন-মোচন; সেই মুক্তি আনে চিত্তের বিস্তারকে, দুঃখের শোভায় সুন্দরকে। পলাতকা-পূরবীতে, তপতী-মহুয়ায় এই তত্ত্বের স্বীকৃতি—কোথাও ব্যথাছলছল, কোথাও সানন্দ। অতনুর বীরতনু, সে তো বিরহ-বেদনায় নিরাশা-কাতর হবার নয়। মহুয়ার প্রেমের বিচ্ছেদে বিবশ ব্যাকুলতা নেই, দুঃখদহণের বিলাপ নেই। সে-প্রেম কামহর ও পাপহর, মদনজয়ী ও মৃত্যুঞ্জয়। একলা দিন কাটানোর বিরহ-আর্তি নয়, একলা পথচলার ছেদহীন আরতি। শান্তির মন্ত্র বেজে ওঠে শক্তিময়ী আত্মদানে—সুমিত্রার, অভিজিতের, কিশোর-নন্দিনীর। বিচ্ছেদের হোমবহ্নি প্রেমকে করে তোলে পূজা। সুন্দরের দুই চক্ষে অশ্রুজল, হৃদয়ে দুঃসহ জ্বালা; সেখানে বন্ধনমোচনেব আচমনমন্ত্র:

> নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
> ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি॥ (নৈবেদ্য)

সেখানে—

> তুমি কবে মর্মমাঝে পশি
> আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী॥ (বিরহ)

যে যাবার সে যাবেই, তাকে ধরে রাখা যাবে না, এইই তো বিশ্ববিধান।

তবে অকারণ আকুলতা কেন ? যেমন সহজে আসা, তেমনি সহজ হোক যাওয়া। ব্যথিত হৃদয়ে থাকুক্ তার ছায়া, আর মনে মনে বাঁশিতে বাজুক :

'ভুলিব না কভু' বিভাসে ললিতে
এই কথা বুকে দোলে ॥ (বিদায় সম্বল)

Instant made eternity। অতএব—

ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায় ॥ (বিদায়)

মহুয়ার আর-এক পর্যায়ের কবিতার কথা কবি উল্লেখ করেছেন—ঋতু উৎসব পর্যায়ের। এই ঋতু গীতির মধ্যেও প্রেমের ত্রৈত স্তর—প্রসাধন-সাধন-শোধন। বসন্তের অভ্যর্থনার আয়োজনে পৃথিবীর বুকে চলেছে প্রকৃতির প্রসাধন, ক্লান্তি-বিহীন ফুলফোটানোর খেলা, রূপরঙরসের মেলা। ডালগুলি শ্রবণ পাতে অলখ-জনের চরণশব্দে মেতে চঞ্চল প্রশ্নে এলোমেলো বনের বাতাস, নিমেষ-গণনায় বিশ্বপ্রকৃতির প্রস্তুতি। সমাপ্ত প্রসাধন, যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা ধরাবধূ। তারপর সে আসে, আসে বরবেশে। ফটিকজল ঝরণার স্বচ্ছ ধারায় মুখ দেখে সূর্যতারা, হাসিতে ছায়াতে ছন্দে ছবিতে আলোয় আকাশ ভরা, বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন দুলে। তারপরে, তারও যাবার পালা, যাবার ত্বরা :

বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায় চৈৎফসলের শূন্য খেতে
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায় বিদায় নিয়ে যেতে যেতে।

সে-বিচ্ছেদও সময়হারা ও ব্যথাহরা। ওই বছরের শেষের মধু দিয়ে ভরে উঠবে এই বছরের মৌচাক, চৈত্রে ফোটা দোলন চাঁপাই ফুল হবে বৈশাখে। এ-বিরহ তো রিক্ততা নয় শূন্যতা নয়, বিবাগী পূর্ণতা ; বিদায়-বেলায় বিলিয়ে দেবার নেশা তাই—

চরম দেওয়া সঁপিতে চায় ঐ মরণের স্বয়ম্বরা ॥ (শেষ মধু)

অনেকদিন থেকেই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করছিলেন, 'প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই' (সাহিত্য)। মহুয়ার প্রেমে সেই কর্মের এষণা ও প্রেরণা। এখন সে শুধু অনুভূতি নয়, একটি তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। সে তত্ত্ব ত্রিস্তরের—প্রসাধন-সাধন-শোধন বা অভিসার-মিলন-বিরহ।

কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের কবি কালিদাস মাতৃত্ব-পিতৃত্বের মধ্যেই দেখেছেন দাম্পত্যের পরম পরিণতি, বিরহের পর কল্যাণী আদর্শের গণ্ডীতে মিলন। বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক প্রেমলীলাতেও বিচ্ছেদ-অন্তে অন্তহীন ঐক্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেমধারণাও একদা কালিদাস চণ্ডীদাস ভবভূতি বিদ্যাপতির নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করেছে। 'প্রাচীন সাহিত্যে' তার তত্ত্বরূপকে দিয়েছেন ভাষারূপ। আবার প্রেমের সঙ্গে ত্যাগ, বিরহ ও বিশ্বচেতনাকে এক করেও দেখেছেন; রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মালিনী বিচিত্র প্রবন্ধের 'পথপ্রান্তে' দ্রষ্টব্য। এই পর্বে, মহুয়ায় মিলনের পর বিরহ; যা ছিল ভাবনা, তা হল তত্ত্ব। রূপ গোস্বামীও বলেছিলেন, সঙ্গমে স একা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে। কিন্তু উভয় বিরহের তন্ময়ত্ব এক নয়, একজাতেরও নয়। রাধাবিরহ বিশ্বৈকমুখী হয়েও কৃষ্ণৈকমুখী, পৃথিবীর ঐকতানের মাঝখানে দাঁড়িয়েও একটি বাঁশির একতানে মোহিত; তাই ভাবসম্মিলনে সমস্ত দুনিয়া পড়ে থাকে বাইরে, রাধা হন শ্যামময়। মহুয়ার প্রেম মহুয়ার মতই ঋতুর ফসল, বসন্তের নকীব; সে ভরে রাখে, ধরে থাকে না, দান করে, সঞ্চয় করেনা। তার মধ্যে আছে শক্তি সংযম উন্মাদনা, আবার সুন্দর কল্যাণ কর্মপ্রেরণা। বিরহ সত্য, মানুষ মাত্রেই একক—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। কিন্তু তার সাধনা বহু থেকে একে উপনীতি নয়, এক থেকে বহুতে উত্তরণ, আত্মকেন্দ্র থেকে বিশ্বপরিধি-পরিক্রমা। মহুয়ার প্রেম উজ্জীবনী, 'উজ্জীবন' তার ধুয়া। 'মদন ভস্মের পরে' প্রেমের বিশ্বতনু, সে ছড়িয়ে পড়ে জীবেজড়ে; 'তপোভঙ্গের' পরে প্রেমের বীরতনু, সে পায় মহৎ নবজীবন। যা কিছু স্থূল রূঢ় মূঢ় নিশ্চিহ্ন হল আগুনে, মৃত্যু নিয়ে এল অমরতা, মিলন হল প্রখর, বিচ্ছেদ হল সুন্দর। প্রেম বিশ্বব্যাপ্ত ছিল, এখন হল শক্তিদীপ্ত; দুঃখ-দুর্গমের বন্ধুর পথে তার উপলমুখর পথচলা। অতনুর এখন অগ্নিময়তনু, নবজাতক অমৃতময় ভালবাসা। সে চির অমর। তার বিরহ সবহারানো নয়, একে হারিয়ে যাওয়া নয়; সব পাওয়া, সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া। সে 'কৃপণের পুঁজি নয়, আনন্দের অমিতব্যয়।'

বলাকার দার্শনিকতায় ও পলাতকার ঘরোয়ানায় এই ভাবনার পূর্বাভাষ, পূরবীর মাটিঘেঁষা প্রীতি-মমতার তটপ্রান্তে নির্মম সাগরপাড়ির আবেগমন্থরতা; মহুয়ায় এই ধারণার পূর্ণরূপ ও শিল্পরূপ। তত্ত্ব কথনও স্পষ্ট ভাষণ নয়। আবার তা ছড়িয়ে গেল বিচিত্রিতায় নরনারীর প্রেমবন্ধনে, বনবাণীতে প্রকৃতির প্রীতিবন্ধনে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমধারণা মহুয়ায় কেবল স্পষ্ট ও পূর্ণ নয়, সামগ্রিক ও সমন্বিত।

প্রেমকে দেখেছেন তিনি সুবিহিত তত্ত্ব ও দর্শনরূপে, দেখেছেন তাকে মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতিতে সমভাবে লীলাময়ী। কবির এই দৃষ্টিসমগ্রতার কারণ ও কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এখন উল্লেখ্য—কবির এই দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে পুষ্টি দান করেছে প্রকৃতির লীলা, বিশেষত ঋতুরঙ্গ। কবির ভাষায়—'আর কোনখানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি; তারই সঙ্গে মানবভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে' (মহুয়া : সূচনা)। শুধু বিশ্ব-জগৎ নয়, কবির সাহিত্যজগৎও এখন নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। মহুয়া তারই একটি মিলন-বিরহ পালা।

কবিচিত্তে ঋতু-প্রকৃতি ও মানবমনের এই একাত্মতাবোধের গভীরতম প্রকাশ 'নাম্নী' জাতীয় কবিতায়। মহুয়ার প্রেমতত্ত্ব এর পট, মানুষ ও প্রকৃতির অভেদজ্ঞান এর ভূমিকা। প্রতিটি কবিতায় নারীর এক একটি বিশিষ্ট রূপের কল্পনা, এবং সেই বিশেষ রূপের সঙ্গে প্রকৃতির এক-একটি রূপবতী উপাদানের অনুপমা উপমা। নারীর দেহেমনে প্রকৃতির অলংকার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কোন সাহিত্যেই দুর্লভ নয়। কিন্তু 'নাম্নী' স্বতন্ত্র জাতের অলংকরণ। কালিদাসের 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' এবং 'মূরতি'র 'লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি'—এক নয়। প্রথমটিতে নারী লতার মত, দ্বিতীয়টিতে লতা যেন নারী। আলোচ্য স্তবকে সতেরটি কবিতার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রা। সচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি আর বিচিত্র নারী-প্রকৃতি, তাদের রূপ-গুণ-চরিত্র—বিভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন ভংগিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদাহৃত করা যেতে পারে।

'শামলী' গাঁয়ের শামলা নদীর মত। ধীরস্থির অচপল, নিথর নিবেদনে তার স্তব ও শান্তি। স্তম্ভিত মেঘের মত আত্মদান-প্রত্যাশায়, কাকচক্ষু দিঘিজলের মত অতল প্রসন্নতায়, অশ্রুসজল করুণার অঞ্জলি 'কাজলি'। 'হেঁয়ালি' শরতের মেঘের মত; হঠাৎ বৃষ্টি, হঠাৎ ক্ষান্তি; বিচলিত দুরন্ত উচ্ছ্বাস, আবার বিগলিত করুণার উৎসার; নির্দয় লীলায় দূরে চলে যায়, পরমুহূর্তে নত হয় আত্মসমর্পণের ভারে। অজানা গ্রামের মত অজানা মন 'খেয়ালীর'; সে উদাস-বিরহিনী, আন্তরিক মিলন-কামনা প্রকাশে হরিণীর মত ভীরু। 'কাকলী'র প্রাণ নদীর কলছন্দে পূর্ণ; অরণ্যের পাতায় যে চাঞ্চল্য, ধানের ক্ষেতে যে ঢেউ, সে তারই চলন-বলনের প্রতিধ্বনি, জড়তা ভাঙার ধ্বনি। সন্ধ্যাতারার প্রতীক্ষা ও মমতা, নৈঃশব্দ্য ও সৌভাগ্য, মৌনতা ও মিনতি পিয়ালী'তে। 'নাগরী' তুফান, কিন্তু চপলা নাগরিকা নয়; তার চলনে ছন্দ আছে, গানে ছলনা নেই;

সে ককেট নয়, স্মার্ট নয়, সুনাগরিকা—রূপের ছন্দে বিদ্যার অলংকার। 'সাগরী'র রূপ বিপরীত; তার বহিরঙ্গে উচ্ছ্বসিত ঢেউ, অন্তরে নির্জননীল গাম্ভীর্য। উষা সূর্যের আগমনী, সুপ্রভাতের প্রতীক-প্রতিমা; 'উষসী' আনে নতুন জাগরণী, চিত্তে জ্বালে আলো, নতুন চেতনার দিব্য অভ্যুদয় তার আবির্ভাবে; লালসা-আবেশের স্বপ্নহর নির্মল ভয়হীন আলোকের জয়ধ্বনি তার সৌর অভিসারে। ইত্যাদি।

এই ভাবে কবি একের পর এক নারীপ্রকৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বপ্রকৃতির অভিন্ন সাদৃশ্যে। তার প্রতিটি চিত্রই স্বতন্ত্র, মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের বীরাঙ্গনাদের মত। এখানে শুধুই অঙ্গনা। তাদের বিচিত্র নামায়নেই স্তবকের নামকরণ 'নাম্নী'। আধুনিক কবিতায় এদের দেখা পাই কিন্তু এমন অবিচ্ছিন্ন স্তোত্রমালায় নয়। এবং যেহেতু মহুয়ার প্রেম নৈর্ব্যক্তিক, নাম্নীর নামরূপও তাই ব্যক্তিসত্তার অতীত। শুধু ভাব, শুধু রূপ, শুধু রেখা, শুধু ছবি।

ছবি হওয়ার কারণও আছে। এই সময়ে কবি ছবি আঁকায় হাত দেন; আকারের মায়াজালে তিনি মোহিত—'এই রূপসৃষ্টির বিষয়ে মন মেতে ওঠে'। এই রেখার আমেজ রূপ নিয়েছে মহুয়া কাব্যে, নাম্নী ও অনামিকা কবিতায়। এক একটি কবিতা এক একটি চিত্র, রঙে ও রেখায় রসায়িত। এর ছন্দ কানে তত জোরে বাজেনা, যত স্পষ্ট ধরা দেয় চোখে ছবি। সেই ছন্দিত স্পন্দিত অলংকৃত চিত্র চিত্তকে নিয়ে যায় অচিন লোকে। এর অলংকারের সোনা সনাতনী, কিন্তু কারুকার্য আশ্চর্য নতুন; প্রকাশভংগি অভিনব ও নিত্যনব। যেমন—

আঁখি দুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।

বা হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে।

বা নগরে জনতা-মরু,
সে যেন তাহারি মাঝে সঙ্গীহীন তরু।

বা বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা।

কিংবা চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়—
যে-কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায়;

যে-কথাটি ঢেউ তোলে
আশ্বিনে ধানের খেতে, প্রান্ত হতে প্রান্তে যায় চলে ;
যে-কথাটি নিশীথতিমিরে
তারায় তারায় কাঁপে অধীর মির্মিরে।

শ্লোকগুলি সংচিত্রিত ; চিত্র সুন্দর ; সুন্দর প্রেমের দূত ; কীটসের দূতীয়ালী—

The beauty grows upon me, and I feel
a greater love through all my essence steal

সাহিত্য-শিল্পের আকাশে প্রেম যেন সূর্য। তার আলো সর্বত্রগামী। বেদের আকাশ-পৃথিবীর মিলনগানে, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বে, উপনিষদের ব্রহ্ম-শক্তি লীলায় তার প্রবেশ নিষেধ নয়, প্রকাশ নিরুদ্ধ নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম মুখ্যত দেহবাদী। কালিদাস-ভবভূতিতে ইন্দ্রিয়াতীতের চেতনা ও কেশটের সর্বপ্রাণী সাধারণবৃত্তিতে প্রেমের গভীরতা ও গাঢ়তা আছে, নেই ব্যাপকতা, শক্তিময়তা, বীর্যবত্তা। বৈষ্ণবের প্রেম সংস্কৃতের ধারাবাহী, যদিও তার দেবতা মদন নয় শ্রীকৃষ্ণ। তার ভালবাসায় উন্নতি ও আত্মনিবেদন আছে, নেই কর্মে উদ্বোধনী ক্ষমতা। সে চিত্তকে বিশ্বে ব্যাপ্ত করে না, কৃষ্ণে সংহত করে। তার স্পর্শে শাক্তের শক্তিসাধনা সরে আসে ভক্তিতে। বীরাচারের পর দিব্যাচারে তারও একের মধ্যে সংবৃতি—'সাহম্'। পাশ্চাত্য প্রেমাদর্শ ভোগমুখ্যা ইন্দ্রিয়গোচর। ওভিদ ও বোকাসিও তার দৃষ্টান্ত। পেত্রার্ক-দান্তে থেকে পার্থিব ভালবাসার দৈবীকরণ। পরবর্তী রোমান্টিক কবিদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় নির্ভরতায়, যদিও গ্রীক দর্শনের প্রভাবে অনেকে স্বর্গীয় ভাবে অনুভাবিত হয়েছেন। ড্যান গেলেন মেটাফিজিক্‌সের মননশীলতায়, ব্রাউনিঙ অতীন্দ্রিয়তায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব ইন্দ্রিয়জ নয়, অতীন্দ্রিয়ও নয়—এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। তাঁর ভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যুগ্ম স্বাক্ষর আছে, প্রকৃতির অবদান আছে, আছে শিব-শিবানীর দাম্পত্য প্রেম ও শৈব অনাসক্তি। তাঁর দেবতা কামদেব নয়, প্রজাপতি নয়, যোগিরাজ নয়, 'বীরতনু অতনু'—মৃত্যুর কোলে যে লাভ করেছে অমৃতদেহ, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ভাবরসে সিঞ্চিত। সংসার ও বিশ্ব, আসক্তি ও আদর্শ, ভোগ ও ত্যাগ, অভিসার ও প্রতিসরণ, মিলন ও বিরহের এক অপূর্ব মাল্যবন্ধন মহুয়ার ফলে-ফুলে।

কালিদাস প্রেমকে করেছেন তপস্বিনী, মাতৃত্বের মধ্যে দেখেছেন তার শেষ সার্থকতা। শরৎচন্দ্র প্রেমকে করেছেন সংগ্রামী, নারীচিত্তের বিশ্লেষণে দেখেছেন

আত্মচেতনা ও সমাজচেতনার অনিবার দ্বন্দ্ব, বাহির ও অন্তরের বন্ধনমোচনে তার সার্থকতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথে দুইই আছে; আছে এর চেয়েও বেশি, আর একটি তৃতীয়। বিকৃত ফ্রএডীয়ানার যুগে তার প্রয়োজন ছিল।

মনস্তত্ত্ববিদের মতে, মানুষের যে অন্যতম প্রধান চিত্তবৃত্তি 'যৌনতা' (সেক্স্ নয়, এরস্), সহজ চর্যার মধ্যেই তার সুস্থ স্বাস্থ্য। যৌনবোধের অবদমন ও অনাচারে আসে বিকৃতি ও ব্যাধি, একদিকে স্বেচ্ছাচার, অন্যদিকে মনোবিকার। যৌনতার নির্বাণ বা অনির্বাণ চর্চা নয়, প্রয়োজন সুস্থ সুসম অনুশীলন, বিশুদ্ধিকরণ ও উদ্বর্তন। এসম্পর্কে লরেন্স থেকে শুরু করে স্তাঁদাল, মোরোয়া, সার্ত্র ইত্যাদির নানা মত। বিশ্বের এই নানাস্থানিক প্রেমতত্ত্বের পাশে রবীন্দ্রনাথের প্রেমধারণাও একটি তমোনাশী উজ্জ্বলতম শিখা। সে আলো প্রৌঢ় যৌবনের প্রজ্ঞাজাত। তাতে 'বাঁশরীর' মত উদ্দেশ্যমূলক ফর্মূলাও আছে। কিন্তু মহুয়ার প্রেমকে অবাস্তব অব্যবহারিক বলা চলে না। যৌন প্রবৃত্তির, প্রেমবৃত্তির অবদমন কবির কাম্য নয়, উচ্ছৃংখলতা তো নয়ই। তাঁর সাধ্যঃ সুস্থ স্বাভাবিক নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত সংযত সংহত ভালবাসা; যার জন্যে চাই অনুশীলিত দেহ ও পরিশীলিত মন, চাই দুটি হৃদয়ের সহৃদয়তা ও সবর্ণত্ব—শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে রসবোধে। মদনকে তিনি মেরে ফেলেন নি, মৃত্যু থেকে তাকে জাগিয়ে তুলেছেন; মদনজিৎকে প্রেমের দেবতার আসনে বসান নি, তাঁর থেকে নিয়েছেন বীর্য ও শক্তি, ত্যাগ ও সংযম। তিনি তো শুধুই শক্তিবিহীন যোগী নন, শিবানীবল্লভ ভোগীও; তপস্যায় তাঁর জীবনের বিরতি নয়, তপস্যান্তে রতির আরতি। অতনুকে কবি তনুহীন করেন নি, তাকে দিয়েছেন বীরতনু এবং সেই অগ্নিশুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ী মদনকে গড়েছেন মদনজিৎ মৃত্যুঞ্জয়ের ভাবে-আভাসে; নরনারীর যৌনপ্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যকে, ব্যক্তিত্বের গৌরবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সবলে। তাই একজন যখন বলে, 'যাবনা বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী, অপরজন তখন শোনায়, 'সেবাকক্ষে করি না আহ্বান'। মহুয়ার প্রেম শক্তিবাদী না হয়েও শক্তিমান, স্বেচ্ছাচারী না হয়েও সাম্যবাদী। এ-তো মদনকে মেরে ফেলা নয়, বাঁচিয়ে তোলা, নূতন মানসিকতায় চিরন্তনত্ব দান করা, স্বাস্থ্যবান আদর্শের দ্বারা অসুস্থ উচ্ছৃংখলতাকে সংযমিত করে উদ্বর্তিত করা। মদনদেব এখানে 'কুসুমায়ুধ' নন। তাঁর আয়ুধ বীর্যবত্তা, আত্মসচেতনা। মহুয়ার প্রেম সর্বসাধারণ মানুষের জন্যে, তাই সে নৈর্ব্যক্তিক; যৌনগত নৈরাশ্যের ও নৈরাজ্যের অভিমুখী নয়; সুস্থ বলিষ্ঠ আদর্শায়িত, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার অভিসারী নয়।

বাস্তবের কঠিন ভূমিতে রক্তমাংসের মানুষের জন্যেই তার ছায়াঘেরা আসনখানি পাতা। এই মন নিয়ে কবি এই আদর্শকে উপস্থাপিত করেছেন দাম্পত্য ধর্মে —উপন্যাসে-নাটকে-প্রবন্ধে, পরবর্তী বিচিত্রিতা কাব্যে। এই মন নিয়েই কবি আশ্রমবালিকাদের বিবাহে যোগ দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন—'পূর্ণ করো অহরহ শুভকর্মে জীবনের ডালা'।

একদা যিনি বিশ্বাস করতেন 'সমস্ত কুমারসম্ভব-কাব্য কুমারজন্মরূপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা'; কালক্রমে তিনি উপলব্ধি করলেন 'এর পন্থা হচ্ছে কামনাদমন এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে কুমারসম্ভব, যে-কুমার সমস্ত কু, সমস্ত মন্দকে মারবে। স্বর্গরাজ্যকে ব্যাঘাতশূন্য করে দেবে।' ১৩০৮ সালে যিনি লিখেছিলেন, 'জননীপদ আমাদের দেশে নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গলব্যাপার। সেইজন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ (কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা: প্রাচীন সাহিত্য); ১৩৩৫ সালে তিনি লিখলেন, 'আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবী করেছে। জননার্থং মহাভাগা বলে তাদের গণনা করা হবে না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য।...গণনায় মানুষের পরিমাণ পাওয়া যায় না, পূর্ণতাতেই তার পরিমাণ। আমাদের দেশেও কৃত্রিম-বন্ধন-মুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা—লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা (নারীর মনুষ্যত্ব: সমাজ)।

কালিদাস লিখেছিলেন কুমারসম্ভব কাব্য, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন কু-মারসম্ভব কাব্য।

কথার ছবি

চারপাশের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেই মানুষ ব্যক্ত করে নিজ জীবনের ও জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন প্রয়োজনে। তেমনি শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে, স্রষ্টার ব্যক্তিমনের মাধুরী দানা বাঁধে বস্তুজগতের মধু সহায়ে। ওড়বার জন্যে যেমন পাখির দরকার ডানার, তেমনি শিল্প-ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্যে প্রয়োজন আধারের। কেউ গ্রহণ করেন সংগীতের মাধ্যম, কেউ চিত্রের, কেউ বিজ্ঞানের, কেউবা সাহিত্যের, মনোভাবকে ব্যক্ত করেন কথার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কথা তো শুধু কথামালা নয়, শব্দের ফুল গেঁথে গেঁথে সে হয় ছবি ও গান। কবির মনোভাব প্রকাশের তাই ছুটি ডানা—চিত্র ও ধ্বনি। এদের সম্মিলিত সাহায্যেই অর্থ ব্যক্ত হয়ে ওঠে, সঞ্চালিত হয়, সঞ্চারিত হয়। নইলে, কেবলই কথার ফুলঝুরি জ্বেলে অপর মনকে আলোকিত করা যায় না। তাকে হতে হবে লোক-লোচনগ্রাহিণী, তার চেয়েও বড়ো—মনোহারিণী।

সাহিত্য সংগীত নয়। তবু আবেগের গভীরতম মুহূর্তে কথা হয়ে ওঠে গানের তারা। সাহিত্য চিত্রও নয়। তবু আত্মপ্রকাশের জন্মলগ্নে সেও হয় চিত্রিত কাব্য। এ সম্বন্ধে সমালোচক বলেন, সুন্দর ভাব প্রকাশ করাই হল সাহিত্যের চিত্রকলার কর্তব্য। অনির্বচনীয়কে বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে প্রয়োজন হয় সংগীতধর্ম ও চিত্রধর্মের। ছন্দ ও অলংকারই চিত্র এবং এগুলি সুন্দর দেহের 'কটককুণ্ডলাদিবৎ'। তথাপি এগুলো বাইরের বস্তু নয়, ভাব ও ভাবনার সঙ্গে এরা অন্তরঙ্গ ও অভেদ, কাব্যশরীরের সৌন্দর্য-সহায়ক। যেমন, নারীদেহের সুন্দর প্রকাশ পায় লাবণ্যে আভরণে ও প্রসাধনে।

কাব্যিক অলংকরণের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের—যখন মানুষের মনে এসেছে আভিজাত্য, যখন রাজসভার ঔজ্জ্বল্য তার চোখে আলো ফেলেছে অথবা তার মননে এসেছে প্রজ্ঞাপারমিতার কল্পদৃষ্টি। তারও আগে আদিমকালে, মানুষের চারপাশের জগৎ এবং তার মনোজগৎ এত সমৃদ্ধ সুষম অথবা সংস্কৃত ছিলনা। তখন রাজা না থাক নেতা ছিল, শোভা না থাক সভা ছিল, কাব্য ছিল,

চিত্রও ছিল। কিন্তু বচনকে অনির্বচনীয় করে তোলার, সুন্দরকে অলংকৃত করার কোন ধ্যান কোন ধারণাই সেদিনকার মানুষের ছিলনা। তার অন্তরে বাহিরে জীবনে ও সাহিত্যে দরবারী জৌলুষ অথবা কল্পনার রংমহল তখনও গড়ে ওঠেনি। তখনকার মানুষের জীবন ছিল সংগ্রামী, মনন ছিল জীবনসংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার। কল্পনা নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু তা কর্ণের রথের মতো মাটি-ঘেঁষা ছিল, যুধিষ্ঠিরের রথের মতো না-ছুঁই-মাটি হয়ে চলতে শেখেনি।

মহাশূন্য থেকে নতুন পৃথিবীর যখন জন্ম হল, তখনও তার শারীরিক সংস্থান গঠনপথে। প্রকৃতির ও প্রাণীর, জড়ের ও জীবের দেহে রূপ আসেনি, সুন্দর আসেনি। শিল্পীর তখন সবেমাত্র হাতেখড়ি, শিল্প তখন নবজাতক। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে 'নাহি রেক নাহি রূপ ন বর্ণং ন চ শব্দং'। প্রথমা পৃথিবীর রেখা ছিল না, রূপ ছিল না, বর্ণ ছিলনা, শব্দ ছিলনা। ক্রমে, ভাষাহীন প্রকাশহীন ছবিহীন রংছুট বোবা স্তর পেরিয়ে মানুষ কথা বলতে শিখল—তাও বাক্য নয়, ফ্রেজও নয়, কেবলই শব্দ ; এক অক্ষর বা দু' অক্ষরের। এই মুখের কথায় ধ্বনিই সর্বস্ব। সেই ধ্বনি-প্রধান কথাকে লেখার রূপ দিতে গিয়ে সৃষ্টি করল চিত্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষার দুটি ভাগের কথা বলেছেন—সংকীর্তিত ও সংচিত্রিত ভাষা। আদিম ভাষার কথ্যরূপ সংকীর্তিত আর লেখ্যরূপ সংচিত্রিত। বিশারদগণের মতে, চিত্রলিপি আদিমতম ; বর্ণমালার লিপি লিপি-বিবর্তনের শেষ পরিণতি। তাঁরা বলেন, "ধ্বনি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বাদ দিয়া শুধু ভাব প্রকাশের ক্ষমতার দ্বারা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাগৈতিহাসিক কালের চিত্রাঙ্কনও এক ধরণের লিপি বিশেষ" (বিজ্ঞানের ইতিহাস—১ম খণ্ড)। প্রস্তর-যুগের গুহাবাসী মানুষ স্পেনে, ক্রীটে প্যালেষ্টাইনে, ক্যালিফোর্নিয়ায় পাথরের দেওয়ালে আঁচড় কেটে কেটে মানুষ, জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক বস্তুর যেসব ছবি এঁকেছে, তা-ই লিপির আদি রূপ। তারপরেও বহুদিন চিত্রলিপির প্রয়োগ অব্যাহত ছিল। ক্রমে, একটি-দুটী ছবি থেকে একাধিক চিত্রের নিপুণ সন্নিবেশে বক্তব্যকে আরও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা হল। 'সংকেত'-এর রূপ নিল ছবিগুলো। যেমন—একটি চোখ, দুফোঁটা জল—প্রকাশ পেল শোকভাব। অনেকদিন পরে এল ধ্বনিলিপি। প্রথমে প্রতীকরূপে, শেষে বর্ণমালার বর্ণ হয়ে। ধ্বনিকে ব্যক্ত করার উপায় মিলল। কিন্তু চিত্রলিপি থেকে সরাসরি ধ্বনিলিপি আসেনি। উভয়ের মধ্যে আরও একটি স্তর ছিল, যেখানে চিত্র ও ধ্বনি দুইই সংকেত মাধ্যমে প্রকাশ পেত। প্রাচীন মেসোপটেমীয়, মিশরীয়, ক্রীটান

অথবা হিট্টাইট্ লিপি অনেকটা এই ধরণের। বিশেষজ্ঞগণ এদের আলোচনা করেছেন কিউনিফর্ম, হায়রোগ্লিফিক, হায়রেটিক, ডিমেটিক ইত্যাদি লিপি নামে। আমাদের সিন্ধু উপত্যকার লিপিও অনেকটা এই জাতীয়।

আদিম মানুষের মৌখিক ধ্বনির অনেকগুলিই প্রকৃতির জড় ও জীবের ধ্বনির অনুকরণ। তার চিত্রলিপির বিষয়গুলিও চারপাশের বাস্তব থেকে সংগ্রহ করা। বাইসন, মাছ, হরিণ, পাখি, মানুষ, পাহাড়, গাছ, সূর্য, চন্দ্র, শস্য ইত্যাদি ছিল তার বর্ণমালা। বক্তব্য বিষয় ছিল সকলের জানাচেনা প্রাত্যহিক ঘটনা ও চিন্তা—শিকার, আহার, কৃষি, দাঁড়ানো, যাওয়া ইত্যাদি। সুন্দর-অসুন্দর ভাববার ও বোঝবার মতো পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অবস্থা তার তখনো আসেনি। মনের কামনাটুকু লিপিতে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেই সে খুশি। তাই পরিচিত জগৎ ও ভাবনা নিয়েই তারা ছবি খোদাই করত পাথরের মাটিতে। উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা ছিল অজানা। যখন ধ্বনিলিপির আবির্ভাব হল 'বর্ণ'-সমারোহে, তখন প্রাচীন চিত্রগুলি সংকেতে, প্রতীকে, শেষে অক্ষরে বিবর্তিত হয়ে গেল। আগে ছিল অঙ্কন, এখন হল লেখন। ওদিকে আলাপচারীতেও, শব্দ গেঁথে গেঁথে হল বাক্য। সে তখন ধ্বনি নয়, অর্থও দ্যোতিত করে। আর, আক্ষরিক বর্ণমালা চিত্র নয়, এক একটি বিশুদ্ধ ধ্বনিকে ব্যক্ত করে। কিন্তু তা বলে ছবিকে সে ত্যাগ করল না। লেখনের মধ্যেই রইল অঙ্কন, ধ্বনিলিপির সন্নিবেশে চিত্রলিপি, খোদাই ছবি থেকে কথার ছবি। তাকে চোখ দিয়ে আজ আর দেখা যায় না, মন দিয়ে ভেবে নিতে হয়। তারই নাম চিত্রালংকার তথা কাব্যে চিত্রকলা।

[অলংকারশাস্ত্রের মতে, অলংকারের ছবিগুলো জাগে স্মৃতি সহযোগে, স্মৃতি জাগায়। আদিম লিপিও স্মৃতি-সহায়ক ছিল। যে সব অঞ্চলে লিপির ব্যবহার জানা ছিল না, সেখানে স্মারক হিসেবে নানা কৌশল অবলম্বন করা হত। পেরুভিয়া, পলিনেসিয়া, চীন, ইন্দোচীন, আসাম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে গিঁটবাঁধা দড়ি বা দাগকাটা লাঠি এক ধরণের পত্রবিশেষ ছিল। উত্তর আমেরিকার ইরোকোয়া আদিবাসীরা সাংকেতিক পদ্ধতিতে পুঁথি গেঁথে গেঁথে মনের কথাকে প্রকাশ করত। আমাদের দেশেও একদা পুষ্পলিপির প্রচলন ছিল।]

প্রথম স্তরের মূর্তিশিল্পে যেমন থাকে অসামঞ্জস্য, চিত্রলিপিতে যেমন থাকে অসমতা, তেমনি তার কথায় গাঁথা ছবিও ছিল অসুন্দর। কিন্তু অবাস্তব ছিল

না। ক্রমে সমাজ উন্নত হতে থাকল, একদল মানুষ জীবনের বাস্তভূমি থেকে সরে গেল ওপর তলায়। তাদের সৃষ্ট সাহিত্যও মাঠ পাহাড় বন ছেড়ে ওপরে উঠতে লাগল কল্পনার রথে চেপে। তখন তার চিত্রালংকারে সৌন্দর্য আছে, আভিজাত্য আছে; নেই শ্যামলা মাটির সোঁদা গন্ধ, সহজ স্বাভাবিকতা। সে আর গ্রাম্য নয়, নাগর; তামা রূপো ব্রোঞ্জের ভারী গয়না নয়, খাঁটি সোনার অলংকার—তাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য। গ্রামের সহজ স্বাভাবিক সরল বুদ্ধি দিয়ে তাকে বোঝা যায় না; তাকে তারিফ করতে হলে চাই নাগরিক বুদ্ধি, পালিশকরা শিক্ষা, অনুশীলিত প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম রসবোধ। কথার ছবি ছিল সর্বজনীন, কাব্যিক অলংকার হল জনকয়েক মুষ্টিমেয়ের।

ঋগ্বেদে বিশ্বদেবের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ঋষি বললেন, তিনি হিরণ্য বর্ণ—তেজোহসি বীর্যমসি বলমসি। অর্থাৎ সূর্যের উপম তিনি। পরবর্তী কালে এই ব্রহ্মস্বরূপের ব্যাখ্যাতেই নানা মত ও পথ দেখা দিল। ঋগ্বেদ বলল, মরুৎরা সিংহ ইব নানদতি; আর হোমার বললেন, থেটিস 'Ox-eyed Queen'; আর কাব্য? তার মতে, 'যদেতৎ রূপং নবনবমুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ। পরবর্তী কালের পুরাণ এক হাজার একটি বিশেষণের মালা পরিয়ে দিল দেবতার গলায়। চসার আর একটু অগ্রসর হলেন—She was a girl of twenty summer's growth; কালিদাস জুড়ে দিলেন—'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। কিন্তু এখনেও মাটির গন্ধ ভেসে আসে। অভিজাত মননজাত বর্ণনা হল, মেঘদূতের 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী'। আর বাণভট্টের—'সর্বদেহে সে এক অপূর্ব বয়ঃসন্ধির লীলা। ক্ষীণপুণ্য শৈশব তাঁকে ছেড়ে দিতে চায় না অথচ আবেশভরা যৌবন অধিকার করতে চায় দেহ'। হোমারের হেরা 'Whitearmed Goddess' কিন্তু বাণভট্টের মহাশ্বেতা—'শুভ্রতার যেন একটি জীবন্ত মূর্তি। আকাশপথে থমকে যাওয়া যেন শরতের একখানি মেঘ। যেন শিবপূজার চৈত্যতরু ফুল।' এরই পাশে রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী—'যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড... চোখ বড়ো না হোক একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়'।

এইভাবেই লোকায়ত চিত্রলিপি ধীরে ধীরে উচ্চকোটির চিত্রালংকারে পরিণতি লাভ করে। বাঙলা কাব্যসাহিত্যেও এই বিবর্তন ইতিহাসসম্মত।

চর্যাপদে দেহকে তুলনা করা হয়েছে পঞ্চডালসমন্বিত তরুবরের সঙ্গে; নির্মোহ চিত্তকে বলা হয়েছে—'হাঁড়িত ভাত নাই নিতি আবেশি'; প্রিয়াকে—'মোরঙ্গিপীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী'; আর প্রেম? তার জন্যে 'অদয় বঙ্গাল ভইলি'। কৃষ্ণকীর্তনে রাধার রূপবর্ণনা ফুলের সঙ্গে মিলিয়ে; তার প্রেম পুরোপুরি রাখালিয়া। এরই পাশে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা—তাঁর 'থির বিজুরি কনক গোরি' রূপ আর অতীন্দ্রিয় প্রেমলীলা—অনেক ব্যবধান। বঙ্গজ ও সংস্কৃত, গ্রাম্য ও নাগর অলংকার-ভাবনার দ্বিবিধ রীতিই বাঙলাদেশে তখন প্রচলিত। একসময়ে দুয়ের মিলন হয়েছে। মুকুন্দরামের কালকেতু তার বিচিত্র উদাহরণ; সচিত্র দৃষ্টান্ত ভারতচন্দ্রের মালিনী—'এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।'

অর্থাৎ এখনও গ্রাম্যতার স্পর্শ থেকে গেছে এর মধ্যে। পলাশী-উত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যে নতুন করে অলংকার নির্মাণ সুরু হল। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন নয়। সংস্কৃত সিন্ধুক থেকে পাওয়া পুরাতনকেই ভেঙে নতুন করে গড়ে নেওয়া। এর মুলে অভিজ্ঞতার অভাব, প্রতিভার নয়। সে সুযোগ পেয়েছিলেন ইংরাজ কবি ডান। ইউরোপ তখন আবিষ্কার করে চলেছে—নবীন উপনিবেশ আর নব্য বিজ্ঞান। তার পট ও ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ডান বর্ণনা করেছিলেন:

> Let us possess one world each hath one, and is one,···
> Where can we finde two better hemispheres
> Without sharpe North, without declining West?

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র (একমাত্র কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব দৃশ্যটি ছাড়া) সনাতনী রূপায়নে প্রবৃত্ত। আর মধুসূদন আঁকলেন:

> আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী
> তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজ্বলি
> দশদিশ!—এ বর্ণনার ভাবনায় নতুনত্ব নেই, অভিনবত্ব ভঙ্গির মধ্যে।

এই সনাতন সংস্কার কাটিয়ে নবীনতা এল রবীন্দ্রনাথে, যাঁর অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন সাহিত্যশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে; তাঁর চিত্রকলা নিয়ে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে। সমগ্র বাংলা কাব্যের ধারায় এই প্রথম এক-জনকে পেলাম যাঁকে বলা যায়—'একা আমি দেখেছি তোমারে। তুমিই কেলোনি ছায়া ছায়ার মাঝারে'॥ সেই একটি ছায়া শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল

বিশ—তিরিশের বাংলা কাব্যে। পাশ্চাত্যের লরেন্স, এলিয়ট, পাউণ্ড, স্পেণ্ডারের কাব্যের চিত্রকলার সমতালে আমাদের কাব্যিক অলংকরণ তখন পদচরণারত।

সুধীন্দ্র দত্তের—স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রাত্রে মৃত মাধুরীর কণা;

জীবনানন্দ দাশের—পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

অজিত দত্তের—মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম,
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।

কিংবা দিনেশ দাশের—দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই! চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এমাটির কাস্তেটা বন্ধু!

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের—কান্নাকে শরীরে নিয়ে যারা রাত জাগে,
রাত্রির লেপের নিচে কান্নার শরীর নিয়ে করে যারা খেলা,
পৃথিবীর সেইসব যুবক যুবতী—

—আজকের বাংলা কাব্যচিত্রের অজস্রতার ভীড়ের মধ্যে দুটি একটি দৃষ্টান্ত। এই ছবি কথা দিয়ে আঁকা, আমাদের অপরিচিতও নয়। তবু বর্ণনা ভঙ্গির বিশেষত্বে বেশির ভাগই মুষ্টিমেয়ে সীমাবদ্ধ—সুন্দর তবু জটিল, জাতক-বিদের হাতে গড়া অভিজাত অলংকার। সেই ঘাসপাতা শিশির। তবু মন বলে, এতো মাঠের নয় বাটের নয় সহজাত লাবণ্যের নয়, যেন প্রসাধিত সৌন্দর্যের। সহজ রস যেন এর শরীরে নেই।

তবু, এও চিত্রকলা; এও থাকবে। শিক্ষার বিস্তার ঘটলে, যখন প্রজ্ঞারসে চিত্ত নবীন দৃষ্টি পাবে, তখন এরাও হবে সহজবোধ্য সাধারণের কাছে। আসবে আরও নতুন ও সূক্ষ্মতর অলংকার। কারণ মানুষের ছবি-আঁকা মন ও ছবি-দেখা মনের মৃত্যু হবেনা কোনদিন। সে জন্ম-আলংকারিক। আধুনিক কবির দাবী ছিল—'প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—কবিতা' তোমায় আজকে দিলেম ছুটি।' কিন্তু আগামী দিনের সেই কঠিন কঠোর গদ্যেও থাকবে ছবি। কথার ছবি। তখনও কবি বলবেন—'আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি', যেমন বলেছিল আদিতে। পার্থক্য এই, আদিম কাব্য চিত্রশালা, আধুনিক কাব্য চিত্র-প্রদর্শনী; একটি রেখাবাহন হাল্কা

চালের দল, অন্যটি ভাববাহন ভারী চালের স্রোত। প্রথমটি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা, দ্বিতীয়টি নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি। তূলির মুখের চিত্রশিল্প যেমন আদিম অবস্থা থেকে আজকের রিয়ালিজম, সার্‌রিয়ালিজম্‌ কিউবিজম্‌, ইম্‌প্রেসনিজম্‌-এ পরিণতি লাভ করেছে—তেমনি কলমের মুখের চিত্রকলা চিত্রলিপি থেকে ধ্বনিলিপি, তা থেকে অলংকার ও বর্তমানে প্রতীকে-সংকেতে উপনীত হয়েছে। আধুনিক রঙের ছবি উপলব্ধি করতে গেলে যেমন শিক্ষিত মনের দরকার, তেমনি দরকার সাম্প্রতিক কথার ছবির মর্মোদ্ধারেও। কারণ এখন আর সে শুধু বস্তুকথাকে প্রকাশ করে না, ভাব-কথাকেও করে, বচনের পাত্রে ভরে দেয় অনির্বাচনীয়কে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপরাজ্যের কলা গান। কবিতা উভ-চর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।'

ছোট গল্পের ভূমিকা

ছোট গল্প কথাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধ শাখা। এতে আছে গদ্যের ঋজুতা, ব্যঞ্জনার দীপ্তি, মনের বিরাট আকাশের একটি ছোট নক্ষত্রের ততোধিক ছোট্ট একটি আলোঝিকিমিকি কথা। তার আদ্যন্ত শাণিত তীর্যক অথচ মনকাড়ানিয়া বাচনভঙ্গি, 'পরিণতিতে নাটকীয় চমৎকৃতি। পড়ে বোধ হবে—'শেষ হয়েও হইল না শেষ।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাম্প্রতিককালে ছোটগল্পের আরও বিবর্তন হয়েছে; অলংকারশাস্ত্রের সংজ্ঞা ডিঙিয়ে নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার মিষ্টিমধুর রূপ ক্রমেই গাঢ়তর হয়ে উঠছে। কিন্তু এসব কথা আপাতত ভুলে গিয়ে শুধু যদি মনে রাখি, ছোটগল্প হবে ছোট কথা—মানুষের জীবনের ও মননের সাগরছেঁচা একটি নিটোল মুক্তো—তাহলে দেখা যাবে, সাহিত্যের ভ্রূণাবস্থায় কাব্যসংগীতের পাশাপাশি ছোট গল্পও একটি আসন দখল করে বসে আছে। বড়ো কথা, বিরাট আখ্যানের আবির্ভাব অনেক পরে, ঐসব ছোট ছোট কথাকাহিনীকে জোড়াতালি দিয়ে অথবা আদর্শের সোনালী সুতোয় গেঁথে গেঁথে।

সৃষ্টির সেই আদিম যুগে, যখন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসা পৃথিবীর বুকে ফুটল উদ্ভিদ, জাগল প্রাণী, এল মানুষ, তখন জীবনসংগ্রামই ছিল একমেব সাধ্য ও সাধন, উপলক্ষ ও লক্ষ্য। চারপাশের প্রতিকূল ও হিংস্র প্রকৃতির মাঝ দিয়ে বন্ধুর পথে শুরু হয়েছিল বন্ধুবিহীন একক পদক্ষেপ। সবকিছুই তখন অজানা ও নামনাজানা। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভীতি ও প্রীতি, পরিবেশ ও নিজের সম্বন্ধে বিস্ময় ও কৌতূহল, আর প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত-কর অবস্থা আদিম মানুষকে ক্রমে ক্রমে ঝাঁক বাঁধতে শেখাল, সমাজ সম্পর্কে মোটামুটি এক ধরণের নিয়মকানুন অনুসরণে বাধ্য করল, প্রেরণা দিল যাদুবিদ্যাশ্রয়ী কতকগুলি বিচিত্র ও সচিত্র অনুষ্ঠানের প্রযোজনায়। মাঠে ফসল চাই, গাছে ফল চাই, বনে পশু চাই, ঘরে শিশু চাই—এই আদিম ও অস্তি[illegible]। চা[illegible] [illegible]গিদ[illegible] শু[illegible] হল পাওয়ার আরাধনা তথা শিল্পের

সাধনা—নাচগান অভিনয়ের মাধ্যমে। সহজ ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মানবিক আকাংক্ষায় আদি মানুষের দল ছবি আঁকল, কবিতা গাঁথল, গান বাঁধল, নাচ আনল; তৈরী করল কথা অর্থাৎ গল্প। অবসর-বিনোদন নয়, কল্পনার রঙীন তুলি বুলিয়ে আত্মলীলা নয়, বিশুদ্ধ আনন্দবিধান বা সৌন্দর্যবোধনাও নয়—কুলিশ কঠিন কঠোর জীবনসংগ্রাম সে আর্টের উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক মানুষের মনে গল্প এসেছে অজানা প্রকৃতির ক্রোধকে জয় করতে, অজানা দুনিয়ার রহস্য ভেদ করতে, অমিত্র পরিবেশকে করায়ত্ত করতে, বুঝতে চিনতে শান্ত করতে। মানুষের নিজের অজ্ঞাতসারে তাতে বেজে উঠছে গান, স্বরিত হয়েছে কাব্য, ফুটে উঠেছে ছবি, অনুশীলিত হয়েছে কল্পনাবৃত্তি। তারপর—তার অনেকদিন পরে দেহ পেয়েছে অবসর, মনে জেগেছে ভাব, মানুষ শুনেছে গল্প গল্পেরই জন্যে—মাঠের বা ঘরের ফসল ফলানোর যাদুবিদ্যাস্বরূপে নয়। আর আরব্য রজনীর শাহাজাদীর স্বামীর মত সাগ্রহে শুধিয়েছে—'তারপর'?

ইতিহাসের সেই প্রথম পাতার যুগে, পৃথিবীর অকৃপণ বাসরে নবীন আগন্তুক মানুষের জৈবিক সমস্যা ছিল সৃষ্টির—কর্ষণ ও প্রজননের সমৃদ্ধির। শস্য-শিশু-পশুর সংখ্যাগত ও গুণগত শ্রীবৃদ্ধির অনন্যনিরপেক্ষ বাসনা ছিল তার চিত্তের স্থায়ী রস। তাই প্রথম মানুষের প্রথম গল্প—সৃষ্টিপালা:

॥ একদা এক সুন্দর প্রভাতে প্রথম পুরুষ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন জলের ওপর। দেখলেন, কোথাও কেউ নেই, সংগীবিহীন শব্দবিহীন বিরাট শূন্য। দোসরের জন্যে হাহাকার জাগল চিত্তে। হুংকার দিয়ে উঠলেন তিনি: তা থেকে জাত হল তাঁর বাহন এক পাখী। তার পিঠে চড়ে প্রভু সারা দুনিয়া ঘুরলেন। কোথাও পেলেন না বসবার মত একমুঠো ঠাঁই। তখন মনস্থ করলেন জলের অতল তল থেকে মাটির পৃথিবীকে তুলে আনার। ডাক দিলেন কচ্ছপকে কাঁকড়াকে কেঁচোকে। একক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল; একত্রিকা প্রয়াসে ও প্রভুর ইচ্ছায় পৃথিবী উঠল জলের ওপর। প্রভু একটি পদ্মপাতা ফেলে দিলেন; পৃথিবীকে তার ওপর থিতু করে কপালের ঘাম মুছল কচ্ছপ কাঁকড়া কেঁচো ইত্যাদি। পদ্মাসনা পৃথিবীর ওপর পদ্মাসনে ধ্যানে বসলেন আদিদেবতা। তাঁর দেহ থেকে জন্ম নিলেন আদিদেবী প্রভুনী। আলাপ-আকাংক্ষা-আশ্লেষ। উভয়ের মিলনে সৃষ্টি হল তিন দুনিয়া আর যা-কিছু সব। প্রভু ধুলোমাটির সঙ্গে জল মিশিয়ে তৈরী করলেন দুটি মানব—আদিম নর ও আদিম নারী

তারা ঘর করতে জানে না, ফসল ফলাতে জানেনা, ঝগড়া করতে জানে না। দেব্‌তা দিলেন তাদের দু হাঁড়ি হাঁড়িয়া, একটু নির্জনতা, একটি রাত্রি। পানান্তে চোখ বুজে এল দুজনের, মাঝে একটি কাঠের গুঁড়ির সীমান্ত। ভোর হল, চোখ মেলল প্রথম নরনারী . দেখল, কাঠের গুঁড়িটি বহুদূরে একপাশে লজ্জানত ; দেখল, সেই গতকালের পৃথিবী আজ সাজ বদলে সদ্যফোটা ফুল। প্রভু তদন্তে এসে খুশি হয়ে দুজনকে দিলেন বীজধান, গম-তুলোর বীজ, কামনা করলেন অনাগত নবজাতকের দীর্ঘ পরমায়ু। প্রথম মানবমানবী ঘর বাঁধল, চাষ করল, সংসার পাতল ; রইল দুজনে মিলে বহুবচনের অপেক্ষায়॥

ফুটে উঠল একটি ছোট গল্পের রূপ ও রেখা। তার মানচিত্র নিশ্চয়ই নিখুঁত নয় কিন্তু মানসচিত্র সীমানা-সমন্বিত্। দেখা ও শোনার জগৎ কথা কয়ে উঠল ; হল কাহিনী। মিশরের প্যাপিরাসে বাইবেলে কোরানে বেদে আদিম উপকথায় এই জাতীয় আখ্যানের ইতরবিশেষ রূপায়ণ দেখা দিল। প্রাথমিক কথাচিত্র এগুলি।

কিন্তু শুধু সৃষ্টিপালা নয়। সমগ্র গোষ্ঠীর জীবনকাহিনীর এক আধটি অধ্যায় নিয়েও গল্পরচনা হয়েছে : সেকালের মানুষ দেবতার স্তবপাঠ করেছে' প্রমথ-প্রমথিনীর সম্পর্কে কথামালা রচনা করেছে ; তার মধ্যে দিয়ে ভাষারূপ পেয়েছে সমাজজীবনের আলোআঁধি। বিভিন্ন দেশের প্রাগৈতিহাসিক উপকথায় দেব ও মানব পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। বাইবেলের আবেল ও কেইনের কাহিনী, মিশরের গিলগেমিসের রূপকথা, গ্রীসরোমের উপআখ্যান, আমাদের যম-নচিকেতা ইত্যাদি কাহিনী উল্লেখ্য।

সংসারজীবন থেকেও সেকালীন গল্পের উপাদান এরকম আহৃত হয়েছে। মিশরের প্যাপিরাসের ওপর অনুলিখিত বহু কাহিনী ঘরের কথা। তার একটি গল্পে আমাদের বেহুলা-লখিন্দরের লৌহবাসররাত্রির কথার সঙ্গে হুবহু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাইবেল তো কথামালা, অন্যান্য প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রও। বেদের পুরুরবা-উর্বশী, উপনিষদের শ্বেতকেতু-উদ্দালক কাহিনী এক একটি ছোট গল্প। ঘরোয়া পরিবেশে ছোট ছোট জোনাকীর দীপ্ত সমারোহ।

মানুষের জীবন আদিম কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্রমেই সরে আসতে থাকে। উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় ও হাতয়ার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমাজের মানসের বাসাবদল হতে থাকে ; পালাবদল হয় সংস্কৃতির। ছোটগল্পের আসর বড়ো হয়, ভিড় বাড়ে। কথাসরিৎসাগর হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র আরব্য

রজনী, টেল্‌স, সাগা। ঈশপ্‌স্‌ ফেব্‌ল্‌স্‌-এর মত এখানেও গল্পগুলি ছোট ছোট কিন্তু তাদের পরস্পর যুক্ত করার বড়ো করার একটি মনোভাব দেখা দিয়েছে। কাহিনীগুলি হয় চীনা বাক্‌স, নয় ফুলের মালা। একটি গল্পের মধ্যে আরেকটি গল্প অথবা একটি গল্পঅন্তে আর একটি। এইভাবে গ্রন্থনে গ্রন্থের আয়তন বাড়ে, কিন্তু সবমিলে একটি বড়ো গল্প বা উপন্যাস হয়ে ওঠে না, স্বতন্ত্র এক একটি ছোট গল্পই থেকে যায়। কথাসরিৎসাগরে গল্প গাঁথা হয়েছে গল্পের খাতিরে; বিষ্ণুশর্মার কাহিনীর উদ্দেশ্য শিক্ষাদান; শাহজাদীর লক্ষ্য ঔৎসুক্য জাগানো। সকলের শেষে আছে শ্রোতার সেই চিরন্তন প্রশ্নচিহ্নটি: শাহজাদী থামেন, বাদশাহ বলেন, 'তারপর?' বিষ্ণুশর্মার কথকতার বিরতি, রাজপুত্রদের সমস্বর জিজ্ঞাসা, 'কথমেতৎ?' আগ্রহ জাগিয়ে রাখার এই মনোহারী ও আকর্ষণী শক্তি আছে বলেই এগুলি গল্প—ছোটগল্প। সেকালে এই আগ্রহকে নেভাতে আর একটি গল্প ফাঁদা হত, এ কালে ঐ আগ্রহের জিজ্ঞাসু দীপটুকু জ্বালিয়ে দেওয়াই গল্পকারের মুখ্য কর্তব্য।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির কাঁধে ভর করে সমাজ এগিয়ে চলে আরও সামনে। উন্নততর উৎপাদন-কৌশল ও সম্বন্ধ এনে দেয় ঐশ্বর্য ও অবকাশ। সাহিত্যশিল্প হয় মেদবহুলা। কিন্তু গল্পের মধ্যে গল্প বলার রেওয়াজ লোপ পায় না (লেখন-দক্ষতায় জোড়াতালি অনেক সময়ে চোখে পড়ে না)। বৌদ্ধ জাতক, মেটামরফসিস্‌, দেকামেরন, কাদম্বরী, দশকুমার চরিত ইত্যাদি এবং সুন্দরতম নিদর্শনরূপ রামায়ণ মহাভারত ইলিআদ ওদিসি।

আমাদের সুবিপুল পুরাণ-সমুদ্রে ছোটগল্পের অজস্র দ্বীপপুঞ্জ। ধর্মতত্ত্বের পাশে নানাকথার সমাবেশ এতে—সৃষ্টিপালা, দেবমাহাত্ম্য, মানবজীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ। কথারসের প্রাণকাড়ানো শক্তি এদের ততটা নেই, যতটা আছে অধ্যাত্মসাধনার সুস্পষ্ট ইসারা। আখ্যানগুলি বিচ্ছিন্ন বিচিত্র অসমঞ্জস অসংলগ্ন, অসংস্কৃতও অনেকক্ষেত্রে। পুরাণকথায় মহাকাব্যের বিস্তৃতি নেই, উপনিষদের হিরকসৌন্দর্য নেই, রূপক কাহিনীর চমৎকারিত্ব নেই। পঠন-পাঠনে ভক্তি হয়ত জাগায়, রসাপ্লুত করে না। তবু সাগ্রহ করে তোলার পক্ষে মনোহারী ও কৌতূহলপ্রদ। যথা:

বৃকাসুর নামে এক দৈত্য অলৌকিক ক্ষমতালাভের বাসনায় দুশ্চর তপস্যায় রত হল। বহু বছরের কঠোর আরাধনার পর তুষ্ট শিব দেখা দিলেন—বৃকাসুর! বর প্রার্থনা কর। বৃকাসুর করজোড়—দেবাদিদেব! আমাকে

বর দিন, আমি যার মাথায় হাত দেব সে সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যাবে। তথাস্তু—বলে শিব সচল হন। বৃক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে—প্রভু একটু দাঁড়ান। কেন? ফিরে আসেন শিব। বাঃ! আপনি যে বর দিলেন, তা ঠিক কিনা যাচাই করে দেখতে হবে তো! চমকে ওঠেন শিব—কি বলছ বৃক? আমার দেওয়া বর……?—আপনার ওপর দিয়েই পরীক্ষা করব আগে; ধারে কাছে তো কেউ নেই—চতুর হাসি বৃকের। এঁ্যা—দ্রুত স্থান ত্যাগ করে ছুটতে থাকেন শিব। পেছনে বৃকাসুর চলে তাড়া করে। মর্ত পাতাল স্বর্গ—কোথাও রেহাই নেই, থামা নেই, আশ্রয় নেই। অবশেষে বিষ্ণু এগিয়ে এলেন—ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি। শিবকে ঘরে রেখে তিনি ছদ্মবেশে এসে দাঁড়ালেন পথের ওপর। ক্ষণপরেই বৃক এসে পড়ে হুস্‌হুস্‌ করতে করতে। বিষ্ণু তাকে থামান—কি ব্যাপার, এমন ছুটোছুটি কেন? বৃক বলে ক্লান্তকণ্ঠে—শিব আমাকে বর দিয়েছেন, যার মাথায় হাত দেব সে তখুনি ভস্ম হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যি কিনা পরীক্ষা করার লোক চাইতো! তাই তাঁকে খুঁজছি ত্রিভুবনে। অথচ তিনি—কিন্তু শিব কেন?—হাতের কাছে তিনি ছাড়া আর কে আছেন?—কেন, তুমি নিজেই তো রয়েছে—বিন্দুমাত্র ভাববার অবসর না দিয়ে বিষ্ণু বলে যান—এভাবে কষ্ট না করে তুমি নিজের মাথায় হাত দিয়েই তো দেখতে পারো বর সত্যি কি না!—ঠিক, ঠিক! আনন্দে লাফিয়ে ওঠে বৃকাসুর, এবং একটুও না ভেবেচিন্তে চট্‌ করে হাতটা তুলে দেয় নিজের মাথায়। ঝিলিক্‌ দিয়ে ওঠে লালনীল আগুন, কালো-কালো ধোঁয়া, পলে পলকে শুধু ছাই॥

ইতিহাসদর্শনের আলোকবিন্দুকে বাংলাদেশের সাহিত্যের ভূমিতে সরিয়ে আনলে দেখি, এখানেও ঘুরেফিরে একই লীলা। এখানকার ছোটগল্প যখন আদিম শৈশবের গণ্ডী পার হল, তখন দৈবকথাগুলি মোটামুটি সংহত রূপ লাভ করেছে। প্রথমে লোকমুখে, তারপর দেবকথায়, শেষে পাঁচালীর আসরে আখ্যানগুলি প্রসারিত হয়েছে।

॥ আদিদেব নিরঞ্জন। আদ্যাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে। তিনজনেই অন্ধ, রত হলেন নিভৃত তপস্যায়। পুত্রদের পরীক্ষা করতে নিরঞ্জন শবদেহরূপে ভেসে গেলেন তাঁদের কাছে। বিষ্ণু চোখ-কাননাক বন্ধ করে উঠে গেলেন, ব্রহ্মা মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চতুর্মুখ হলেন, একমাত্র শিব চিনতে পারলেন আদিপিতাকে। সেই শবদেহ কাঁধে নিয়ে তিনি নাচতে লাগলেন। নিরঞ্জন আত্মপ্রকাশ করলেন, খুশি হয়ে শিবকে দিলেন

দৃষ্টিশক্তি। শিব অন্য দুই ভাইয়ের দৃষ্টিশক্তি প্রার্থনা করলেন। নিরঞ্জন শিবের সঙ্গে বিবাহ দিলেন আদ্যাদেবীর, নিজে করলেন দেহত্যাগ। ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ পেরিয়ে শিব-শিবানী মনের সুখে ঘর পাতলেন। উছলে উঠল সুখসৌভাগ্য আশাআনন্দ। একজন ভিক্ষা করে আনেন, আরজন তাই দিয়ে সংসার চালান। পেট হয়ত ভরে না, কিন্তু মন ভরে থাকে দুজনের। আলো জ্বলে উঠে গৃহে ও হৃদয়ে। তারপর একদিন—কিন্তু সে আর এক কাহিনী॥

এই পাঁচালীকথার কাছে কাছে পাই ব্রতকথাকে, যার এক-একটি আখ্যান এক-একটি ছোট গল্প, যার প্রতিটি গল্পে জীবনের আকস্মিক উত্থানপতন। শুনতে শুনতে মনের ভাবগুলি বিচলিত বিলোলিত হয়ে ওঠে। এখানে স্বর্গমর্ত এপাড়া-ওপাড়া, দেবতা ও মানুষ প্রতিবেশী আত্মীয়, বামুন বামনি সশরীরে স্বর্গে যান রথে চেপে জনতার প্রণাম নিতে নিতে। শান্তিরসে গল্পের ইতি, প্রশ্নচিহ্নে নয়। তা হোক, তবু এর মধ্যে আছে আকস্মিকের বিস্ময়বোধ, কথারসের মনোময় সুন্দরতা।

রূপকথা ছোট গল্পের রূপময় কথা। স্বর্গ ও দেবদেবীর ভূমিকা এখানে অপ্রধান, ধর্মসাধনা এর অ-সাধ্য। এ হল অলৌকিকের দেশ, অসম্ভবের জগৎ, অবাস্তবের ঠাস বুনুনি। তবু প্রাগাধুনিক ছোট গল্পের সবার সেরা এই রূপকথা, ফেয়ারী টেল্‌স্‌। বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিবাদী মন এর সিংহদ্বারে সামনে এসে প্রশ্নমুখর অবিশ্বাসের ডানা স্বেচ্ছায় গুটিয়ে ফেলে, লোকঅলোকের সীমারেখা ভুলে যায়, মেনে নেয় ক্ষণিকের মানসিক স্বপ্নাভিসারকে। মন উড়ে চলে রাজপুত্তুর কোটাল-পুত্তুরের সঙ্গে সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে ব্যাংগমাব্যাংগমীর দেশে, সেখান থেকে নামনাজানা দূর দিগন্তের রাক্ষসদ্বীপের উদ্দেশ্যে! পথে বাজে ডঙ্কা, শংকা শিহরায় মনে। চকিতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে রাজকন্যা, মাঝপথ থেকে ত্বরিতে ফিরে আসে দৈত্যের দল, রাজপুত্র খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নেয়। একটি নিঃসঙ্গ ভোমরার মধ্যে সাতশো রাক্ষসের প্রাণ ভয়ে শিউরে ওঠে! যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধ শেষ হয়। উথালপাথাল করে সচকিত শ্রোতার হৃদয়সরোবরের ঢেউ। রাজপুত্র উদ্ধার করে আনে ঘুমন্তপুরীর ঘুমন্ত পরীকে, কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘ-বরণ চুল। গল্পে দাঁড়ি পড়ে সুখরসে, কিন্তু শ্রোতার মনে নয়। সে তখনও চলেছে নতুনতর অভিযানের অভিসারে শংখমালা মধুমালতী কি কংকাবতীর দেশে। যেমন চলে আজও—রবীন্দ্রনাথ কিংবা মোপাসাঁ কি মম অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পের পাঠশেষে।

একদা সাহিত্যের একমাত্র রথ যখন ছিল শুধুই পদ্য, তখন তার যাত্রী ছিল ছোটখাট কবিতা আর বড় বড় আখ্যানকাব্য। আধুনিক কালে সাহিত্যের অন্যতম বাহন যখন গদ্য, তখন তার সওয়ার ছোট-মেজ গল্প আর বড় সড় উপন্যাস। সে যুগের ছোট কবিতায় যেমন ছোট গল্পের ইসারাও ছিল, তেমনি উপন্যাসের সাড়া ছিল আখ্যানকাব্যে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

তখন খণ্ডকাব্য-আখ্যানকাব্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আয়তন বেঁধে দেওয়া হত। তার কম্‌তি-বাড়্‌তি যে না-হত তা নয়—কিন্তু সে প্রতিভাবানের সৃষ্টি না হলে স্বীকৃতি পেতনা। এখন গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও পরিধি-পরিমাপের আয়োজন আছে। কিন্তু তাকে মেনে না চললেও সাধারণ পাঠকের ও অসাধারণ পণ্ডিতের বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় না—অবশ্য, রচনাটি রসোত্তীর্ণ হলে তবেই। তখন মানুষের ও সমাজের সকল দিকেই ছিল আঁটাআঁটি বাঁধন, ব্যক্তির চিন্তা-ধার্মিকতা-প্রকাশভংগি শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ ধরেই সাধারণত এগিয়ে চলত; সে পথ থেকে সরে-আসা ছিল বিস্ময়কর। এখন মানুষের ও সমাজের সকল দিকেই আল্‌গা শিথিলতা, ব্যক্তির ভাবনা ও প্রকাশ একান্ত তাঁরই, গতানুগতিক বাঁধা পথে চলাটাই বিস্ময়জনক। কোন শাস্ত্রীয় বা আলংকারিক নির্দেশ তাঁর নীতি-নিয়ামক নয়; তাঁর বিধাতা সৃষ্টি প্রতিভা ও পরিবেশ। প্রাগাধুনিক কাব্য জীবন-বিরহী না হলেও তার সঙ্গে তেমন নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ ছিল না; পশ্চাতে ছিল একটি আদর্শের বিদ্যুৎ-বোতাম। আধুনিক সাহিত্য অধিকতর বাস্তব-ঘেঁষা; যেখানে সে কল্পনা-বিলাসী, সেখানে সেই কল্পনারও স্ফূর্তি বস্তুজগতের সঙ্গে নিয়ত দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে। ছন্দের দিক থেকে দেখি, সে পদ্যেও আছে, গদ্যেও আছে। কিন্তু পদ্যের ছন্দ নিয়মিত, অনিয়মই গদ্যছন্দের প্রাণ; পদ্যছন্দে বিচিত্রের ঐক্য, গদ্যছন্দে অনৈক্যের বৈচিত্র্য। কথাসাহিত্যের বাহন এই গদ্য—কোন প্যাটার্ন ফর্মুলার হিসেবী জোড়মেলানো চলন নয়, বেহিসেবী বেপরোয়া অছন্দে তার চলা। এই গদ্যের আশ্রয় না পেলে আমাদের সব কথা আজও আখ্যানকাব্যে বন্দী হয়ে থাকত, উপন্যাসের মুক্ত প্রান্তরে অবাধ বিচরণের ও বিকাশের সুযোগ পেত না। কথাসাহিত্য জীবনের নিকটতম প্রতিবেশী, স্বচ্ছতম প্রতিচ্ছবি। কারণ ওপর থেকে ধর্ম-অর্থ-কাম-এর মোক্ষপ্রদ নিয়ন্ত্রণ যতই থাকুক না কেন, জীবন সে তো মহাকালের মতই নিরবধি ও মুক্তধারা। তার হিসেবের খাতায় অডিট চলে না, চললেও পাকা হিসেব মেলে না। এই জীবন ও উপন্যাস—দুইই দেশকালপাত্রের সীমিত মাপকাঠির অধরা; তাই

জীবনের সবচেয়ে সত্য আর দামী দান উপন্যাস। মধ্যযুগের গণ্ডীঘেরা জীবন ও মনন থেকে যখন আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে মানুষ, বলতে পেরেছে—

আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত—
কঠিন মাটির পরে
প্রতি পদক্ষেপে যাব
আপনারে জয় করে চলা (রাত্রি : নবজাতক)

—তখনই সে আখ্যানকাব্যের মাপা জাখা পাত্রটি সরিয়ে রেখে জীবনের বিষামৃত পান করতে সুরু করেছে উপন্যাসের নানা মাপের আধারে। বন্ধন-মোচনই আধুনিকতা। কাব্যসাহিত্য বন্ধনযুক্ত, কথাসাহিত্য বন্ধনমুক্ত। যেন, নীড় ও আকাশ। নীড়ের রূপ আছে সীমা আছে, আকাশ অসীম অপরূপ। দুই নয়, তিন নয়, তার তত্ত্ব চার ডাইমেন্‌সনের।

আকাশের অসীমতা রোমান্সেরও। আখ্যানকাব্য থেকে উপন্যাসে আসবার পথে তার ঠিকানা। ইতিহাস-বাস্তব-কল্পনা, এর যে কোন একটি কি দুটি কিংবা তিনেরই কাঁধে চেপে যে মানসাভিসার—তাইই রোমান্সের জগৎ। স্কট দুমা হুগোর রোমান্স একজাতীয় নয়, বঙ্কিমের রমন্যাস ভিন্নজাতের। কিন্তু সবগুলির আবেদন ও স্বাদ প্রায় এক। ভুলেযাওয়া অতীত বা মনগড়া ভবিষ্যতের কুহেলিকায় কাহিনী এর ছায়াছায়া। গতি তীব্র ও দ্রুত, রূপ অবাস্তবের রঙ-মাখানো। চরিত্রগুলিও রক্তমাংসের ভালোমন্দয় সজীব মানুষ নয়, কল্পনাদর্শের বাটালি দিয়ে খোদাই করা পাথর-প্রতিমা। তাদের ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বুকের মধ্যে জড়িয়েও ধরা যায়; কিন্তু মেলেনা দেহের উত্তাপ, হৃদয়ের উত্তেজনা। তাদের মধ্যে দু-একজন যে আমাদের প্রতিবেশী নয় তা অবশ্য বলা চলেনা; অধিকাংশই দূরের মানুষ। সেখানে অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ বা রহস্যময় পরিবেশ, সেখানে বাস্তবের প্রবেশ নিষেধ, যুক্তি ফেরারী আসামী, মাটিঘেঁষা জীবনতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিদেশী নাগরিক। তাই জীবনদর্শনের উপস্থিতি সত্ত্বেও রোমান্স উপন্যাস নয়। তবু একের মধ্যে আরের প্রভাব অসম্ভব নয়, অপ্রাপ্যও নয়। যেমন বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে রোমান্সের আলোআলো ছায়া, তেমনি বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী কিংবা অমিয় মজুমদারের রোমান্সে উপন্যাসের ছায়াছায়া আলো।

উপন্যাস জীবনের ছবি কিন্তু কেবলি ছবি শুধু পটে লেখা নয়। তাই সে স্কেচ নক্‌সা বা জীবনচিত্র মাত্র নয়। জীবন যেখানে শুধুই ছবি, সেখানে

কল্পনার অনবকাশ, দৃষ্টি নিরাসক্ত, লক্ষ্য তথ্যনিষ্ঠা, ভংগি সাংবাদিকতা, a running commentary of life, উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর; কিন্তু উপন্যাসের মতই'। যেমন, 'শহর কলকাতার আদি পর্ব'। অনেক সময় রচনার গুণে জীবনী বা আত্মজীবনীকে কথাসাহিত্যের আত্মীয় বলে মনে হয়, বিশেষত আত্মজীবনীর ধাঁচে লেখা উপন্যাসের। কিন্তু শেষেরটিতে যেখানে বহুর জীবনই আসল খেয়া, অন্য দুটিতে তখন একের কথাই মূল ধুয়া। প্রসঙ্গত অপরের ছবিও তাতে আঁকা হয়, তাতে রঙের সঙ্গে থাকে প্রাণেরও স্পন্দন। কিন্তু কল্পনার সেই যাদুস্পর্শ থাকেনা, যার ফলে ক্ষণকাল সর্বকালের হয়ে ওঠে। সে সুন্দর হতে পারে কিন্তু তথ্যভাবে মেদবহুলা, তথ্য-অতিক্রান্ত সত্যের যোগে লাবণ্যময়ী নয় (লিটন ষ্ট্র্যাচী ও আঁদ্রে মরোয়ার রচনা স্মরণীয়)। তেমান শ্রীকান্ত, আরণ্যক কিংবা ডিকেন্সের উপন্যাস অটোবায়োগ্রাফিক্যাল কিন্তু অটোবায়োগ্রাফি নয়। লেখক সেখানে 'আমি'-রূপে সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হলেও ইতিবৃত্তের ভারবাহী নন।

এ্যালারডাইস নিকল সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও ভাবান্তর ঘটে বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু নাটকের নয়, সব সাহিত্যেরই সামাজিক বাসাবদলে পালাবদল হয়—গদ্যসাহিত্যেরও, সেকথা আগেই বলেছি। কাজামিআঁ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম-উত্থান-বিবর্তনের-বৈচিত্র্যের সঙ্গে উপন্যাসের নাড়ীর যোগ লক্ষ্য করেছেন। আধুনিক সমাজে মধ্যবিত্তের ভূমিকা অপ্রধান নয়; তাই উপন্যাস এত জনপ্রিয়। আর তার সেই ভূমিকা ভূমিলগ্ন। তাই যুক্তিনিষ্ঠ তর্কনিষ্ঠ তথ্যনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার দিকেই উপন্যাসের প্রবল ঝোঁক। জীবনের 'ছায়ের অনুগত' বলে এর প্রকাশভংগির নির্দিষ্ট দিগ্‌বলয় নেই, বাঁধাধরা পদ্ধতি অচলিত, সুর বাঁধা দরদ ও সত্যবাদে। যেহেতু Life is not big lamps symmetrically arranged (ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌) সেই জন্যে উপন্যাসও পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী সুবিন্যস্ত হতে পারে না। সে জীবনের বিশ্বস্ত অনুচর, ঔপন্যাসিকের মনন ও আদর্শের অনুগামী। উপন্যাসের রীতি-প্রকৃতি তাই সর্বজনীন নয়; একটি বা দুটি বিশেষ প্যাটার্ণ দিয়ে তার আদল বোঝা ও বোঝান সম্ভবপর নয়।

তবু উপন্যাসের ভেতর-বাইরের চৌহদ্দী পরিমাপের চেষ্টার অন্ত নেই। কারণ, সৃষ্টি করেই মানুষের তৃপ্তি নেই; সে জানতে চায় তার সৃষ্টির স্বরূপ—কিমিদম্? তাই উপন্যাস যেমন লেখা হচ্ছে, তেমনি গড়ে উঠতে চাইছে তার সমালোচনা তথা অলংকারশাস্ত্র।

সমালোচক উপন্যাসের মধ্যে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করেছেন। প্রথম, আখ্যানমূলক উপন্যাস। এরও আবার দুটি ভাগ। প্রথমটিতে, শুধুই ঘটনার মালা, ঘটনার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও তারই মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখায় জীবনের গতি-প্রগতি। দ্বিতীয়টিতে, একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের চারদিকে ঘটনার জালবোনা, ঘটনার বৃত্তগতি। আগেরটির মত এর প্রসারতা নেই কিন্তু গভীরতা আছে, দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ ও বেধ আছে। এবং উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি প্রায়শ অ-চল, দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের অভাবে তারা ফ্ল্যাট, একরৈখিক ও একবৃত্তিক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসই সংখ্যাগরিষ্ঠ—নাটকীয়তামূলক উপন্যাস। এর অগ্রগতি কাহিনী ও চরিত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে। ফলে গল্প যেমন জটিল হয়, চরিত্রগুলিও হয় রাউণ্ড্, বহুরৈখিক ও বহুবৃত্তিক; প্রসারতা ও গভীরতা, বক্রগতি ও বৃত্তগতি দুইই থাকে এতে। কখনও চলে সময়ের কাঁটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে, কখনও স্থান থেকে স্থানান্তরে, অথবা দুইই।

তৃতীয় শ্রেণীকে সমালোচক বলেছেন 'ক্রনিক্‌ল্', বাংলায় এখন যাকে বলা হচ্ছে, 'এপিক উপন্যাস'। এখনকার উপন্যাসের ঝোঁক এই মহাকাব্যোচিত গুণাবলীর দিকে—This chronicle is the ruling convention of the Novel at present (ই, মুইর । এর পটভূমিকা বিরাট, এর রূপ স্থানকালের বন্ধনমুক্ত সর্বজনীন, এর ছবি একটা গোটা সমাজের। ব্যক্তি নয়, পরিবার নয়, সমগ্র সমাজের প্রতিচ্ছবি—অন্তত, বিশেষ এক অঞ্চলের বহু মানুষের বা বিশেষ এক শ্রেণীর সব মানুষের জীবনচিত্র। এপিক উপন্যাসের নায়ক সমাজ, মুখরতা সম্মিলিত পদধ্বনিতে। যেমন, টলস্টয়ের ওঅর অ্যাণ্ড পীস, ডস্টএভস্কির ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট, শোলোকভের ভার্জিন সয়েল, অ্যাণ্ড কোয়াএট ফ্লোজ দি ডন, গোর্কির মা, রোলাঁর জ্যাঁ ক্রিস্তফ্, রবীন্দ্রনাথের গোরা; তারাশংকরের উপন্যাস (বিশেষত হাঁসুলি বাঁকের উপকথা), পথের পাঁচালী, আরণ্যক, উপনিবেশ, গড় শ্রীখণ্ড। শ্রীকান্তের বিরাট পটে বহু মানুষের আনাগোনা হলেও শেষ পর্যন্ত তা দুজনেরই মন দেওয়া নেওয়ার পালাগীতি। জঙ্গমেও অনেক মানুষ; কিন্তু স্থৈর্য ও ঐক্যের অভাবে ছবিগুলি বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ।

এ ছাড়া আরও দুই জাতীয় উপন্যাসের কথা বলা হয়েছে—Fantasy ও Prophecy। প্রথমটিতে রূপকরচনার আদল, পুরাতন কাঠামোয় নতুন দেহ। যেমন জেম্‌স্ জএসের ইউলিসিস। দ্বিতীয়ের দলে পড়ে দি ব্রাদার্স কারামাজোভ,

যেখানে মহৎ মনের মহৎ বেদনার প্রকাশ। ফ্যান্টাসীর রূপক উপন্যাস রূপে স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভক্তি অবশ্যমাননীয় কিন্তু প্রফেসীর স্বীকৃতি অতি-বিভাজন। কারণ সব মহৎ উপন্যাসেই তো মহৎ মনের বেদনা থাকে, তার রূপ যাই হোক না কেন। বিশেষত 'ক্রনিক্‌ল্' এর পর 'প্রফেসী' অতিরিক্ত। নাম-রূপের ভেদে প্রতিমা বিভিন্ন, কিন্তু কাঠামো সকলের এক। উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, গোত্র অভিন্ন। কাহিনী চরিত্র ভাষা রস ইত্যাদির প্রযোজনা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে স্বকীয়।

প্লট উপন্যাসের কংকাল। বাস্তবভিত্তিক কার্যকারণসহ ঘটনার অগ্রগতিতে The novel tells a story (ই. এম. ফর্সটার); তার ওপর গড়ে উঠে রূপ রস ভাব ভাবনা। আখ্যানের উন্মোচন নানাভাবে হতে পারে। কোথাও ঔপন্যাসিক নিজেকে নায়ক বা দ্রষ্টারূপে খাড়া করেন; কোথাও অন্য কারও বিবৃতির মাধ্যম-সহায়তা গ্রহণ করেন; কোথাওবা ঘটনা-চরিত্রের পারস্পরিক সংঘাতে সে আপনিই এগিয়ে চলে। কারও কাহিনী খুব সরল, একটি রেখারই বিচিত্রগতি; কারও বা বহুরেখার সমবায়ে উপ-আখ্যানের সহযোগে বিচিত্র-জটিল। রক্তমাংসের মানুষ সাহিত্যের জগতে এসে অন্য মানুষ হয়ে দাঁড়ায়, 'হোমো সাপিয়েন' হয় 'হোমো ফিক্‌টাস্'। চেষ্টারটনের ধারণা ছিল ঔপন্যাসিক চরিত্র এক একটি 'টাইপ', স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এখন টাইপ ছেড়ে চরিত্রগুলি হচ্ছে 'ক্লাস', এক একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি-প্রতীক—মানুষকেই সে রূপ দেয়, তার সুখদুঃখ আশাবাসনাকে। র‍্যাল্‌ফ্ ফক্সের ভাষায়: The Novel deals with the individual; it is the epic of the struggle of the individual against society ,against nature ইত্যাদি। চরিত্র ফুটে ওঠে বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এগিয়ে চলে কাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পথে, ধীরে ধীরে বিকাশ পায় তার নানা বৃত্তি, পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতের মুহূর্ত ও শেষ পরিণতির ধাপগুলি। উপন্যাস নিরাদর্শ নয়। সে আদর্শ আকাশ থেকে নেমে আসা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়, নিতান্ত মাটিঘেঁষা জীবনসহচর দর্শন। আকস্মিকের উৎপাত নেই, ভাগ্যদেবীর যাদুদণ্ড নেই, আছে বাস্তবসম্মত দার্শনিকতা। অবশ্য সে আদর্শ লেখকের নিজেরই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাকে যেমন উগ্র প্রচারপন্থী হলে চলবেনা, তেমনি হতে হবে সর্বজনীন। সমকালীন সমস্যার স্বরূপ ও তার সমাধানের পথনির্দেশ থাকবে এতে; একমাত্র লক্ষ্য—to reveal the hidden life at its source। আর সেই জন্যেই উপন্যাসকে হতে হবে—

পরিবেশ-অনুগমনে যথাযথ, রস-পরিবেষণে ভারসম, প্রকৃতি বর্ণনায় প্রাসংগিক, ঔচিত্য-রক্ষায় সদাসতর্ক। স্থানকালপাত্ররসের সঙ্গে গল্প ও কুশীলবের সংগতি না থাকলেই হয় অনৌচিত্য দোষ। তেমনি ভাষাকে হতে হবে স্পষ্ট সহজ মিঠে সুন্দর ; সংলাপ যেন না হয় অপলাপ।

এই বাহ্য। উপন্যাসের আংগিক স্রষ্টার একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও মেজাজের ওপর নির্ভর করে। তাই প্রতি লেখকের প্রকাশভংগি পৃথক পৃথক। আবার একই লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসের অঙ্গসংস্থান অভিন্ন নাও হতে পারে। যা ঘটে ও যেমনটি ঘটে, তাকে নিয়েই সাহিত্য ; কিন্তু ঠিক তাকেই নিয়ে নয়। অর্থাৎ ঘটনাকে বাছাই করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে হয়। Fact is a poor story-teller (মম, এ নিয়ে তেমন মতভেদ নাই, যেমন আছে ঐ ফ্যাক্টকে কেমন করে ও কতটা প্রসাধিত সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হবে সেই সম্পর্কে। একজন বলেন—Life has a pattern, therefore a novel must have a pattern ; অন্যজন বলেন—All that is pre-arranged is false। বাস্তবসত্য ও সাহিত্যসত্যের সীমারেখা কোথায় ও কতটুকু, তথ্যের সত্যে উত্তারণের নিম্নতম ও ঊর্ধ্বতম সীমান্ত কোনখানে—এ সমস্যার ও সমালোচনার অন্ত নেই। গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে এতদুভয়ের মিলনের ওপরেই নির্ভর করে উপন্যাসের অন্তরঙ্গ রূপ ও গঠনভংগিম কারুকার্য। আঁদ্রে জিদের—To tell the truth this is my subject : the struggle between facts as proposed by reality and the ideal reality—এই সমস্যা একা আঁদ্রে জিদেরই নয়। এদিক থেকে এণ্টনী ট্রলোপের 'উপন্যাসের মুন্সীয়ানা' প্রবন্ধের আলোচনা উপাদেয়। তাঁর মতে, ঔপন্যাসিকের শক্তির উৎস—জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করা ও অনুভব করা ; সৃজনীশক্তির সঙ্গে চাই দরদ, সৃজ্যমান চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ; এগুলির অভাবে বা শিথিলতায় উপন্যাস হয়ে ওঠে দুর্বল ও একঘেঁয়ে। এই দোষ দেখা দেয় নতুন লিখিয়ের ক্ষেত্রে, যাঁরা উত্তেজনার বশে গল্পকে মনে দানা বাঁধতে দেন না। অনেক সময় আবার পুরোনোদের ক্ষেত্রেও হয়, যখন গোটাকয়েক উপন্যাস লিখে ও নাম করে তাঁরা মনে করেন, উপন্যাসের জীয়নকাঠি তাঁদের মুঠোয় এসে গেছে। তখন তাঁদের সেই প্রাথমিক দরদ ও অনুভূতি থাকে না। মনেমনে ভাবের দানা বাঁধার অবকাশ থাকেনা, গল্প জমাট হবার আগেই গল্প বলে ফেলেন।

তাঁদের মুঠোয় এসে গেছে। তখন তাঁদের সেই প্রাথমিক দরদ ও অনুভূতি থাকে না, মনেমনে ভাবের দানা বাঁধবার অবকাশ থাকেনা, গল্প জমাট হবার আগেই গল্প বলে ফেলেন।

কিন্তু সমালোচনার বাঁধ দিয়েও সমস্যার গতি রোধ করা যায়না। ফ্যাক্ট্, প্লট ও অ্যাক্সনের দ্বন্দ্ব শেষ হয়না। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস রূপবৈচিত্র্যে ময়ূরকণ্ঠী হয়ে ওঠে।

ছন্দের দিক থেকে দেখি, সে পদ্যেও আছে, গদ্যেও আছে। কিন্তু পদ্যের ছন্দ নিয়মিত, অনিয়মই গদ্যছন্দের প্রাণ। পদ্যছন্দে বৈচিত্র্যের ঐক্য, গদ্যছন্দে অনৈক্যের বৈচিত্র্য। কথাসাহিত্যের বাহন এই গদ্য—কোন প্যাটার্ণ-ফর্মুলার জোড়মেলানো হিসেবী চলন নয়, বেহিসেবী বেপরোয়া অছন্দে তার চলা। এই গদ্যের আশ্রয় না পেলে আমাদের সব কথা আজও আখ্যানকাব্যের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকত, উপন্যাসের মুক্ত প্রান্তরে অবাধ বিচরণের ও বিকাশের সুযোগ পেতনা।

এইই তো ভালো; এওতো ভালো। ধরাবাঁধা প্যাটার্ণের মধ্যে উপন্যাসের ঠাঁই যদি না-ই হল, হিসেবকষা জগৎ থেকে সে যদি পলাতক হয়ই—ক্ষতি কি তাতে! থাকনা তাতে যেমন আছে—রূঢ় বাস্তবের তাপ ও ভাপ, আদল আর বাদল-গান! শাস্ত্রের অলংকৃত খাঁচায় বন্দী থাক সাহিত্যের আরও অন্যান্যেরা; উপন্যাসে থাকুক যেমন আছে—জীবনের সহজাত প্রকাশ-আকাশ, মুক্তধারা প্রাণশক্তির সহজ চলন। সত্য হোক জাবালি মুনির ভবিষ্যদ্‌বাণী—'কথারসের কি একটি অন্তঃকরণ কেড়েনেওয়া অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। যে কথাটি বলতে গিয়েছিলুম সেই কথা থেকে কোথায় দূরে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই কথারসের ঢেউ' (কাদম্বরী)।

সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে চিত্তের যে বিমুক্তি, সেই মুক্তির আনন্দদানই তো উপন্যাসের সবচেয়ে বড়ো কাজ, সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব; সেইখানেই তো উপন্যাসের উপন্যাসত্ব। সে পংকজাত পংকজ।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের দুই যুগ

ভট্টিকাব্য রচনা করে কবি বলেছিলেন, 'আমার এ কাব্য এমন ভাবে রচনা করেছি, যা মাত্র ব্যাখ্যা দ্বারাই গম্য ; বিদ্বান ব্যক্তিদেরই এই কাব্য পাঠে আনন্দ, মূর্খদের এখানে প্রবেশ নিষেধ।' শুনে, সমসাময়িক আলংকারিক ভামহ উত্তর দিয়েছিলেন, 'কাব্যও যদি শাস্ত্রের মতো ব্যাখ্যার সাহায্যে বুঝতে হয় তবে সুধীজনের উৎসবই বটে ; হায় হায়, মন্দবুদ্ধিরা মাঠে মারা গেল !'

দুর্লভতা ব্রহ্মের লক্ষণ, কবির নয় ; দুর্বোধ্যতা শাস্ত্রের লক্ষণ, কাব্যের নয়। আলংকারিকের এ-উক্তি স্বীকার্য। তবু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যে কাব্যসাহিত্যের অন্তসৌন্দর্য-উদ্‌ঘাটনের অনেকখানি সহায়ক এ-সত্য চিরকালই সর্বস্বীকৃত, সে বক্রোক্তিকারেরা সমালোচকদের স্কুলমাষ্টার বলে ব্যঙ্গ করলেও। আর্থার সাইমন্সের ভাষায়, সমালোচক—'should find out for us more than we can find out ourselves' ; তাই কাব্যের সহজবোধ্যতাকে মেনে নিয়েও ব্যাখ্যাগম্যতার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। অলংকারশাস্ত্র ও পোয়েটিক্‌সের বিবর্তিত ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। একদিকে যখন অভিনব গুপ্ত বলেন, 'স্বসংবিদানন্দ চর্ব্বণব্যাপার রসণীয় রূপো রসঃ', তখন আর একদিকে মম্মট ভট্ট বলেন, একমাত্র সমালোচকরাই যথার্থ 'কাব্যজ্ঞ' ; আর একজন 'সরস্বত্যাস্তত্বং কবিসহৃদয়াখ্যম্' বিশেষণে ভূষিত করলেন তাঁদের। এবং রাজসভা ও সাহিত্যসভায় সমালোচক স্রষ্টার সঙ্গে পেতে থাকলেন একাসন 'ব্রহ্মরথযান' ও 'পট্টবস্ত্র'।

কবি যদি হন 'কারয়িত্রী প্রতিভা', সমালোচক তবে 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'। একজন সৃজন করেন, আর একজন তাকে প্রদর্শন করেন—কবি ও পাঠক -হৃদয়ের মধ্যবর্তী সেতুরূপে কাব্যের দোষগুণ বিচার করেন। অলংকারশাস্ত্র তাই একদিকে যেমন কাব্যনাটকাদি সৃষ্টির বিধিসম্মত শাস্ত্র, অন্যদিকে তেমনি সমালোচনের বিধিসম্মত শস্ত্রও।

এতো গেল সমালোচনাকে স্বীকার। কিন্তু তার সংজ্ঞা কি? জন্মগত অর্থে সমালোচনা হল 'সম্যক ঈক্ষণ'। কিন্তু দেখবো কি ভাবে? কোন্ রীতিপদ্ধতিতে? মাপকাঠিটি কেমন হবে? বলা বাহুল্য, এ সম্পর্কে পণ্ডিতে-পণ্ডিতে খণ্ডিত মত প্রচুর; এমন কি, একই কালে পরস্পরবিরোধী উক্তিও বিদ্যমান। যেমন এখন, তেমনি তখনও।

সুদূর অতীতের ভরত-নন্দীকেশ্বর ও আরিস্তত্‌ল্-হোরেস থেকে অদ্যাবধি সমালোচনারীতিরও বহুতর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনটাই শেষ কথা হয়নি; হতে পারেও না। সমাজের রূপ বদলেছে, রচনাধারার হাওয়াবদল হয়েছে, পালাবদল হয়েছে সমালোচনারীতির; সেই সঙ্গে তার সংজ্ঞারও। সাহিত্যের ভাবান্তরে সমালোচনার রূপান্তর তাই ক্রম-অভিব্যক্ত বিবর্তনের ঐতিহাসিক সূত্রনিয়মেই বিজ্ঞানসম্মত ও স্বভাবসিদ্ধ।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের একদা সূচনা হয়েছিল 'অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়ই কাব্য' এই সূত্র ধরে। ক্রমেই তা নতুন রূপ নিতে নিতে অলংকার—রীতি—বক্রোক্তি ধ্বনি-র সোপান অতিক্রম করতে করতে এসে উপস্থিত হল 'বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্' এ। এ-বিবর্তন অল্পদিনের ব্যাপার নয়। তবু, প্রাচীন ভারতের আলংকারিকদের মধ্যে দৃষ্টিকোণের একটি লক্ষণীয় ঐক্য ছিল। পলাশী-উত্তর বাংলা কাব্যশাস্ত্র কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্য ত্যাগ করে নতুন পথ ধরল; বিপরীত পথ বললেও নেহাৎ ভুল হবে না। আবার এ-রীতির গতিও সরল রেখায় নয়। বঙ্কিমযুগে তার এক রূপ, রবীন্দ্রনাথে আর, আধুনিকে বহু। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নবতর রূপ, সংজ্ঞা ও ও রীতির ঝরণাতলে অবগাহন করে করে সম্মুখপানে এগিয়ে চলাই সাহিত্য-সমালোচনার স্বরূপশক্তি। কারণ, সমালোচনার ইতিহাস আসলে তার সংজ্ঞাবদলেরই ইতিহাস, তার রীতিবিবর্তনের গতিময় লেখচিত্র। শুধু প্রাচ্য-দেশে নয়, প্রতীচ্যেও।

আমাদের প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র বিপুলকায় এবং হয়তবা একটু পাণ্ডিত্যাভিমানী। কাব্যনাটকের দোষগুণরীতি শব্দঅর্থঅলংকার ধ্বনিভাবরস নায়ক-নায়িকা সামাজিক এর বিচার্য বিষয়। উদ্দীপন বিভাবের সহায়তায় আলম্বন বিভাবের প্রতিষ্ঠা, সঞ্চারীভাবের আসাযাওয়া, অনুভাবের বিকাশ, স্থায়ী ভাবের উদ্বোধন এবং এসবের যোগাযোগে কাব্যের আত্মা রসের স্ফূর্তিলাভ—এগুলি কেমন করে কিসে কিসে হয়, স্রষ্টা ও দ্রষ্টাকে তার নির্দেশ দেওয়াই আলংকারিকের

মূল দায়িত্ব। এর সূত্র-বৃত্তি-কারিকাগুলি সটীক ও সঠিক জানা থাকলেই যেন কাব্যরচনা ও কাব্যপাঠের অধিকার জন্মায়। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র তাই সমালোচনাশাস্ত্রও—কাব্যজিজ্ঞাসা তার প্রথম প্রশ্ন। এর ধারা মোটামুটি দুটি: অন্বয়মুখী (গুণবিচার), ব্যতিরেকমুখী (দোষবিচার)। এর দু'য়েরই উপ বা অনুধারা আখ্যান ব্যখ্যান অন্বাখ্যান অনুব্যাখ্যান ইত্যাদি। সূত্র বৃত্তি পদ্ধতি ভাষ্য সমীক্ষা টীকা কারিকা ও বার্তিক তার অষ্টাঙ্গ। কিন্তু এ হল মূলত কাব্যশাস্ত্রের কথা। কাব্যসাহিত্যের অনুসঙ্গী যে সব ভাষ্যটীকা, তাতে রসের আলোচনা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তুলনায় যৎসামান্য। শব্দার্থ, প্রতিশব্দের বৈয়াকরণিক টীকা, সার, সন্ধিসমাস এবং অলংকার-প্রয়োগনৈপুণ্যের গুণবিচারেই তাঁরা বরং বেশি ব্যস্ত। ভাব-উল্লেখ বা রস-ব্যাখ্যান প্রায়ই পরোক্ষ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যনির্ভর। ফলে, সংস্কৃত ভাষ্যটীকার স্থান প্রায় ব্যাকরণের গণ্ডীতে। শব্দার্থের জাল ভেদ করে কাব্যতত্ত্ব সেখানে আধুনিক অর্থে সমালোচনার স্তরে নেমে আসতে পারেনি হতে পারেনি কবি ও পাঠকচিত্তের সহৃদয় হৃদয়সংবাদী সেতু।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও ভাষ্যটীকা এবং গ্রীক-রোমান পোয়েটিক্‌স ও ও ডিক্‌সন-এর মধ্যে সাদৃশ্য হয়তো সামান্য। তবু এক হিসেবে উভয়েই সমগোত্রীয়। দুই-ই বাঁধাধরা নিয়মকানুন আর আঙ্গিকের গণ্ডীবাঁধা আলোচনা। মনুর স্মৃতিশাস্ত্র আর ক্লাসিক সাহিত্যশাস্ত্রে শাসনের কড়াকড়ি প্রায় সমান। একটি লঙ্ঘনে সমাজচ্যুত হতে হয়, অপরটি অমান্য করলে রসবঞ্চিত। আরিস্ততলের আলোচনায়ও 'must' আর 'should be' অনুজ্ঞা দুটীর বাহুল্য আধুনিক পাঠকের নজরে না পড়ে পারে না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কিন্তু নিজস্ব কোন অলংকারশাস্ত্র নেই, নেই স্বতন্ত্র কোন সমালোচনা পদ্ধতি। অথচ তা থাকা উচিত ছিল। আর্য সভ্যতা থেকে অজস্র ঋণ গ্রহণ করেও বাংলা সংস্কৃতি স্বকীয়। তার নব্যন্যায় আছে, কিন্তু নব্যভাষ্য নেই। কাব্যের অলংকরণে ও আঙ্গিকে-ভঙ্গিতে সে মৌলিক, অথচ তার বিচারপদ্ধতি কৌলিক অর্থাৎ সংস্কৃত-অনুগামী। নতুন সৃজন হল, কিন্তু আলোচনার পদ্ধতি এবং মাপকাঠি রইল পুরোনো। ইংলণ্ডেও অনেকটা তাই দেখা যায়। শেক্‌স্‌পীয়র এলেন, কিন্তু তাঁর সমকালে সমজাতীয় বা সমধর্মা কোন মল্লিনাথ অনুপস্থিত। লক্ষণীয় যে বাংলাকাব্যের মধ্যযুগ এবং ইংরেজী কাব্যের 'আধুনিক' যুগ প্রায়

সমসাময়িক। এসময় কোন টীকা ভাষ্য বা আলোচনা নেই, এমন নয়। ইংলণ্ডে রয়েছে ড্রাইডেনাদির প্রবন্ধাবলী, বাংলাদেশে বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্র: উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অলঙ্কারকৌস্তুভ, ভক্তিরত্নাকর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি। কিন্তু এগুলো আসলে বর্তমানের মূল্যায়ন নয়, অতীতেরই প্রতিধ্বনি।

ইংলণ্ডে এই প্রাচীনমুখীনতা চলেছিল ড্রাইডেন পর্যন্ত; বাংলায় তেমনি ভারতচন্দ্র পর্যন্ত। অথচ, সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সমালোচনারও প্রগতি হওয়া দরকার সুরেখ দিগ্‌নির্দেশের জন্যে। তার অভাবে বাংলা দেশে বিষ্ণুপদ, মঙ্গলকাব্য, কালীকীর্তনকে আমরা পর্যবসিত হতে দেখেছি আখ্‌ড়াই, হাফ্‌-আখ্‌ড়াই, ঢপ, খেউড়ে।

টি, এস, এলিঅট তাঁর একটী বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'the age of criticism is the age of poetry'। কথাটী সত্য ইংরেজী সাহিত্যেও ১৯শ শতাব্দীতে, তার আগে নয়। অষ্টাদশের শেষভাগে শিল্পবিপ্লব ও রোমান্টিকতার পুনর্জাগরণ ও পূর্ণজাগরণ; নতুন সাহিত্যরচনার যুগ এবং নতুন সমালোচনারও। এলিজাবেথীয় যুগের কৃতিত্বের, এমন কি শেক্‌স্‌পীয়রীয় প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতিও এই সময়েই। বাংলা সাহিত্য এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে এলিঅটের মন্তব্য সত্য—ঐ ১৯শ শতাব্দীতেই এবং তার পরে; আগে নয়। ধ্রুপদী অলংকারসংহিতার বিধিনির্দেশকে অস্বীকার করার সচেতন প্রয়াস দেখা দিল আধুনিক কালেই। নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় নতুন করে জীবনকে দেখা ও আত্মোপলব্ধি, নবীন চেতনা ও নবতর সাহিত্যরচনার প্রস্তুতি দেখা দিল এই সময়েই। জীর্ণপ্রাচীন সংস্কার ও অনুশাসনকে সরিয়ে বাঙালী মানস পাশ্চাত্যের উদার দূরবিস্তৃত ভাবধারায় অবগাহন করল, সেই সঙ্গে দুয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মস্থ হবার নিশানাও পেল ক্রমে ক্রমে। কোন বিধিবদ্ধ প্রাচীন রীতির উদ্যত অনুশাসন নয়—জীবন মানুষ কল্পনা ভাবাবেগ ও ব্যক্তিগত ভালমন্দের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব আঙ্গিকে ভঙ্গিতে কাব্যপাঠ ও কাব্যবিচার। একেবারে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত। প্রাচীনেরা দেখতেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য; নবীনেরা দেখলেন, ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য। সেকালে সাহিত্যবস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে দেখে তারপর হত সামগ্রিক রসবোধিতে উত্তরণ, একালে কাব্যশরীরকে সমগ্রভাবে দেখে তারপর খণ্ড খণ্ড বিচারে রসচেতনায় বিচরণ একটী সংশ্লেষধর্মী, অপরটী বিশ্লেষণী। প্রাচীন রীতি থেকে মুক্তি চেয়ে ওয়র্ডসওয়র্থ তাঁর 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌' সম্বন্ধে বললেন, আরিস্ততল-হোরেস-ডিমিট্রিয়াস

নয়—in judging these poems he would decide by his own feeling genuinely।' বাঙলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রকেও বলতে শোনা গেল: 'আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি; আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।' প্রাচীন আলংকারিকদের প্রতি এই প্রণামনিবেদনের মধ্যেই আমাদের সমালোচনা-পদ্ধতির রূপান্তর ঘটল।

এই দিক থেকে বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের আলোচ্য যুগের সাদৃশ্য দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। উভয় ক্ষেত্রেই ভাবনাগুলির মধ্যে আশ্চর্য সংগতি বিদ্যমান। নবলব্ধ মানবিকবোধ এবং মানবিকতা এই সময়কার দুই দেশেরই কবি-কাব্যজ্ঞদের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। তাই ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বলতে পারলেন, 'যদি কল্পনাকে ব্যাকরণ অলঙ্কারের বিধিবিধানে, সমালোচনাশাস্ত্রের বিবিধ-বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে ললাটে পিটে পিটে জোড়া দিয়া বাঁধা যায়, তাহা হইলে তাহার কোমলাঙ্গী কবিতাকন্যার কি বিষম অপমৃত্যু ঘটে, তাহা বারেক অনুমান করুন।' এই মনুষ্যত্ববোধের নিরিখেই নতুন সমালোচনা 'অনুধাবন করে, প্রতিবাদ করে না। ব্যাখ্যা করে, বিচার করিলে 'রায়' লিখে না।' বঙ্কিমের মত আদর্শবাদীও নির্মোহ দৃষ্টিতে বললেন, 'রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।' কোন আদর্শবাদের খাতিরে, কোন রীতির অনুশাসন মেনে মানুষকে সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত করা চলবে না, গোটা মানুষকে তার পরিপূর্ণ অখণ্ডতায় সামগ্রিকভাবে দেখতে ও দেখাতে হবে—আধুনিক সমালোচনার এই নতুন নীতিই সেদিন নির্দিষ্ট হল।

এই আধুনিকতার যাত্রাসুরু ১৯শ শতাব্দীর প্রথম থেকে। তার সূত্রপাত 'সমাচারদর্পণে' আর ক্রমবিকাশ গুপ্তকবির 'সংবাদ প্রভাকর,' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ,' দ্বারকানাথের 'সোমপ্রকাশ' ইত্যাদিতে। এ যুগের স্বনামখ্যাত সমালোচক—সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন, সমাজতত্ত্ববিদ্ রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি সর্ববস্তুতে খাঁটী আর্যত্বের ছাপ খুঁজে বেড়াতেন।

অবশ্য জন্মলগ্নেই বাংলা সমালোচনা যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছিল, এমন ভাবলে ভুল হবে। সেদিনকার সামাজিক বিপ্লব যেমন পূর্ণাঙ্গ ছিল না, তেমনি নিখুঁত রূপান্তর হয়নি মনেরও। তাই সাহিত্যে অতীতসর্বস্ব রোমান্স আর সমালোচনায় অতীতচারী রীতি এবং সেইহেতু শিথিলতা এবং দ্বিধাও ছিল। একে দৃঢ়তা শক্তি ও গতি দিল দুটি রচনা: রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ'

(১৮৫২) ও ক্যালকাটা রিভ্যুতে লেখা বঙ্কিমের Bengali Literature (১৮৭১) প্রবন্ধটা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।'

সমালোচনারীতির পরিকল্পনা, কাব্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং পত্রপত্রিকায় পুস্তক-পরিচয়-দানের ধারা—এই তিন ক্ষেত্রেই বঙ্কিম ও তাঁর সহগামীগণ একান্তভাবে স্বকীয় ও আধুনিক। কিন্তু কালটি 'নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল' বলেই মন দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন নয়। ভারতীয় আলংকারিকদের বিদায় দিয়ে বঙ্কিম বলেছেন 'ইংরেজিতে যাহাকে poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত। এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কিনা, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।' অন্যপক্ষে বলেছেন, 'সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে।' সেই উপাদানের জন্যে 'ইংরাজী বা সংস্কৃতর কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয়না।' আবার গীতিকাব্যের বিচার করতে গিয়ে এ দুটিকেই মেনে নিয়েছেন ; দৃশ্য-কাব্যের আলোচনা করেছেন প্রাচ্য রীতিতে, কাব্যকবিতার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে। দ্বন্দ্ব-দ্বিধা সত্ত্বেও অবশ্য এযুগের সমালোচকেরা স্বীকরণে উঠে আসতে পেরেছেন অনেকে, আত্মস্থ হয়েছেন কেউ কেউ, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারে। আধুনিক বাংলা সমালোচনার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠায় যে ক্ষমতা ও প্রবণতা থাকা দরকার, তা এ যুগের সাহিত্যিকদের ছিল। রসানুভূতি, সৌন্দর্যবোধ, নীতিজ্ঞান ও সাহিত্যপ্রাতি, পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা যুক্তিশৃঙ্খলা ও সহৃদয় হৃদয়—কোন কিছুরই অভাব ছিল না। ফলে বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনা কৌশলে এল নবীনতা, গদ্য হয়ে উঠল চমৎকৃত ; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এল রম্যতা, আত্মস্বাক্ষর আলোচনা ক্রমে রসরূপ নিল ; সেই সঙ্গে, যাকে বলা হয় সৃজনধর্মী সমালোচনা (creative criticism), তার স্বরূপও আভাসিত হয়ে উঠল।

বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা 'উত্তরচরিত'। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী হিসেবে রসবাদী ও সামগ্রিক দৃষ্টি তাঁর মধ্যেই সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। তাঁর মতে, 'যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদায় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে···কাব্যনাটক সমালোচনাও সেইরূপ।' অতএব কাব্যতত্ত্বকে নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন তিনি। ভবভূতির রচনায় অবগাহন করে যে গুণগুলি তিনি আহরণ করলেন, তা ভাষ্যটীকার শব্দ-সন্ধিসমাস, কাব্যশাস্ত্রের

ভাব-রস বা পোয়েটীক্সের Plot, Character, Diction নয়, তা হল—'সৃষ্টিক্ষমতা', 'সৌন্দর্যবোধ' ও' স্বভাবানুকারিতা'। 'রসোদ্ভাবনের' কথাও বলেছেন, কিন্তু সযত্নে পরিহার করেছেন আলংকারিক পরিভাষা; কারণ, 'ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে!' নতুন সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন করে রসসংজ্ঞা ও রসসংখ্যা নির্ণয় করেছেন অথচ তত্ত্বকে যান্ত্রিক ভাবে ধরে রাখেননি বজ্রমুষ্টিতে; ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পরিচয় দিয়েছেন; যেমন, দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে—'বহি পড়িয়া একটা আন্দাজ theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে।…গ্রন্থকারের হৃদয়ে যাহা পাইয়াছি গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া একথা বলিলাম।' কবিচিত্ত ও কাব্যকে মিলিয়ে বিচারের এই পদ্ধতিটি বাঙলা দেশে অন্তত নতুন। তত্ত্ববিমুখ হৃদয়নিষ্ঠা, যা অনেক ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠার সহধর্মী, বঙ্কিমের সমালোচনাকে যান্ত্রিক হতে দেয়নি, ব্যবধান ঘটিয়েছে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে।

বঙ্কিমের সমালোচনাকে আরোহ অবরোহের কোন বিশেষ পর্যায়ে ফেলার চেষ্টা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। যদিও তাঁর রচনা মূলত অবরোহী, তবু অন্যান্য রীতিগুলিও অবিদ্যমান নয়। তাঁর আলোচনার বৈশিষ্ট্য, কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রসাস্বাদ; তা থেকে কবিপ্রতিভার দোষগুণবিচার। রসবাদী সমালোচক হয়েও বঙ্কিম কিন্তু জীবন-সমালোচক, কবিত্ব সত্ত্বেও ম্যাথু আর্ণল্ডের মত 'criticism of life'-এর প্রবক্তা। এতে হয়তো কিঞ্চিৎ অবাস্তবতা এসেছে, কিন্তু যুগের সাযুজ্যে মাটির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে তাঁর মনটি। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়: "প্রবাদ আছে যে গরীব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া মোচার ঘণ্টে বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটি কি এ? বহু কষ্টে পিসিমা তাঁহাকে সামগ্রীটি বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ কেলাকা ফুল"। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলাকা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলাকা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন—" (ঈশ্বর গুপ্ত)। লক্ষণীয় যে, সমালোচক বঙ্কিমের পাশাপাশি এখানে দেশপ্রেমিক কমলাকান্তও সহৃদয়ে বর্তমান। অথবা—"আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু

ল্যাম্প্‌লেটখানি বাহির করিয়া কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন। কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।...সাহিত্যসমাজে লাঠিয়াল আর নাই এমন নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা; বাহুতে বল নাই। তাহারা লাঠির ভারে কাতর; শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে'—(দীনবন্ধু মিত্র)। জাতীয়তাবাদী সংস্কারক বঙ্কিমের ছায়া উদ্ধৃত অংশে সহজেই লক্ষ্যগোচর।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, এযুগ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের, পরীক্ষানিরীক্ষার। আবার বঙ্কিমে যে সকল রীতি ও গুণের সমাবেশ, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে তা অনেকখানি খণ্ডিত। কেউ যুক্তিবাদী, কেউ কল্পনাবিলাসী, কেউ আরোহী কেউ অবরোহী, কারো আশ্রয় ইতিহাস, কারো নিছক সাহিত্যজগৎ, কারো বা উপজীব্য কাব্যতত্ত্ব। তবে, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত এবং বাঁধাধরা ছক্‌কাটা রীতির বিরোধী। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। তাঁর একদিকে বঙ্কিম, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ। ম্যাথু আর্নল্ডের মত তুলনামূলক বিচারেই তাঁর বিশিষ্টতা, কাব্যতত্ত্বের নিরিখ্‌ নির্ণয়েই তাঁর সাহিত্যায়ন, শেলীর মত বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতিকে কাব্যের সঙ্গে তুলিত করে তাঁর প্রচুর আনন্দ। 'একতা হইতে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতা হইতে একতা সমালোচনার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই দুই প্রণালীর একটিকে বিশ্লেষণ ও অপরটিকে সংশ্লেষণ বলে'—(সমালোচনা ও সমালোচক)—এই উক্তিটিকে সমালোচনার ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তিনি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। এযুগে আরোহী সমালোচনার দৃষ্টান্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যচিন্তা'। বঙ্কিমযুগে একমাত্র ইনিই সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রসম্মত; অধিকন্তু নিজ মতের সমর্থনে তিনি হাজির করেছেন অ্যাডিসনকে, যাঁকে বলা যায় হোরেসের উত্তরসাধক। ফলে তাঁর সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগময়তায়, ভ্রান্ত উক্তিতে বিরক্তিকর। যেমন, 'ট্র্যাজিডিতে বধকাণ্ড প্রধান ঘটনা হইয়া পড়ে; পুরাণের প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহা আচ্ছন্ন থাকে'—(সাহিত্যে খুন)।

আগেই বলেছি, আধুনিক সমালোচনা শুধুই গ্রন্থালোচনা মাত্র নয়, কাব্যতত্ত্বও। সুতরাং রচনার আলোচনায় সেযুগের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি মতো নতুন নতুন প্রকৃতি-পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্যের ও তার মাপকাঠির। এই সময়ের অবরোহী সমালোচনায় গ্রন্থ-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে

সাহিত্যবিচারের সূত্র আবিষ্কারের অভিনব প্রয়াস ১৯শ শতাব্দীর ইংরেজ কবি-সমালোচকদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্কিমের 'উত্তরচরিত' সমালোচনাতেই এর প্রথম প্রতিষ্ঠা, পরে ক্রমবিকাশ। চন্দ্রনাথ বসু যখন 'নভেল বা কথাশিল্পের উদ্দেশ্য' সমাজের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন বলে ঘোষণা করেন, দেবেন্দ্র বসু যখন রায় দেন, 'প্রকৃত সমালোচক যিনি, তিনি কবির সৃষ্ট রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাহার সৌন্দর্য দেখিবেন, দেখিয়া তাহা সাধারণকে দেখাইতে চেষ্টা করিবেন'—(নভেলের শিল্প), 'আর কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'নাটক'-এর রূপনির্দেশ করতে গিয়ে ফেটে পড়েন—'নিপীড়িত জাতির ভাষায় এত বিলাসিতা ? যাহার মর্ম্মে পীড়া, গাত্রে কশাঘাত, হৃদয়ে বেদনা, সে কেন ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ গাহিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ? · · আর সেই বাঙ্গালীর রচিত নাটক নামধারী কথোপকথনঘটায় এত প্রণয়, প্রণয়, প্রণয় কেন ?'—তখন এই সব উচ্ছ্বাসবাহুল্যের মধ্যেও কাব্যউপন্যাসনাটকাদির রূপরেখা নির্ণয়ের নবীন আকাঙ্খাটি স্বতঃ-বিভাসিত রূপে ধরা পড়ে।

খাঁটী উচ্ছ্বাস-উক্তিরও অসদ্ভাব নেই এযুগের সমালোচনায়। একটি ছায়া-সমালোচনা, অপরটি রস-সমালোচনা ; যদিও দু'য়ের ব্যবধান সামান্য। দুই-ই চরমভাবে আত্মগত ও ব্যক্তিসাক্ষিক। 'মৃণ্ময়ী' গ্রন্থপাঠান্তে চন্দ্রশেখরবাবু বলেছেন, 'পাপের দণ্ড হওয়া উচিত। পদ্মাবতী দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, দুই চারিবার 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' বলিয়াছেন,—তাহা জানি, চক্ষের জল যে ভাল জিনিষ, প্রাণনাথ বেশ সরস কথা, তাহাও জানি। কিন্তু ইহাতে আজীবন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।' পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-রসাস্বাদ এবং সেই আনন্দ পাঠকমনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা তখনকার সমালোচনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গিরিজাবাবু মনোরমার দ্বৈতচরিত্রের মাধুর্য উন্মোচিত করতে করতে পাঠককেও সঙ্গে নিয়ে চলেছেন—'পাঠক, এখন এক এক করিয়া মনোরমার এই কার্য ও কথাগুলি লক্ষ্য কর' বা 'এই আমাদের মনোরমা! সংসারে এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি আর কখন দেখিয়াছ ?' আধুনিক যুক্তিতে সমালোচনার এই রীতি হয়তো স্কুলমাষ্টারী, কিন্তু এই রীতির মৌলিকতা,আন্তরিকতা এবং স্বীয় রসানুভূতি অন্যমনে সঞ্চারিত করে দেবার মধুর প্রণালীটি লক্ষ্য এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

রস-সমালোচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থের আলোচনা : 'সূর্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ। সূর্যমুখী একটি বিকশিত

কুসুম, কুন্দ একটি কুসুম-কোরক।...একজন লজ্জাবতী লতা, আর একজন বনজ্যোৎস্না নবমালিকা। একজন প্রগল্ভা একজন মুগ্ধা। নিরাবরণ নারীদেহের যে সৌন্দর্য্য সূর্যমুখী হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্য—তৃপ্তিপ্রদ, অতুল ও মুগ্ধকর। অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরীর যে সৌন্দর্য্য কুন্দ হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য্য—সাকাঙ্খ, অনুপম ও উন্মাদক।' সন্দেহ থাকে না যে রসসমালোচনা এখানে সৃজনাত্মক, এমন কি নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। সৃজনধর্মী এই রসসমালোচনার ক্ষেত্রেও বঙ্কিম পুরোধা; রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীনসাহিত্য' তাঁরই অনুসারী। 'জয়দেব ও বিদ্যাপতির' উত্তরসাধক 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস'। প্রাচ্যের রসতত্ত্ব ও আনন্দবাদ এবং পাশ্চাত্যের রোমান্টিকতা ও সৌন্দর্যবাদ এখানে একসূত্রে এসে মিলিত হয়েছে।

এমনি ভাবে এযুগের সমালোচকদের হাতে সমালোচনা আর শুধু আলোচনাই রইল না, ব্যাকরণ তো নয়ই, হয়ে উঠল একদিকে কাব্যশাস্ত্র, অন্যদিকে creation within a creation। এঁরা সবাই সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, সংস্কৃত ইংরেজি ও বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন ('কিন্তু বঙ্গসমাজের অবস্থা ইংলণ্ডীয় সমাজের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইংলণ্ডে যাহা অতীব উপকারী, এখানেও যে তাহা উপকারী হইবে এরূপ আশা করা যায় না'—চন্দ্রনাথ বসু) ; অলংকার শাস্ত্র ও পোয়েটিকসেও দখল ছিল প্রচুর। ফলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এতদুভয়ের কাউকেই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ না করেও দু'য়ের মিলনে অদ্ভুত স্বাঙ্গীকরণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাঁদের দেশপ্রীতি জাতীয়তাবাদ ও আদর্শবোধে নীতির হয়তো প্রাধান্য ছিল এবং তা সমালোচনাকে কিছুটা স্পর্শও করেছে, কিন্তু কোন কলাকৈবল্যবাদের প্রশ্রয় ছিল না নিঃসন্দেহে।

জনৈক সংকলকের মতে, "The nineteenth century, having discarded the dogmas and 'rules' of Neo-classicism, had perforce to investigate afresh the theory of poetry, and though no systematic treatment of the subject in all its bearing appeared, some valuable contributions were made, the most notable of which came from the poets themselves." (Preface : English Critical Essays)। মন্তব্যটি ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সমালোচনাসাহিত্য সম্পর্কেও দ্বিধাহীন ভাবে সত্য। বঙ্কিমীযুগে আলোচনাগুলিতে বিশেষ কোন

বিধিশৃঙ্খলা হয়তো পাওয়া যায় না, কিন্তু পুরাতনের নিগড় ভেঙ্গে নতুন পথ খোঁজার বিভিন্নমুখী ও বিচিত্র প্রয়াস সেখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং এই পথেই ভবিষ্যতের ভিত্তিও রচিত হয়েছে, যার ওপর গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালের সমালোচনা—রবীন্দ্রযুগের ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের।

বঙ্কিমী আমলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচনারীতির মধ্যে সমন্বয়সাধনের যে প্রচেষ্টা, তাই ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দিল রবীন্দ্ররচনাবলীতে। এই দুয়ের মিলনে তৃতীয় একটি রূপ উপসংহৃত তো হলই, বলা যায়, বাংলা সমালোচনা এতদিনে দ্বিধাহীন অখণ্ড চেতনায় উদ্‌ভাসিত হল।

'সাধনা' ও ভারতী'তে প্রথম দিকে যেসব গ্রন্থালোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তার অধিকাংশেই বঙ্কিমী রীতির সুস্পষ্ট ছায়াপাত লক্ষণীয়। সেই গল্পপাঠ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সপাদটীক রস-উপভোগ। কিন্তু এর পাশাপাশি সর্বক্ষণই জেগে ছিল তাঁর স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর। যে নতুন ধারা পূর্বগামীদের রচনায় আভাসিত হয়ে উঠেছিল মাত্র, রবীন্দ্রনাথ তাকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন মূলত কাব্যধর্মী প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে। তাই 'ফুলজানি'-র বিচারে তিনি যখন সুরুতে গ্রাম্য ও শহুরে সীমারেখা ধরে সংজ্ঞানির্ণয় করলেন, তখন তিনি জনান্তিক অথচ জীবনঘনিষ্ঠ। পূর্বপ্রচলিত মানবতাবোধের কেন্দ্রভাবটিকে তিনি গ্রহণ করলেন, কিন্তু তার পরিধি সম্প্রসারিত হল। জাতীয়তার বেড়া ভেঙ্গে দেশকালপাত্রের ঊর্ধ্বে এক বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে এনে ফেললেন সাহিত্যকে, সমালোচনাকে। তাই তাঁর মতে—'এমনি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি লালিত হইয়া উঠে। সেই আদর্শ নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শমতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।'

বঙ্কিমের সমগ্রদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথে এসে হয়েছে সমন্বিতদৃষ্টি। ভগ্নাংশের বিচার তাঁর কাছে অসহ্য, তাঁর দৃষ্টিতে—'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়।' দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হবে। 'ফুলজানি'র আলোচনাতে তিনি লিখছেন: 'এতক্ষণ গ্রন্থকার ১২২ পৃষ্ঠায় যে সুন্দর সরল সমগ্র কাব্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের পরিহাসবশত শেষের ৪৪ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্র নির্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।' এবং 'মন্ত্র' বিচারান্তে বলছেন: 'এইবার নমুনা

উদ্ধৃত করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমরা ফুল ছিঁড়িয়া বাগানের শোভা দেখাইবার আশা করিনা। পাঠকগণ যেন কেবল সমালোচনা চাখিয়া ভোজের পূর্ণসুখ নষ্ট করিবেন না।' লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বঙ্কিমযুগের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এখানে অনুপস্থিত, সহমর্মীর রসবোধই এখানে আভাসিত।

অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'সমালোচনা'র প্রবন্ধগুলি থেকেই রবীন্দ্রসমালোচনারীতির যাত্রাসুরু। প্রথমাবধি গ্রন্থালোচনার চেয়ে কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যানই তাঁর প্রিয়তর। এক্ষেত্রে, পূর্বসূরীদের উত্তরসাধক হয়েও তিনি স্বতন্ত্র, নতুনতর কাব্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার। 'সাহিত্য' গ্রন্থের রচনাগুলিতে বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে যে সমালোচন-দৃষ্টিকে তিনি রূপ দিলেন, আজকের রসবাদী সমালোচনা তার সহোদর না হলেও সহচর। এখানে তাঁর বক্তব্যঃ 'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে' এবং 'তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।... ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার।' আর এই 'হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।' এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেন, 'আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভব করিতে চায়।' এই প্রকাশব্যাকুলতাই সাহিত্যশিল্পের জন্মলগ্ন ; প্রকাশ তার চিত্র ও সঙ্গীতের আশ্রয়ে। তাই তাঁর মতে, 'সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র। বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।' এ থেকে এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে তাঁর উপনীতি—'জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।' বঙ্কিমের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। তিনি মনে করেন, জ্ঞান নয়, ভাবই সাহিত্যের সামগ্রী ; কারণ হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না, 'সারবান সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি।' সে বনস্পতি। আর যখন 'একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে, লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ', তখন সেই ভাবকে পাঠকমনে সঞ্চারিত করার জন্যে নানা কৌশল ইঙ্গিত অবলম্বন করতে হয় ; 'এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা...সেটুকু বড়ো

সত্যের অনুরোধেই করিতে হয়।' এই দৃষ্টিতে তিনি প্লেটোর Art is imitation তত্ত্বসিদ্ধান্তকে অস্বীকৃতি জানান: 'সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে… রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।' শেষ কথা, 'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।'

বস্তুজগৎ থেকে উপাদান আহরণ করে মনোভাবের জন্ম, তারপর সেই সব ভাবের প্রকাশমুখী বিচিত্র লীলা—রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যতত্ত্বের ভিত্তি কান্টিয় মনস্তত্ত্ব তথা ভাববাদী দর্শন ও ডি কোয়েন্সীর কাব্যদৃষ্টি। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলবোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে তা রসবাদী সমালোচনাকে চরম উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রয়োজনের জগৎকে আশ্রয় করেই তিনি উপনীত হয়েছেন অপ্রয়োজনের, ভাবরসের উচ্চলোকে। তাই তাঁর কাছে 'যথার্থ যে মঙ্গল, তাহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে এবং তাহা সুন্দর।' কাব্য তথা কাব্যতত্ত্ব প্রযোজনীয় হয়েই প্রয়োজনাতীত, 'উপরি পাওনা।'

'সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের ইংরেজ কবি-সমালোচকদের সমগোত্রীয়, পূর্বসূরীদের চেয়ে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ম্যাথু আর্নল্ড চেয়েছেন সাহিত্যে humanaction, লী হাণ্ট passion, শেলী imagination, লাওয়েল life, আর ল্যাম্ব গোটা মানুষ—'Give me man as he is, not to be': রবীন্দ্ররচনায় এর কোনটিরই অভাব নেই। ওয়র্ডসওয়র্থের মত তাঁর কাছেও কবি হলেন a man speaking to man। মানবিক অনুভূতি-বিরহী পুঁথিসর্বস্ব বিধানশাসিত পণ্ডিতবর্গ তাঁর কাছে 'ব্যবসাদার বিচারক', সারস্বতকুঞ্জে প্রবেশের অনধিকারী। যথার্থ সমালোচকগণ 'সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।' তাঁরা হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করেন, আলংকারিক নিয়ম কানুনের কুলপঞ্জিকা মিলিয়ে 'সাহিত্যের বিচারক' সাজেন না, অথবা—not by reflection upon what will probably be the judgement of others—এবং এই সহৃদয়হৃদয়সংবাদের মাধ্যমে 'সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।' বুদ্ধিতে নয়, বোধিতে তাঁদের বিহার।

এক্ষেত্রে শেলীকেই তাঁর সঙ্গী মনে হয়। 'Poetry is indeed something divine' এবং 'সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী'—একই মনের কথা। অথবা 'Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds' এবং 'সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে অমৃত-রূপকে ব্যক্ত করিতেছে'—অভিন্ন ভাবনা। সমালোচনার ক্ষেত্রেও, শেলী যখন বলেন, ,Poets are the unacknowledged legislators of the world' তখন তিনি, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিচারকদের যে জাতিনির্ণয় করেছেন, সেই কবি-সমালোচকদের কথাই বলেন। আর বদলেয়ার যে বলেছিলেন, 'All great poets become naturally, inevitably, critics'—সেকথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যত সত্য, শেলী সম্পর্কেও বোধ হয় ততটা নয়। এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে এলিঅটের মন্তব্যটি মনে পড়ে। কিন্তু সন্দেহ নেই যে, একান্তভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে সমালোচনা যুক্তি বুদ্ধির স্তর ত্যাগ করে ভাবুকতা, আবেগ ও কল্পনাচারিতার আশ্রয় নিতে থাকে, সমালোচনা হয় সৃজনধর্মী, মূল্যনিরূপণ না হয়ে হয় নতুনতর মূল্যসৃষ্টি।

এই রূপান্তরের আভাস অবশ্য আগেও ছিল। ঠাকুরদাস একদা বলেছিলেন, 'সমালোচকগণ সাহিত্যসংসারে একদিকে প্রহরী ও অপরদিকে পুরোহিত স্বরূপ'। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা।...যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক—পূজারী পুরোহিত।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথে এসে সমালোচকের প্রহরীত্ব ঘুচল, রইল শুধু পৌরোহিত্য। বঙ্কিমীযুগের সংস্কারপ্রয়াস পরিত্যক্ত হল, রইল শুধু রসাস্বাদন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা তাই আবেগলক্ষণাক্রান্ত, সৃজন-ধর্মী ও লিরিকপ্রধান। রাস্কিনের 'মহৎ আর্ট মাত্রই স্তব' উক্তিটাই তার দিগদর্শক। 'প্রাচীন সাহিত্য' 'আধুনিক সাহিত্য' এমন কি, 'লোক সাহিত্য' আলোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনবিদিত। রামায়ণ পাঠ করেছেন তিনি, কুমারসম্ভব-শকুন্তলা-মেঘদূতের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করছেন আর নতুন করে অনুরণিত হয়েছে তাঁর কবিচিত্ত। কাব্যের উপেক্ষিতাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন: (তাহারা) 'পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল, নাটকের মধ্যে আরপ্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।' এই হৃদয়সংবাদেই রবীন্দ্রসমালোচনার বৈশিষ্ট্য।

রোমান্টিক কবিচিত্ত কল্পনাবিহারী। বস্তু তার কাছে উপলক্ষমাত্র, গতিলাভের প্রারম্ভিক সূত্ররেখা। সেই সূত্রকে ছাড়িয়ে মন তার উড়ে চলে কল্পলোকে; সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে, সমালোচক নয়—কবিচিত্ত উত্তীর্ণ হয় কোন নতুন সামঞ্জস্যে। কবি ও কাব্যজ্ঞ তখন একবিন্দুতে—রসিক, অথচ পূর্ণতাভিসারী।

কিন্তু বিশুদ্ধ কল্পনাবিহারেই (বিলাস তাকে যদি নাও বলি) তো প্রতিভার শেষ নয়। একটি সুবিহিত জীবনদর্শনও তার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথও প্রতিভার সেই সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম হতে পারেন না। রোমান্টিকতা তাঁর জীবনময়তার একটা অংশ, একটা দৃষ্টিমাধ্যম মাত্র। রবীন্দ্রদর্শন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভিন্ন চিন্তাধারার সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে গড়ে ওঠা, তিলে তিলে জীবন দিয়ে অনুভব করা। সীমা ও অসীম, বহু ও এক, খণ্ড ও পূর্ণ—এ-দুয়ে মিলে যে বৃত্তসম্পূর্ণতা, রবীন্দ্রনাথের সকল দর্শনের মূল ভিত্তিও তো তাই। এই কেন্দ্রবিন্দু আশ্রয়েই তাঁর কল্পলোক-আদর্শ-লোক-রসলোকের সৃষ্টি; রবীন্দ্রদর্শনের গঠন ও গড়ন সত্য সুন্দর শিবের বহুবিচিত্র উপলব্ধি। এবং এগুলি প্রকাশের প্রয়াসেই রবীন্দ্রশিল্প। তাই যে সৌন্দর্যতত্ত্ব তাঁর সমালোচনায়—তা আকাশচর কল্পনা নয়, মানস-সরোবরের দর্শনও বটে। লক্ষণীয় যে, এই চেতনা উনবিংশ শতকের রোমান্টিক ভাবনার সহগামী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত।'

তাই সৃজনধর্মী হয়েও রবীন্দ্র-সমালোচনা ভারতীয় নন্দনতত্ত্বসম্মত; সত্য-সুন্দরশিবের 'সামঞ্জস্যের সুষমা' এর লক্ষ্য। এই রীতিতে, সমালোচকের পাঠপিপাসু মনে সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া উক্ত তত্ত্বের নিয়মে পরীক্ষা করাই বিধি। কবি এখানে ক্রোচে-পন্থী। টলষ্টয় এ পদ্ধতির বিরোধী, আধুনিকরাও এ-রীতির অনুসারী নন। কিন্তু কবির বিশ্বাস—'এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।'

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মূল ভিত্তি আনন্দবাদ। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র রসবাদী ও আনন্দের সমর্থক। 'রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি' এবং 'স্বসংবিদানন্দ চর্বণব্যাপারঃ'; আর পাশ্চাত্যের Poetry is ever accompanied with pleasure···There are two kinds of pleasure, one durable, universal and permanent, the other transitory and particular

শেলী)— প্লেটোর সিম্পোসিয়ামের earthly aphrodite এবং heavenly aphrodite-র প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের আনন্দতত্ত্বও সীমিত ও অসীম, প্রয়োজনের ও প্রয়োজনাতীত। দেশ-বিদেশের সুন্দর ও মঙ্গলবোধ এব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এবং এই দিক থেকেই কাব্য-সাহিত্যের বিচার ও কাব্য-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। ধাপে ধাপে এগিয়ে তাঁর এই দার্শনিক আনন্দ স্পর্শ করেছে উপনিষদের আনন্দতত্ত্বকে। সাহিত্য তখন তাঁর কাছে অসীমের প্রতিভাস, কাব্য সচ্চিদানন্দের প্রকাশলীলা। এর ফলে, সমালোচনার পরিধি-বিস্তার হয় বটে, কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ জীবনকে অস্বীকার করারও সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। আশার কথা, এই অধ্যাত্ম আলোকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যতত্ত্বকেই প্রকটিত করেছেন মুখ্যতঃ; একমাত্র আধুনিক কাব্যের ওপর গুটিকয়েক প্রবন্ধ ছাড়া অন্যত্র গ্রন্থালোচনায রত হননি।

রবীন্দ্রসমালোচনার বৈশিষ্ট্য তার বৈচিত্র্যদানে, উন্নতিবিধানে। ওদেশের ব্যক্তিসাক্ষিক ছায়া-আলোচনা এবং এদেশের নৈর্ব্যক্তিক রস-আলোচনা এই দুই রীতিপদ্ধতির সম্পূর্ণ স্বাঙ্গীকরণে বাংলা সমালোচনাকে বহুভূজ এবং সব্যসাচী করে তুললেন তিনি। ক্রম-অভিব্যক্তির পথে 'সাহিত্য' গ্রন্থে বস্তুসহচর মনস্তত্ত্ব, 'প্রাচীন সাহিত্যে' কবিকল্প রোমান্টিক আকুতি, 'সাহিত্যের পথে' আধ্যাত্মিক আত্মস্থিতি, আর 'আধুনিক সাহিত্যে' নতুন মূল্যসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয। তাঁর সমকাল থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যাগুরু সমালোচকদের বিচারপদ্ধতি তাঁরই অন্যনিরপেক্ষ অনুসরণ।

পাশ্চাত্য রোমান্টিকতার ঘনিষ্ঠতম সাহচয সত্ত্বেও বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সমালোচনায় ধীরে ধীরে প্রাধান্যবিস্তার করেছে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রও। রসতত্ত্ব, রসব্যাখ্যানকে বড় আসন দিয়েছেন ভারতমুখী রবীন্দ্রনাথ; তথ্য থেকে পৌঁছেছেন সত্যে, রোমান্টিকতা থেকে আধ্যাত্মিকতায়। এমন কি প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত প্রাচ্য আলংকারিদের নিতান্ত সহজে স্বীকার করেছেন: 'আমি এ প্রবন্ধে কাব্যে অশ্লীলতা নামক দোষ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করলুম এই কারণে যে সে মত প্রাচীন হলেও অ-নবীন নয়।' এই প্রচেষ্টারই অন্য এক ধারার প্রকাশ দেখা গেল পণ্ডিচেরীর বিচিত্রজটিল ধর্মমননে—'শিল্প অর্থ কি? সত্যের সুন্দর অভিব্যক্তি। ভগবান হলেন সত্যতম সত্য, সুন্দরতম সৌন্দর্য। ভগবানের অভিব্যক্তি শিল্পের পরাকাষ্ঠা' (নলিনীকান্ত গুপ্ত) এবং

'শিল্প আবার অন্তঃপুরুষের জন্য, আত্মার জন্য—সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে, তার ভিতর দিয়ে অন্তঃপুরুষ, আত্মা যা গড়তে চায় সে সকলের প্রকাশের জন্য' (শ্রীঅরবিন্দ)।

নতুন করে অলংকার ও কাব্যশাস্ত্র পঠন-পাঠনের লক্ষণও দেখা গেল এই সময়, সেই নিরিখে নতুন করে কাব্যবিচারও। তারই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে দেখা দিল ডঃ সুশীল কুমার দের Studies in Sanskrit poetics, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা', ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্যবিচার', ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের 'ধ্বন্যালোক'। এঁরা অনেকেই প্রাচীনমুখী ; প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অলংকারশাস্ত্রের সূত্রকে আজকের প্রয়োজন অনুসারে সমন্বিত করে সামগ্রিক কাব্যতত্ত্ব বা বিচারের মানদণ্ড এঁরা সৃজন করেন নি। সে চেষ্টার লক্ষণ আছে ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যালোকে'।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র ও ভাগবত সাহিত্যের এই পুনর্জীবন-লাভের রহস্য 'রিভাইভ্যালিজমের' ঐতিহাসিক কার্যকারণের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু সে-কথা এখানে নয়।

আধুনিক বাংলা সমালোচনা

ইতিহাসের পট ও ভূগোলের ভূমিতে ব্যক্তির ভূমিকা। এই তিনের সুসমঞ্জস যোগাযোগে সাহিত্য-শিল্পের রূপ ও রূপান্তর, স্থিতি ও গতি, সৃষ্টি ও সমালোচনা। জীবনের ঋতুবদলে সাহিত্যের পালাবদল। তখন বদলে ফেলতে হয় সমালোচনার দৃষ্টিকোণ ও রীতিপদ্ধতিকেও। তাই প্রাগাধুনিক কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক সমালোচনার সাদৃশ্য সামান্যই।

গ্রীক পোএটিকস ও ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র সাহিত্যের উচিত-অনুচিত কর্তব্যের নির্দেশিকা, তত্ত্বনির্ভর অনুশাসন, বৈয়াকরণ বিশ্লেষণ। সাহিত্যের সটীক বিচার বা আস্বাদনের ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রকে প্রয়োগ করা হয়নি, যেমন হয় আধুনিক কালে। এই টীকা-ভাষ্য-কারিকাব ধ্রুপদী রীতি থেকে ইংরেজী সমালোচনা মুক্তি পেল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে। ওঅর্ডসওঅর্থের Preface to Lyrical Ballads তার একটি আরম্ভরেখা। ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে এর আগে থেকেই নব্য-রীতির ধারাপাত; আমাদের দেশে, উনবিংশ শতাব্দীতে; সুষ্ঠু ও আদর্শ রূপ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রকে একেবারে ত্যাগ না করতে পারলেও পাশ্চাত্য বিচারপদ্ধতিকেই তিনি স্বীকার ও স্বকীয় করেছেন। তার দুটি সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠল : একদিকে, নির্দিষ্ট শৃংখলিত সূত্রধার আরোহী আলোচনা ; অন্যদিকে, কাব্যপাঠান্তে উচ্ছ্বসিত রসোপলব্ধির অবরোহী আলোচনা তথা আস্বাদন। নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ—উভয় সমালোচন-রীতির ভিত্তি স্থাপিত হল বঙ্কিমী সংস্কারযুগে। ববীন্দ্রনাথ এই দুটি রীতির মধ্যে ঐক্য আনলেন : যুক্তিতে এল আবেগ, দৃষ্টিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবনা-ভংগির নিবিড় একতা ; চিত্তের একই মহলে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব আর সানন্দ-নন্দনী-রসবাদী কাব্যতত্ত্ব। তাঁর নিরপেক্ষ সমালোচনা নিতান্ত সংখ্যালঘু ; অধিকাংশই আন্তবরসে রসায়িত ব্যক্তিসাক্ষিক সমালোচনা, কাব্যের বিচারণায় নবমূল্যায়ণ—অনুপম new creation। আধুনিক বাংলা সমালোচনার ইমারৎ গড়ে উঠল রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতিযুগে।

[এই দুই যুগের সমালোচনার বিস্তৃত ইতিহাস ও তত্ত্বনির্ণয় পূর্ব প্রবন্ধে করেছি। অতঃপর আলোচ্য প্রবন্ধের সীমান্তরেখার সুরু]

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যখন একটি কি দুটি সহজ-সুন্দর পথ তৈরী হয়ে যায়, তখন বেশ কিছুদিন ধরে চলে সেই রাজপথ-পরিক্রমা। এদিকে জীবনও অগ্রসর হতে থাকে নিজের নিয়মে; সাহিত্যের আসরে জমায়েৎ হয় নতুন শিল্পী, নবীন শিল্প, নব্য কলা। তখন আবার বহুপথ ও তার মধ্যে থেকে নবতর পথের অনুসন্ধান। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে পথ তৈরী করে দিলেন, সমকালীন ও পরকালীন সমালোচকবৃন্দ চললেন তার ওপর পা ফেলে-ফেলে, সেই সঙ্গে স্বকীয় পদচিহ্ন এঁকে এঁকে। প্রিয়নাথ সেন, অজিত চক্রবর্তী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই ধারাকে বহন করেছেন। রবীন্দ্রযুগে স্বীয় রীতিতে সবচেয়ে উজ্জ্বল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী। দুজনেই সত্যশিবসুন্দরের উচ্চবিত্ত উপাসক, আত্মলীন সৃজনলীলার পূজারী ও নন্দনতাত্ত্বিক রসমুখী সমালোচনার নিষ্ঠাবান মালাকর।

কলাকৈবল্যবাদী অবনীন্দ্রনাথের মনোভাব ফুটে ওঠে 'শিল্পায়নের' ভূমিকায়: 'স্বপক্ষ সমর্থন করতে আমি একটুও চেষ্টা না করে সেই অল্পসংখ্যক পাঠক যাঁরা জানতে চান শিল্পকে, তাঁদের দরবারে পেশ করছি এই সমস্ত চিন্তা।' তাঁর সমালোচনার সৃষ্টি প্রচুর নয় কিন্তু দৃষ্টি মধুর: 'শিল্পবুদ্ধি ও রসবোধের দ্বারা চালিত হচ্ছে যে মানুষের দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সেই শিল্পী নাম পেলে শিল্প-রসিক বলে বলা চলল তাকে।' শুধু শিল্পের আধারে নয়, তাঁর সূক্ষ্মসন্ধানী সুন্দরের দৃষ্টি সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রকেও আলোকিত করেছে। ব্রত তথা লোকধর্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিচারণার সূত্রপাত তাঁর তন্বী গ্রন্থে; যেখানে শুধু অনুষ্ঠানের দিক নয়, সৃষ্টি সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য অপূর্ব: 'কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতিকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্যনৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা।' ভাষা ও প্রকাশভংগির ক্ষেত্রেও তিনি এনেছেন অভিনবত্ব—'সংকীর্তিত ও সংচিত্রিত ভাষা।'

'সবুজপত্রের' মুখপত্রের ধুয়া ছিল 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা।' প্রাণশক্তি ঋজুতা ভারতীয় রসবোধ ফরাসী মেজাজ, সবার ওপর উচ্চচূড় ইন্‌টেলেক্‌ট্‌ মিলিয়ে প্রমথ চৌধুরীর মনের ও মননের গঠন। বিশ্লেষণী সমালোচনায় তাঁর

অনীহা, অথচ তাঁর মত বিশ্লেষণক্ষমতা আবেগমুখী বাংলা সাহিত্যে অসুলভ: পরিচ্ছন্ন মন, শৃংখলিত যুক্তিধারা, সহৃদয় রসবাদ, অজড় অদীন প্রকাশ; ক্লাসিক-প্রীতি সত্ত্বেও নির্মোহ আধুনিকতা; প্রত্যয়ে কলাকৈবল্য-বাদী, প্রকাশে নিখুঁত কলাকার; ভাবে বহুশ্রুতত্ব, ভাষায় চাবুক। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা যেমন খাঁটি শিল্পের, ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম্‌-এর, প্রমথ চৌধুরীর ভাষা তেমনি খাঁটি গদ্যের, রিএলিজ্‌ম্‌-এর—রীতিরাত্মা তাঁর সাহিত্যের। তাঁর দৃষ্টি ছিল আর্টের অভিমুখে, দৃষ্টিকোণ ছিল সায়েন্সে অভিষিক্ত। তাঁর নীতি : the proper study of mankind is man; রীতি—of a conscious search for ordered beauty। তাই তিনি জীবনরসিক ও মননশীল। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও অন্নদা শংকর রায় তাঁর ভাবশিষ্য।

ডাউডেন বলেছিলেন—শেক্‌স্‌পীঅরকে যদি জানতে চাও, তাঁর থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে জগৎ-রহস্যের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে দেখো। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় অনেকটা এইভাবে সমালোচনা করতেন। কালক্রমে আসর আরও বড়ো হল, পট আরও বিস্তৃত হল, বিশ্লেষণ হয়ে উঠল গভীর ও ব্যাপক। এই তুলনামূলক বিচারণার প্রসার শশাংক মোহন সেনের 'বাণীমন্দির', 'বঙ্গবাণীতে'; কিন্তু পাণ্ডিত্য ও প্রসাদগুণ সর্বত্র মাধুর্য ও প্রসাধনের সহগামী হতে পারে নি। এইদিক থেকে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ অনেক প্রসাধিত। এই ধারাকে রসময়তা দান করেছেন মোহিতলাল মজুমদার। 'প্রবাসী'তে 'কবিকথা'য় ও পরে 'শনিবারের চিঠি'তে সাহিত্য সমালোচনার মূলসূত্র ও কাব্যতত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁর লক্ষ্য ছিল : 'সকল কালের সাহিত্য হইতে সাহিত্যের স্বরূপ ও স্বধর্মকে উদ্ধার করিয়া উদার রসবোধে প্রতিষ্ঠা করা।' তাঁর সাধ্য—আস্বাদ্যতে ইতি যে রস, তাই; সাধন—শব্দ ছন্দ অলংকাররীতির বিশ্লেষণ; সাধনা—"জাতির জীবনের বেলাভূমি হইতে রসের আদান-প্রদানই সাহিত্যের সত্য-সাধনা।' সেই সত্যকে তিনি দেখেন বঙ্কিম-নায়কত্বে, রবীন্দ্রব্যক্তিত্বে নয়। কারণ সমালোচনার দৃষ্টিভূমিতে তিনি নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে মনে করতেন। তাঁর সমালোচনার কেন্দ্র সীমিত কিন্তু পরিধি বিস্তৃত, গভীর ও নির্ভীক, যুক্তিনিষ্ঠ ও আবেগ-কল্পিত। সুশীল কুমার দে-র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত ঐতিহাসিক, বাগভংগি সহজ। 'নানা নিবন্ধ' ও 'দীনবন্ধু মিত্র'-র প্রাবন্ধিক

বাঁধুনি দৃঢ়পিনদ্ধ না হলেও সরলতায় ব্রাণ্ডিস্-মারিঅটের রচনাকে স্মরণে আনে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনারীতি শিল্পশাস্ত্রসম্মত, বিশ্লেষণ ভাবাবেগ-বিরহী, ভাষা ওজনে ভারী। সুবোধ সেনগুপ্তও এই পথের অনুগামী, ভাষার ওজন অনেক কম।

আলোচ্য পর্যায়ের সমালোচকবৃন্দ মূলত শাস্ত্রানুগামী। ষ্টপফোর্ড-ব্রুকের মত এঁরা সাহিত্যিকের ভাবজীবনের আলোচনা করেন, লেগুই-কাজামিআঁর ধরণে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে রত হন, মুলটন-রিচার্ডস-কম্প্‌টন-রিকেট প্রভৃতির সমরেখায় বিচারের মানদণ্ডটি তীক্ষ্ণ ও সজাগ রাখেন। ইতিহাস অপেক্ষা ভাবজীবন তথা মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্য-রচনার দিকেই এঁদের প্রবণতা বেশী। ক্রমে, আরও অনেক দিকে আমাদের সমালোচনা ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটির উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য।

কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার পটভূমিকায় কোলরিজ-ওঅর্ডস্ওঅর্থের কবিমানস ও কাব্যের মূল্য নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন হাজলিট। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রবন্ধে এই রীতির সমাবেশ দেখা যায়; মোহিতলালেরও। 'সব পেয়েছির দেশে,' 'কল্লোল যুগ', 'চলমান জীবন' ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য! শারীরিক সংস্থানের দিক থেকে মানসিক বিন্যাসের বিচার নৃতাত্ত্বিক রীতি। এই রীতিটি সাহিত্যিক বিচারণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন প্রমথ নাথ বিশী 'চরিত্রচিত্র' ও (শশাংক মোহন সেনের অনুসারী) 'শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে। প্র. না. বি. যখন দৈহিক রেখা গণনা করে কবিচিত্তের ভাগ্য নির্ণয় করেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত তখন ভৌগোলিক পট-সীমায় কবিচিত্তের অসীমতার সন্ধান করেন। তাঁর মতে, বাইরণ-উপম নবীন চন্দ্র সেনের ঢেউখেলানো মনটি চট্টলের দান। কারণ,—'কবি চোখ মেলিয়া একদিকে দেখিয়াছেন শুধু উচ্চশির পাহাড় পর্বতের লীলা—অন্যদিকে দেখিয়াছেন সীমাহীন সাগর অন্তরাবেগে সে শুধু উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে।' হাক্সলিও বলেছিলেন, ওঅড্‌স্ওঅর্থ যদি উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসী হতেন, তবে তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি জাতমাত্র গলদ্ঘর্ম হত; তিনি দেখেছেন যে প্রকৃতিকে, সেখানে—Europe is well so gardened that it resembles a work of art, a scientific theory, a neat metaphysical system।

কিন্তু আলোচ্য সমালোচকবৃন্দ কেবল যে এই এক একটি একমেব মানদণ্ডেই সাহিত্যের বিচার করেছেন, তা নয়। এগুলি এক-একটি স্ফুলিঙ্গ। প্রাচ্য-

পাশ্চাত্য অলংকারশাস্ত্রের সমবায়ে, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সমাবেশে, রসবোধ ও যুক্তিশৃংখলার সমন্বয়ে, শিল্পশাস্ত্রবোধ ও মননশীলতার সমাহারে এঁদের সমালোচনা বিচিত্রগামী ও সংহতরূপ। এবং আজকের সমালোচনা-রীতির এই প্রবাহটিই মেদবহুলা। হরপ্রসাদ মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী, রথীন্দ্র-নাথ রায় প্রভৃতি এই ধারার সমালোচক।

বঙ্কিমী আমলের যে আস্বাদনমূলক সাপেক্ষ আলোচনাকে রবীন্দ্রনাথ পরিণত করলেন অনুপম ব্যক্তিগত প্রবন্ধে, তাকে আর ফিরে পাওয়া গেলনা পরবর্তী কালের বহুবিচিত্র নিবন্ধে। কিন্তু এর সগোত্র আর একটি রীতি আত্মবিকশিত হল বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায়।

উনবিংশ শতাব্দীর যে ঐতিহ্য এতদিন বয়ে চলেছিল বাঙালীর জীবনে ও মননে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় তাতে ফাটল ধরল। চলমান জীবনের জোড়াতালি-দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ভেঙে পড়ল, মধ্যবিত্তের পায়ের তলাকার মাটি সরে যেতে লাগল, বদল হতে থাকল বেঁচে থাকার মুল্যমান, সেই সঙ্গে চিন্তা ও চেতনাও। একদিকে সাগরপারের মানুষদের সঙ্গে আত্যন্তিক ব্যবধান রচিত হল, অন্যদিকে ওপারের জ্ঞান-বিজ্ঞান দৃষ্টি-সৃষ্টির ঢেউ এপারে এসে মনকে দুলিয়ে দিল।

রবীন্দ্রযুগের পাশাপাশি আর একটি যুগ-কণিকা দেখা দিল—তার নাম 'কল্লোল যুগ।' প্রগতির আবর্তে কল্লোলীয় সাহিত্য নতুন ভাব-ভাষা-ভংগি নিয়ে আবির্ভূত হল। সেই সঙ্গে নতুন সমালোচনাও কল্লোলিত হয়ে উঠল। আলোচ্য ধারার সমালোচকগণও সকলেই কবি-সাহিত্যিক। সাপেক্ষিকতা ও কলাকৈবল্যবাদের যোগে ব্যক্তিতান্ত্রিক সাহিত্যব্যাখ্যা এঁদের বিচারপদ্ধতি, তার মূল ভিত্তি ব্যক্তিগত ভাললাগা-মন্দলাগা। এঁদের সাহিত্যতত্ত্ব যুক্তি আশ্রয়ী নয়, ভাবাশ্রিত, সমালোচনা ততটা নয় যতটা কাব্যতত্ত্ব। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'আমি যখনই কোনো মতকে সত্য বলে মনে করি, তখনই মনে করি যে তা সকলের পক্ষে সত্য।' অবন ঠাকুরের তুলিতে—'আমার নিজের চোখে অনন্যসাধারণ সুন্দর ঠেকল যা তা অন্যের কাছে অসাধারণ রকমের অসুন্দর যদি ঠেকে তবে দোষ দেব কাকে?' এখন বুদ্ধদেব বসু বললেন: 'If I cannot make the reader…share the pleasure with me, I can at least hope he may be persuaded to recognise the validity of my experience, though not drawn to the experience

itself' (An Acre of Green Grass)। ভাব-রীতির দিক থেকে এঁরা এলিঅট, এজরা পাউণ্ড, সি ডে লুই, স্পেণ্ডার, অডেন-দের সমানধর্মা। প্রকাশের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। স্বকীয় কবিহৃদয় ও স্বীয় সাহিত্যধারণা থেকে আত্মবোধাশ্রয়ী সাহিত্য-সন্দর্শন ও সাহিত্যদর্শন এবং সেই মানদণ্ডে সাহিত্যপাঠ তথা বিচার তথা আস্বাদন তথা তত্ত্ব। সজাতীয় পাশ্চাত্য কবি-সমালোচকদের মতো এঁদের রচনাতেও সর্বজনীন সাহিত্যিক সত্যের বিবৃতি ইতি-উতি প্রকাশিত। যেমন জীবনানন্দ দাশের : 'জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার সংজ্ঞাকে নিয়ে আসতে পারা যায় তত তাকে শিল্পপ্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব।' এই জীবনের সংজ্ঞা 'কল্লোলযুগে'—'যে মহৎ শিল্পী তার কাছে সমাজের চেয়ে জীবনই বেশী অর্থান্বিত।' এই পদ্ধতির সমালোচনা অনেকটা আত্মীয় প্রবন্ধ। মন্ময় দৃষ্টিপাতে দ্বৈপায়নী স্বাতন্ত্র্য, যার সূত্র—the recollection of my own pleasures। অবশ্য এ সূত্র সকলেরই নয়। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বলিষ্ঠ জিজ্ঞাসা : 'অনুচ্চারিত জীবন-সমষ্টিকে ভাষা দিয়ে চিরকালের জন্যে সঞ্চয় করে রাখা সাহিত্যেরই একটা দায়িত্ব নয় কি ?'

এরই পাশাপাশি আর একটি ধারাকে সমালোচনার স্রোতে ভাসমান দেখা যায়—ফ্রএডীয় বিশ্লেষণপদ্ধতি। অবদমিত যৌনবাসনার উদ্বর্তিত রূপই সাহিত্য-শিল্প—এই নীতিপথে দেশকালনিরপেক্ষ বাসনাকামনার অদীপ আলোকে কবি-প্রতিভার বিচার একদা বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রাধান্য লাভ করেছিল। জীবিত-মৃত বহু পত্র-পত্রিকায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই রীতির একটি চরম উদাহরণ প্রমথ পালের 'শরৎসাহিত্যে নারীচরিত্র' ; সুস্থ বিশ্লেষণ নন্দগোপাল সেনগুপ্তের প্রবন্ধাবলীতে। 'লিবিডো'-ভিত্তিক বিচার ক্রমেই মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় পরিণত হতে থাকে, এবং পূর্বোক্ত প্রবাহদুটির সঙ্গে তার মিশ্রণও হতে থাকে। সংস্কৃতির (বিশেষত মিথ্-এর) সমাজগত যৌনমনস্তত্ত্ব-মূলক বিশ্লেষণের যে পথ ও পদ্ধতি সি. জি. ইয়ুং-এর সন্ধিৎসায় রূপ পেয়েছে, তার অনুগমন বাংলা সাহিত্যে একান্তভাবে অনুপস্থিত।

যুদ্ধোত্তর ভাবনার আকাশে আর একটি নতুন ধারা আত্মপ্রকাশ করল—ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ। শিল্পশাস্ত্রের সূত্রপথে বিচার নয়, অন্যনিরপেক্ষ কবিপ্রতিভার স্বরূপ-নির্ধারণ নয়, নিজস্ব ভাললাগা-মন্দলাগার মাপকাঠিতে

রসবিচার নয়—শিল্প ও শিল্পীকে সমকালীন পারিপার্শ্বিক দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের অন্যতম উপাদান বলে গ্রহণ করে ঐতিহাসিক বিচারণা। এই ধারার সমালোচকের মতে, সাহিত্য সমাজের ফল; অতএব সমালোচনার উদ্দেশ্য হবে সমাজমুখী, সাহিত্যের সামাজিকতার মূল্য ও পরিমাণ নির্ণয়। শ্রেণীসংঘাতমুখর ইতিহাসের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলেছে সাহিত্য; সেই ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের উৎস সন্ধান করতে হবে। প্রথম অনুসন্ধিৎসু বোধহয় সুধীন্দ্র নাথ দত্ত। পরিচয়, অগ্রণী, নতুন সাহিত্য ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে এই রীতির আবর্তিত বিবর্তন।

ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটে বাঙলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিচার সুরু করেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতি ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। 'লোকসাহিত্য' ও 'সাহিত্য' (সাহিত্যসৃষ্টি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) দ্রষ্টব্য। তাঁরই মুখে শোনা—'সংসার মুখে যাই বলুক, মুক্তি চায়না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল। তাই শক্তি যখন সকলকে শোষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল।' এই যে 'তখনকার কাল' দিয়ে 'তখনকার সাহিত্য' বিচার—এ ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক রীতিরও মূলকথা। তথাপি দুয়ে অনেক প্রভেদ; উভয়ের নিশানা এক হলেও নিশান আলাদা। আধুনিক ঐতিহাসিক সমালোচক মার্কস-এঙ্গেল্‌স-লেনিনের ব্যাখ্যাত সূত্রকে অবলম্বন করে, কড্‌ওএল, এরেনবুর্গ প্রভৃতির অনুসরণে এই রীতির অনুশীলন ও প্রয়োগ করেন। বিমলচন্দ্র সিংহ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নীহার রঞ্জন রায়, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ রায়, শিবনারায়ণ রায়, অরবিন্দ পোদ্দার প্রভৃতির লেখনীমাধ্যমে ঐতিহাসিক সমালোচনা-পদ্ধতি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ক্রমেই সুষ্ঠু রূপ লাভ করতে থাকে। আবার ব্যর্থ অনুকরণও অনেক ক্ষেত্রে—যেখানে ঝাঁজটা ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের, কিন্তু আস্বাদ শিল্প তথা রসবাদের, কিংবা শূন্যবাদের। একেবারে শেষেরটির উদাহরণ—গুণময় মান্নার 'রবীন্দ্রনাথ'।

সাময়িক পত্রের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সমালোচনার ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত, আধুনিক সমালোচনার আবির্ভাব পত্রিকাবাহনে। ঊনবিংশ

শতাব্দীর সেই ঝড়বাদলের দিনে আলোর রেখার মত নানা নতুন উদ্যম দেখা দিতে থাকে। 'ক্লব', 'সোসাইটি' তাদের অন্যতম। এইসব জায়গায় মাঝে মাঝে সাহিত্যালোচনা হত; পঠিত প্রবন্ধগুলির লিখিত রূপ সাময়িক পত্রে বিধৃত হত। সাগরপার থেকে ভাসিয়ে-আনা বিদেশী বইগুলির সটীক ও সমূল্য তালিকা ইংরেজী কাগজে নিয়মিত বিজ্ঞাপিত হত। তার অনুকরণে, প্রাথমিক স্তরের বাংলা সাময়িকী সমালোচনাও ছিল গ্রন্থপরিচিতির তুল্য: 'ভারতবর্ষীয় বর্তমান গ্রন্থকারকুলের কল্যাণ সাধনাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য' (কা. প্র. সিংহ)। সমালোচক তখন 'সাহিত্যের সংবাদদাতা'। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণের সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সমালোচনার বিরোধী ছিলেন; কারণ—'গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি।' কিন্তু অনিচ্ছা স্থায়ী হতে পারেনি। ১২৭৯ সালের কার্তিক মাস থেকে বঙ্গদার্শনিক রিভিয়্যু রসের পরিবেষণা সুরু হল। দুটি নমুনা আস্বাদন করা যেতে পারে:

'বীরাঙ্গনা উপাখ্যান' সম্পর্কে—'এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কয়েকটি কাব্যেতিহাস কীর্তিত, এবং কয়েকটি আধুনিক স্ত্রীলোকের চরিত্র সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।' ......'কাব্যমালা' সম্পর্কে—'কাব্য মিষ্টান্নের ন্যায় অখণ্ড মধুর। এই মিঠাইয়ের ময়রা কে, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে তাঁহার দোকানে কখন যাইব না। তাঁহার দ্রব্যগুলিন্ একে তেলে ভাজা, তায় বাসি।'

বুক রিভিয়্যুর প্রথমকালের এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে প্রচার-বান্ধব-ভারতী-সাধনা সবুজপত্রে বিচিত্র বিস্তৃতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ-পরিচিতিকে আরও সাহিত্যিক করে তুললেন। সেই পথেই পুস্তক-পরিচয়ের ক্রমিক আত্মপরিচয়। কোথাও সামান্য সটীক উল্লেখ, কোথাও ভালমন্দের একটু লিপিলেখ থেকে বিস্তৃত আলোচনার প্রসার। ইঞ্চি আর কলাম্ মেপে 'সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট, নিষ্প্রমাদ মুদ্রণ, ছাপাবাঁধাই সুন্দর,' অথবা স্পেস্ মেক্‌আপার্থে কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি কি কাব্যোক্তির রীতি এখন বিগতযৌবনা। আবার সার্থক সমালোচকের হাতে গ্রন্থবার্তা সাহিত্যও হয়ে ওঠে, যা মনকে দুলিয়ে দেয়, যা রমণীয়—চেষ্টারটন, প্রিস্টলী, বেনেট কি হিলেরী বেলক্-এর রূপরেখামনোহর সাংবাদিক প্রবন্ধের মত।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় একটি কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাংবাদিকতা অনেকটা অটোক্র্যাট; তার কবলে পড়ে সাহিত্যের যে রূপান্তর ঘটে, তা তার

সত্য রূপ নয়। সাময়িক পত্রধৃত সমালোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু তার দাবি মেটাতে 'রম্য সমালোচনা'র আবির্ভাব অনভিপ্রেত। কম্‌প্‌টন-রিকেটের বকলমে—The literature of today is like the young lady of Riga who went for a ride on a tiger. Journalism is the tiger, and the two should ever prove good friends.. They returned from the ride with the lady inside, and a smile on the face of the tiger! আমাদের সমালোচনা তথা 'সাহিত্যবিদ্যাবধূর' এই আকাংক্ষা যে জাগে নি তা নয়, কিন্তু তা যাতে সীমা না অতিক্রম করে,সেদিকে সমালোচকের সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

এই হল বাংলা সমালোচনার স্থচীপত্র। তার কথাশরীরের ইতিহাস বিরাট ও বিচিত্র, বিভিন্ন রীতির মধ্যে সামান্য সাদৃশ্য ও তীরকাঠির ব্যবধান। সাদৃশ্য কোথাও ঐক্যমুখী, কোথাও ব্যবধান বিপরীতমুখী। আধুনিক বাংলা সমালোচনার ঐশ্বর্য এখানে, আবার সমস্যাও এখানে।

সদ্য আলোচিত রীতিগুলিকে দুভাবে শ্রেণীবিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, প্রকৃতির দিক থেকে। এজরা পাউণ্ড দুটি শ্রেণীনির্ণয় করেছেন: 'লিটারেরি' ও 'আকাদেমিক'—ভাববাদী সাহিত্যিক সমালোচনা ও গবেষণামূলক অধ্যাপকোচিত সমালোচনা। প্রথমটিতে, ব্যক্তিগত কাব্য বা শিল্পবোধ ও দার্শনিকতার প্রশ্রয়ে রস-আলোচনা; দ্বিতীয়টিতে, সাহিত্যতত্ত্ব বা শিল্পদর্শনের আশ্রয়ে সূচীবদ্ধ বিচারণা। একটিতে ব্যক্তির স্বাক্ষর, অন্যটিতে বস্তুর সাক্ষ্য। বলা বাহুল্য, কবি-সমালোচক পাউণ্ডের রায় কবি-প্রবন্ধের সপক্ষে।

নীতি বা দৃষ্টিভংগির বিচারে বাংলা সমালোচনাকে আর একভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। প্রথম, রসমৌল কলাকৈবল্যবাদী সমালোচনা; দ্বিতীয়, যুক্তিনিষ্ঠ শিল্পশাস্ত্রবাদী সমালোচনা; তৃতীয়, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সমালোচনা। কলাকৈবল্যবাদী আত্মঅনুভূতিনির্ভর ছায়া বা রস-সমালোচনার অনুরাগী; শিল্পশাস্ত্রবাদী শাস্ত্রীয় সূত্র অনুসরণে বিশ্লেষণের পক্ষপাতী; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ইতিহাসের বাস্তব কার্য-কারণের ভিত্তিতে বিচারণায় বিশ্বাসী। প্রথম দুই ধারার আলোচনায় সমাজ জীবনের ইতিবৃত্ত উল্লিখিত হলেও শিল্পী ও শিল্পকে অনন্যপরতন্ত্র বলে মেনে নেওয়া হয়; শেষ ধারার আলোচনায় শিল্পী ও শিল্পের অনন্যত্ব উল্লেখ করেও উভয়কে বহুবচনান্বিত সামাজিক শক্তির স্ফুলিংগ বলে মনে করা হয়।

[সাংবাদিক সমালোচনাকে একটি স্বতন্ত্র রীতি রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সে কেবল ভংগি ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে। ভাব ও দৃষ্টির বিচারে, এগুলি

ওপরের তিনটি রীতির কোন-না-কোন একটির আওতায় পড়ে, সুতরাং স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।]

আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতির প্রায় সবগুলিই বাংলা সাহিত্যে অনুশীলিত হয়েছে। কতকগুলি বাতিল হয়ে গেছে, কতকগুলি আমরা অতিক্রম করে এসেছি, কতকগুলির অনুশীলন করছি; এবং সকলের রূপ মোটামুটিভাবে উল্লিখিত তিনটি শ্রেণীতে সংহত হয়েছে বলা যেতে পারে। এদের আবার নানা উপশ্রেণী, সমালোচক-ভেদে বৈচিত্র্য-পার্থক্য স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। ফলে, একই গ্রন্থের বিচিত্রগামী ও বিভিন্নমুখী, এমনকি বিপরীত সমালোচনাও প্রকাশমান। এই অবস্থা যেমন চিত্তের সঞ্জীবতার লক্ষণ, তেমনি সমস্যার লক্ষণাও। কেউ কেউ বলতে পারেন: থাক না সবগুলিই; একই বইয়ের ভিন্ন রীতির সমালোচনা চিন্তার খোরাক জোগাক পাঠকচিত্তে, ভাবের আন্দোলন দোলা দিতে থাকুক ভাবুক হৃদয়কে।

উত্তম ও সাধু প্রস্তাব। ব্যক্তি যখন স্বতন্ত্র, রুচি ও রসবোধ যখন বিভিন্ন, তখন নানাদিক থেকে সমালোচনা ভাবিয়ে তুলুক মনকে। বিশেষত যখন আজকের দিনের মানুষের ভাবনা একটা শ্রেণীবদ্ধ রেখার বাইরে সহজে যেতে চায় না। তার সামনে তৈরী হোক আরও কয়েকটি রাস্তা; সে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকুক, তুলনামূলক বিচার করুক; তারপর প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাক সেই পথে, যে পথে গেলে সে সবচেয়ে সুখী ও খুশী হয়। কিন্তু আমার বক্তব্য এদিক থেকে নয়।

যাকে জানতে চাই বুঝতে চাই তাকে সর্বাংশে সম্পূর্ণভাবে জানাই তো সত্য করে জানা। আলোচিত রীতিগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই আছে সত্যজ্ঞানের আভাস। তাদের স্বতন্ত্র কোঠারিতে বহুধা-বিভক্ত করে রেখে নয়, কাকেও বিয়োগ করে নয়, সবগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে তবেই সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের অভিমুখে অগ্রস্থতি সম্ভবপর হতে পারে।

সাহিত্য ব্যক্তির, বস্তুর, আবার শিল্পেরও; তাতে মন আছে, মাটি আছে, গড়নও আছে। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও শাস্ত্রঅনুগামী সমালোচনা এর একটি বা দুটিকে জানায়; মাটি তথা সমাজজীবনের সঙ্গে শিল্প ও শিল্পীর যোগকে ততটা পরিস্ফুট করে তোলে না। বাংলা সমালোচনায় বিজ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে ভাবাবেগের প্রাবল্য একটু বেশী; আলোচ্য রীতি দুটি সেই ভাবের আবেগকে আরও বেগবান করে তোলে। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক সমালোচনা (অন্তত এখনও পর্যন্ত এই

রীতিটি যেভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে) সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্পর্ক তথা সাহিত্যিকের পরিবেশ-নির্ভরতাকে পরিস্ফুট করে তুলতে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কার্যকারণ ও শ্রেণীসংঘাতকে যতটা প্রাধান্য দেয়, ততটা সমাজনৈতিক অন্যান্য বিষয় ও বিষয়ী সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে নয়। অপিচ সৃষ্টির উৎস সন্ধানে ও মূল্য নিরূপণে রীতিটি যতটা কুশলী, পাঠকচিত্তকে রসের গভীর অবগাহনে নিয়ে যেতে ততটা সক্ষম নয়। অথচ সাহিত্যরসের আস্বাদন (প্রাচীন নয়, আধুনিক অর্থে) তো কায়াহীন ছায়ামাত্র নয়, যেমন মাটি নয় আকাশের মত নিরুদ্দেশ। সাহিত্যের রসাস্বাদ পেতে চাই শিল্পের আধারে, সেই সঙ্গে চাই মনের সবুজ তাপ আর মাটির শ্যামলিমাকেও।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম সংস্করণ পাঠকালে রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়া : 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার যে আছে, তাহা আমরা জানিতাম না,—তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয় স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।' দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠান্তে : এই গ্রন্থের মধ্যে 'বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস আমরা দেখিতে পাইয়াছি।' 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সৃষ্টি নয়, ইতিহাস ; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ওই আস্বাদন-প্রক্রিয়াকে—যা থেকে কবি করলেন সমালোচনা, কবি-কাব্য-ইতিহাস মিলিয়ে অপরূপ বিশ্লেষণ। এই জানাই তো সত্য করে সমগ্রভাবে জানা—সামাজিক পট, সাংসারিক ভূমিকা, সৃষ্টিকৌশল, স্রষ্টার প্রতিভা সব মিলেমিশে কেমন করে হল সেই একটি অপূর্ব মালা। জানাতেও হবে এমনিভাবে। একদিকে যেমন 'All history must be studied afresh, the condition of existence of the different formation of society must be individually examined ; তেমনই অন্যদিকে মনে রাখতে হবে, man creates...according to the laws of beanty : 'রূপ ফোটানো এবং রস গছানো এই দুই কাজ হল শিল্পীর' (অবন ঠাকুর)। ইতিহাসকে জানতে হবে গভীর ও ব্যাপকভাবে, দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বালতে হবে সুন্দরের সন্ধানে : মাটি ফুল আর সেই ফুল যে গাছের।...অতএব ?

অতএব উল্লিখিত রীতিগুলিকে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে যোগ করলে সু-ফলশ্রুতির সম্ভাবনা। এক নয়, একাকার নয়, ঐক্যবদ্ধ ক'রে, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে যে সমালোচনারীতি পাওয়া যাবে, তা-ই সত্য ও সম্পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা হয়ে উঠবে। শুধু যোগ নয়, আরও কিছু।

ইতিহাস ও ভুগোল, সমাজ ও সংসার, দেহ ও মন, ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা, ধর্ম ও কর্ম, বাস্তব ও কল্পনা, প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞান, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, এক ও বহু—সব মিলিয়ে মানুষ: এই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের গোড়াকার কথা। সেই 'all-sided being' মানুষের রচনা সাহিত্য-শিল্প। তার সমালোচনাও 'all-sided manner'-এ হওয়া উচিত—শুধু উচিত নয়, নান্য পন্থাঃ। কারণ এইই বিজ্ঞানসম্মত 'sociological approach'—সমাজ বিদ্যার অনুগামী সর্বতোমুখী সমালোচনা। আগে তত্ত্বের কাঠামো তৈরি করে তার দ্বারা সাহিত্যের বিচার নয়; তাতে তথ্যের অনেকখানিই বাইরে পড়ে থাকে। আগে তথ্যের সমাবেশ, তারপর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ মাধ্যমে সেগুলির স্বরূপ নির্ণয়; মাপকাঠি হবে সর্বন্ধর সমাজবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান। এর মধ্যে সবাইকে ধরবে, সবই ধরবে। সৃষ্টিকালে অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ প্রাচীন-নবীন ঐতিহ্য-স্বকীয় আত্ম-সমাজ ব্যক্তি-বস্তু ইত্যাদি যতগুলি কার্যকারণ শিল্পের মধ্যে নিহিত হওয়া সম্ভব, সে সমস্তের সম্পূর্ণ বিচার এই সমাজতাত্ত্বিক বিচারণার মাধ্যমে হতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক এষণার পথে আজকের সমালোচনারীতির সমস্যার সমাধান: যেখানে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, আবেগ ও যুক্তির সমন্বিত মুক্তি, সত্যের সম্পূর্ণ ও স্বতঃ উদ্‌ঘাটন, কাল-কলা-কলাবিদের মাটি-মন-মূর্তির অসংশয়িত সমাহার। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রজ রবীন্দ্রনাথ। পূর্বোল্লিখিত তাঁর প্রবন্ধ দুটি এই সার্বিক রীতির দৃষ্টান্ত; তাঁর 'সমাজ' গ্রন্থের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' এই রীতিপদ্ধতির পথপ্রদর্শক। এবং এইখানেই প্রচলিত ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক আলোচনার মূলগত পার্থক্য।

এই পথ ধরে আলোচনা বাংলা সাহিত্যে সুরু হয়ে গেছে এবং আরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ মানস সাহচর্যে। শশিভূষণ দাসগুপ্ত, বিনয় ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতির সাম্প্রতিক গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মূলত ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই এই সমাজবিজ্ঞানী সমালোচনার মানদণ্ডটি প্রযুক্ত। আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরে এর প্রয়োগকলার যে পরীক্ষা চলছে, তাতে সাফল্য অদূরপরাহত।

ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক সমালোচনা এই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভিমুখে যেতে চাইছে; যাঁরা কলাকৈবল্যবাদী বা শিল্পশাস্ত্রবাদী তাঁরাও এর দিক

থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারছেন না। তার পরিচয় সম্প্রতিকালের বিভিন্ন সমালোচনায় আভাসিত। আজকের পথবাহুল্যের মাঝে এই ঠিকপথ নিরূপণের সমস্যা বাংলা সমালোচনাক্ষেত্রের সামনে। রসবোধ ও ইতিহাসবোধ, শিল্পী ও শিল্প, পরিবেশ ও আবেশ সব মিলিয়ে, সবাইকে নিয়ে সার্বিক সমালোচনার সত্যতম পথের মুখোমুখী আমরা। এখন নিজেকে জানা, পরকে জানা, পথকে চেনা ; তাহলেই জানতে পারব মানুষকে জীবনকে জগৎকে সত্যকে সমগ্রকে, নিজেকেও। সমালোচনা তো সাহিত্যের নয় সমাজের নয় শিল্পের নয় বিজ্ঞানের নয়, আসলে মানুষেরই : the proper study of mankind is man। সাহিত্য সমালোচনার মাধ্যমে আমরা সেই জীবনধৃত 'total' মানুষকেই জানি, যে মানুষ সামাজিক, মননশীল, আবার আত্মনিষ্ঠ রসিক শিল্পী। বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা আমাদের সেই কাব্য জিজ্ঞাসা তথা জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরলোকে পৌঁছে দিতে পারে, সুলভ করতে পারে সেই প্রতিভাকে, যাকে উদ্দেশ্য করে সোপেনহর একদা বলেছিলেন : Criticism is a rara avis almost as rare as the Phoenix which appears only once in five hundred years।

নাট্যকলা ঃ উৎস থেকে মোহনায়

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় তথা নাট্যকলার আয়ু প্রায় দশহাজার বছর।

মানুষের সৃষ্ট প্রথম শিল্প নীরব স্থিরচিত্র, দ্বিতীয় শিল্প গতিমুখর অভিনয়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ দুর্গম পাহাড়ের আঁধারঘন গুহায় পাথরের সাদা কাগজে বাটালি দিয়ে খোদাই করেছে পশুর দেহরেখা, শিকারের দৃশ্যপট। তারপর, তারও অনেকদিন পরে, আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে কৃষির পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারায় এল বৈপ্লবিক রূপান্তর। যাযাবর পুরুষ স্থাবর হল, ঘর বাঁধল, ঘরামি ও ঘরণীর মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠল গ্রাম, সমাজ, রীতি নীতি, নতুন মন, নবীন চিন্তা, নবতর সমস্যা। খাদ্য সংগ্রহের স্তর থেকে মানুষ উঠে এল খাদ্য উৎপাদনের স্তরে। জীবনের পালাবদলে জীবনসংগ্রামের ধারাবদল হল। এখন আর শুধু ফল আহরণ বা দ্বিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর অনিশ্চিত লড়াই নয়, এখন পশুপালন ও কৃষিকার্য—মাঠের সঙ্গে মুঠির লড়াই, শস্যের সঙ্গে মানবশিশুর। সে শস্যও আবার ফেরারী ফৌজ; অনেক মেহনত্ অনেক হেফাজৎ করে তবে ফিরিয়ে আনতে হয় পলাতক আসামীদের; তবেই গোলা ভরে ওঠে পাকা সোনার ধানে। অতএব এখন জানতে হবে প্রকৃতির খেয়ালী চরিত্রকে, ঋতুর রঙ্গলীলাকে, শস্যের ফলন-অফলনের রীতকানুনকে; তারপর দীর্ঘদিনের আয়াসে ও ত্রুটিহীন প্রয়াসে, প্রত্যাশায় ও প্রতীক্ষায়, পৃথিবীর গর্ভে বীজ থেকে জন্ম নেবে কচি প্রাণ, ধীরে ধীরে মাথা তুলবে বাতাসের বুকে ঢেউ তুলে।

কিন্তু শুধু এইটুকু করলেই তো হবে না। মাঠকে রিক্ত করে পালিয়ে যাওয়া মৃত শস্যকণাদের পুনর্জীবন দিতে হবে। তার জন্যে চাই আরও কিছু অনুষ্ঠান, চাই উন্নততর জাদু, যার নাম 'ব্রত' বা 'কৃত্য' (ritual)।

একদিকে যখন মাঠে চাষ হচ্ছে, অন্যদিকে তখন তারই পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হচ্ছে কৃষিব্রত ঃ শস্যদেবতার মূর্তি, ছবি অথবা প্রতীকের সামনে চলেছে বিচিত্র সচিত্র অনুষ্ঠান, মন্ত্রজাতীয় কিছু শ্লোক এবং চাষপালার নিখুঁত অভিনয়। মানুষই সেজেছে লাঙ্গল, ফলা, হলবাহী, চাষী, বীজ, শস্য। একদিকে কৃষির বাস্তব ক্রিয়া, অন্যদিকে তারই অনুকরণে কল্পিত ও পরিকল্পিত কৃষির

রূপক-অভিনয়—লাঙ্গলের মত মাটি কেটে চলা, বীজের মত ছড়িয়ে পড়া, শস্যের মত হেলেদুলে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি। সবই নাচ গান বাজনা ও অঙ্গভংগির সমবেত মাধ্যমে রূপায়িত এবং উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদিম মানুষের এই কৃত্য-ব্রত নিছক জাদুবিদ্যা মাত্র নয়, একটি বিশিষ্ট শিল্পকলাও। এখানে একই কৃত্যের আধারে একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের মত একত্রে মিলেমিশে রয়েছে সাহিত্য সংগীত নৃত্য বাদ্য চিত্র এবং নাট্য। এখানেই রচিত হয়েছে ধর্মের-শিল্পের-সাহিত্যের-দর্শনের জাতকপত্র, অভিনয়ের জন্মপত্রিকা। তাই নৃত্ত নৃত্য-নাট্য এই তিনটি শব্দেরই মূল পাওয়া গেছে একটিমাত্র শব্দে—'নৃতি'; এবং শাস্ত্রে এই নৃতির যে অর্থ করা হয়েছে, তার সঙ্গে আদিম কৃত্যাভিনয়ের লক্ষণগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পাওয়া গেছে।

কালপ্রবাহে এই কৃত্যাভিনয় রূপক ও প্রতীকের স্তর অতিক্রম করে পুরোপুরি নাট্যাভিনয়ের রূপ নিতে থাকে। তার মধ্যে নাটকীয় উপকরণের সবগুলি তখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই সময়কার কৃষিকৃত্যের গল্পটি চাষপালাব : আকাশ বা সূর্য হলেন পিতা, পৃথিবী মাতা ; দুজনে যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথবা মৃত, তখন পৃথিবী অন্নরিক্তা তিনি ভীষণা ; অনেক ব্যথা ও বাধা দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পেরিয়ে দুজনের মিলন ও বিবাহ হয়, মাতার কোলে জাত হয় শিশু-শস্য (পশুশাবক এবং মানবশিশুও) ; তখন পৃথিবী অন্নপূর্ণা তিনি সুন্দরী। এই মৃত্যু বা বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে উভয়ের যে পুনর্জন্ম ও পুনর্মিলন, তাই শস্যব্রত ও কৃষিকথা—অর্থাৎ দুই দেবতার বিবাহ-উৎসব ও বিবাহ-কথা, যার ফল কুমারসম্ভব ও এই কথা ও ব্রতকে কৃষক-কৃষাণী ফুটিয়ে তুলত অভিনয়ের মাধ্যমে। গ্রামের মোড়ল-মোড়লনী যথাক্রমে সূর্য ও পৃথিবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত, সমাজের আর সকলে থাকত অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের রূপসজ্জায়, কোথাওবা সকলেই সাজত নাম-ভূমিকায়। তারপর যথারীতি সুরু হত দ্যুস্-পৃথ্বী অথবা সূর্যসনাথা পৃথিবীর বিবাহ তথা বিরহ-মিলন তথা মৃত্যু-পুনর্জন্ম কথার শিল্পসম্মত অভিনয়—কোরাস গান আর কো-রাস নৃত্য।

এমনি পদ্ধতিতে শিকার, যুদ্ধ, বর্ষা নামানো, মারীরোধ ইত্যাদির প্রয়োজনে, জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে আদিম পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষ বিভিন্ন কৃত্যের ও অভিনয়ের প্রযোজনা করেছে। স্থানকালপাত্রভেদে সেগুলি কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও মূলত অভিন্ন এবং সকলের প্রয়োগ-কলাও প্রায়-সদৃশ।

তার প্রধানতম কলারীতি হল অনুকরণ (mimesis)। সজীব নির্জীব চেতন অচেতন যাকিছুরই রূপ গ্রহণ করা হত, তাদের চলন বলন ও গতিছন্দকে নিখুঁত অনুকরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হত। তার জন্যে রূপক-ময়তা অর্থাৎ যথাযথ রূপসজ্জার আয়োজন ছিল এবং অভিনেয় চরিত্রের (অর্থাৎ পশু পাখী শস্য লাঙ্গল প্রভৃতির) সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। নিরন্তর অনুশীলনে সমগ্র কৃত্যাভিনয়টি ধীরে ধীরে শিল্পরূপ নিতে লাগল; উন্নত হল পর্যবেক্ষণ-নির্বাচন-অনুশীলন—একা একা নয়, সমবেতভাবে; সচেতন নয়, অবচেতনে। তার প্রযোজক সমাজ, প্রয়োগক্ষেত্র কর্মজগৎ, ফলশ্রুতি—সমষ্টি-আবেগ (Collective emotion) জাগিয়ে সকলকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করা এবং কর্মসিদ্ধির পথকে প্রশস্ত করা। এই কৃত্যকলার নাট্যবস্তু হল 'উপকথা': প্রমথ-প্রমথিনী (spirits) তার কুশীলব, মূল রস বিস্ময় শোক ও মধুর, অনুগামী নৃত্য গীত ও বাদ্য; দ্বন্দ্ব তার প্রাণ, রঙ্গমঞ্চ কৃষিক্ষেত্র অরণ্য প্রান্তর গৃহপ্রান্ত, অভিনয়রীতি আহার্য আঙ্গিক বাচিক সাত্ত্বিক; এইসঙ্গে পটভূমি বা সেট্ হিসেবে মাটি আকাশ পথ গাছপালা ইত্যাদি যোগ করলে 'একপক্ষব্যাপী যাত্রার অনেকখানিই আমরা পাব।' অভিনয় তথা নাট্যকলার জন্ম এই আদিম যাত্রা তথা কৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে, অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সমকালে সমতালে।

অতঃপর শতাব্দীর সিঁড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হয়ে গেল ছবি ও গান, কথা ও কবিতা, নৃত্য ও নাট্য, ধর্ম ও শিল্প; বিবর্তিত হতে থাকল নাটক ও অভিনয়ের ধারা। আদি উৎসমুখে একদিন যারা এক মহাদেশ হয়ে ছিল, আজকের মোহনায় এসে তারা হয়ে উঠেছে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। উৎস থেকে মোহনা অনেক দূর-পথ, অনেক ঘুর-পথ। তবু এ নদী সে নদী একখানে মুখ। তাই অন্যান্য শিল্পের মত আধুনিক নাট্যাভিনয়েরও অবিচ্ছিন্ন যোগ রয়েছে আদিম কৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে, যেখানে 'কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া' (অবনীন্দ্রনাথ)।

শুধু মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হননি অবনীন্দ্রনাথ। 'বাংলার ব্রত' বইটিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিচিত্র ব্রতানুষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক বিশ্লেষণ করে এসম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। এছাড়াও প্রাগাধুনিক সাহিত্যে-শাস্ত্রে-বিচারণায় ছড়িয়ে আছে এই বিবর্তনের প্রমাণপঞ্জী।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে, লিপির প্রচলনে, কালের অগ্রগতিতে 'প্রস্তরযুগ' উপনীত হল 'সভ্যযুগে'। সমাজ বড় হল, জটিল হল, শ্রেণীবিন্যস্ত হল, জীবনসংগ্রামে এল অধিকতর নিশ্চিন্তি ও অবকাশ। যারা রইল কাজের মাঠে, তাদের মধ্যে সেই পুরাতন জীবন ও মানস অব্যাহত রইল—যার নাম 'লোকায়ত সংস্কৃতি'; যারা অবসরের ভেলায় চেপে সরে এল কর্মবিহীন অলস মন্দিরে, তাদের জীবনে ও মানসে নতুন রূপান্তর দেখা দিল—তার নাম 'অভিজাত সংস্কৃতি'। এখানে জাদুকৃত্য ও তত্ত্বকল্পনা রূপ নিল ধর্মের-দর্শনের-ধ্রুপদী আদর্শের, সাহিত্য-শিল্প নবীনত্ব লাভ করল; সবার মূলে রইল ধর্ম ও শাস্ত্রের বিবিধ বিধান; ধ্রুপদী আদর্শের ভিত্তিও এখানে। এই সময়কার নাট্যকলা সম্পর্কে সংস্কৃতি-সন্ধানী জেন হ্যারিসন বলেছেন: It was at the outset one and the same impulse that sends a man to the church and to the theatre। গ্রীক নাট্যাভিনয়-প্রাঙ্গনে দেবতার যথাবিহিত পূজা হত, সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেও দেববন্দনা অবশ্যকরণীয় অঙ্গ ছিল। অন্যপক্ষে ধ্রুপদী নাটকের ভিত্তি ধর্ম হলেও তার নিজস্ব কলারীতি গড়ে উঠেছিল, যার ফলে পুরাতন কাহিনী ও চরিত্র নবরূপায়িত হল, কল্পনা ও পরিকল্পনাব মিশ্রণে অভিনয় ধার্মিক হয়েও শৈল্পিক হয়ে উঠল।

ধ্রুপদী যুগের পর মধ্যযুগ। ধ্রুপদী নাটকের পাশাপাশি, কোথাওবা তাকে সরিয়ে দিয়ে প্রাধান্য পেল 'ধর্ম-নাটক'। খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ইউরোপে গীর্জার প্রাঙ্গনে অভিনীত হত মিস্ট্রি ও মর‍্যালিটি প্লে—অলৌকিক কাহিনী, খ্রীষ্ট ও সন্তজীবনী তার উপজীব্য। ভারতেও পুরাণভাবিত ভক্তি-লালিত নাটকের প্রাদুর্ভাব ঘটল। চৈতন্যদেবের অভিনয়লীলা তার অন্যতম সাক্ষ্য; আজও যাত্রার মধ্যে তার স্বাক্ষর স্পষ্টত বিদ্যমান। এসম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য: 'একসময়ে দেবমন্দিরের সঙ্গে নাটমন্দির এবং পূজাপার্বণের সঙ্গে দেবতার চরিত বর্ণন করে চন্দনযাত্রা রাসযাত্রা রুক্মিণীহরণ এমনি নানা অভিনয় ও চিত্রকার্য জড়িয়ে ছিল; এখন তারা সে সম্পর্ক সে গলাগলি ভাব ছেড়েছে; ধর্মমন্দিরে, নাটকের রঙ্গমঞ্চে ও শিল্পপ্রদর্শনীতে সুনির্দিষ্ট ভাগ হয়ে গিয়েছে।' সামাজিক পালাবদলে নাটকাদি সাহিত্য-শিল্পকলা কালক্রমে ধর্ম থেকে বিযুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় কক্ষপথে আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে।

চতুর্দশ শতকের শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এই দুশো

বছরের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে মানব-তৎপরতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কর্মে ও চিন্তায়, ভাবে ও ভংগিতে এক বিরাট পরিবর্তন এল। এই পরিবর্তনের নাম 'রেনেশাঁ'। জল-বায়ু-অশ্বশক্তির যান্ত্রিক আবিষ্কারে, কারিগরি বিদ্যার উন্নতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে, নতুন মহাদেশের সন্ধানলাভে মানুষের জীবনধারার সমূহ রূপান্তর হতে থাকল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে জাগল প্রগত চিন্তা, কল্পনা, মনন। এসময়ের শ্লোগান ছিল 'প্লাস্ আল্ট্রা'—সামনে আরও আছে। এই সমুখগতির আবেগে রেনেশাঁ মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সমাজের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিল মানুষকে জীবনকে মানসকে মননকে: 'নিজেকে ও পৃথিবীকে মানুষ আবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল' (বিজ্ঞানের ইতিহাস ২য়)। 'ধর্ম'-ত্যাগী সাহিত্য-শিল্প 'রোমান্টিক' হল ; তার লক্ষণ—বস্তুভিত্তিক কল্পনাবিলাস, ব্যক্তিনির্ভর আত্মলীলা, প্রকৃতিপ্রীতি, বিশ্ব সঙ্কিৎসা, মানবপ্রেম এবং আবেগ ও মননের সমন্বয়প্রয়াস। পা চলে অচেনা দেশ দেশান্তরে, মন চলে অজানা দিগদিগন্তে।

নাটকও এখন আর ধ্রুপদী বা ধর্মধ্বৃত নয়, রোমান্টিক—যেখানে জীবনের বিচিত্র বিকাশ, মননের বিচিত্র প্রকাশ। গ্রীক নাটক থেকে শেক্সপীয়র, সংস্কৃত নাটক থেকে আধুনিক বাংলা নাটক এইখানেই স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আবার আরেক নতুনের ইসারা জাগতে থাকে। ডার-উইন, ফ্রএড, মার্কস-এঙ্গেল্স্, আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক প্রভৃতির আবিষ্কারে-আলোচনায়, জীবনের ক্রমরূপান্তরে এবং অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক সংকটের অভিভবে মানবচিত্তে সমাজ ও বাস্তবচেতনা গভীরতর হতে থাকে ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণতা দান করে। সাহিত্য রোমান্টিকতার ঘাট থেকে উপনীত হয় বাস্তবতার ঘাটে। নাটকও বস্তুধর্মী হতে থাকে, সে বাস্তবতা সচেতন ও ব্যক্তিত্বঘনিষ্ঠ। বাস্তব সামাজিক নাটকের প্রবক্তা ইবসেন, তাঁরই পথের পথিক আধুনিক নাট্যকারগণ। তাঁর 'ডল্স্ হাউস'এর নায়িকা নোরা স্বামী সংসার সমাজ তথা পুরাতন সংস্কারকে পেছনে ফেলে সেই যে দরজাটি সশব্দে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল, সেই শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল পরবর্তী নাটকগুলিতে। অসজ্জিত বাস্তব জীবন রূপ-সজ্জিত হয়ে এসে দাঁড়াল পাদপ্রদীপের সামনে।

অতএব ইতিহাসের দিক থেকে নাট্যকলার বড়ো পর্যায় চারটি: আদিম কৃত্যাভিনয়, ধ্রুপদী ও ধর্মনাট্য, রোমান্টিক নাটক এবং বাস্তবধর্মী নাট্যকলা।

সমাজ ব্যক্তি শিল্প ও ঐতিহ্যের চতুরঙ্গে ভর করে 'এমনি পরে পরে ব্রতের সম্পর্ক থেকে দূরে যেতে যেতে নিছক যাত্রা নাটক থিয়েটারে এসে দাঁড়াল সেইসব শিল্পকলা, যার গোড়াপত্তন হয়েছিল ব্রতীর কামনাকে ব্যক্ত করবার চেষ্টায়' (বাংলার ব্রত)। কিন্তু পুরাতনকে সহজে পরিত্যাগ করা যায় না, রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে, তবে তাদের রূপ-রস-রীতির বদল হয়। তাই আদিম অভিনয় আজও বেঁচে আছে কৃষকের কৃত্যে ও গ্রামীন যাত্রায়, ধ্রুপদী নাটক অনুস্যূত হয়ে আছে রোমান্টিক নাটকে এবং উভয়ই পুনর্জাত হয়েছে বাস্তব নাট্যকলায়। অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ধর্মনাটক রূপান্তরিত হয়েছে পৌরাণিক নাটকে। আধুনিক কালে ধর্মনাটকও লেখা হয়েছে কিন্তু ধর্মসাধনা বা দেবভক্তি তার বিষয়বস্তু নয়, আত্মার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই তার উপজীব্য—উনা ফারমোরের ভাষায়, a dramatic presentation of religious experience is, generally, a presentation of the progress into that experience। ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ড্', ইএট্স্-এর 'আওয়ার গ্লাস,' এলিঅটের 'ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ন' এই জাতীয় নাটক; মিল্টনের 'স্যামসন অ্যাগনিস্টিস্' এই শ্রেণীর সর্বোত্তম রচনা। এগুলির বক্তব্য—আত্মার দুর্বলতা ও সংগ্রামমাধ্যমে জয়লাভ, সে-জয়ের শক্তি আত্মার মধ্যেই নিহিত—the Light is in the soul : তার স্পর্শে আত্মা ভস্ম-অপমানশয্যা ত্যাগ করে আলোর আগুন হয়ে ওঠে from under ashes into sudden flame। এগুলি পৌরাণিক নাটক নয়, theatre of the soul। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ও 'ডাকঘর' এই শ্রেণীর আত্মোপলব্ধির নাটক।

কমেডী এবং ট্র্যাজেডীরও মূল অতীতে নিহিত। আদিম কৃত্যের ভূত তাড়ানো অনুষ্ঠান তথা 'রাস্টিক ড্যান্স্' থেকে কমেডীর এবং আদিম কৃত্যাভিনয় থেকে ট্র্যাজেডীর ক্রমাবির্ভাব হয়েছে। প্রবন্ধের সূচনায় কথিত আকাশ বা সূর্য-পৃথিবীর কৃত্যকথার মিলন ও পুনর্জন্মের দিকটি গৃহীত হয়েছে প্রাচ্য দর্শনে, সাহিত্যে শিল্পে এবং বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর দিকটি গৃহীত হয়েছে পাশ্চাত্য দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে মৃত্যু বা বিচ্ছেদ শেষ কথা নয় এবং গ্রীক সাহিত্যে ট্র্যাজেডীই সার কথা। তাই আমাদের 'করুণরসে' পরম সুখ জাগে, ওদের ট্র্যাজিক পরিণতি জাগিয়ে তোলে চরম অ-সুখ। উভয়ের মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য এত স্বতঃসিদ্ধ যে তা নতুন করে প্রমাণ করার অপেক্ষা

রাখে না। তবু নানাকারণে মনে প্রশ্ন জাগে—সাদৃশ্য কি সত্যই নেই দুই প্রান্তের দুজনের মধ্যে?

দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ, দ্বন্দ্ব ট্র্যাজেডীর রসস্তম্ভ। ঘটনা চরিত্র রস ও সংলাপ পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিচিত্রজটিল অথচ সামগ্রিক রূপ লাভ করে, বেনেটের ভাষায়, written in one key কিংবা ব্রাডলের ভাষ্যে, a total tendency to identify the whole being one idea, passion or object or habit of the mind। এই সমগ্রতার মধ্যে থাকে বিচিত্রের ঐক্য। বিন্দু একটি, তা থেকে জাত বক্র ও বৃত্তরেখাগুলি অনেক। প্রাচ্য আলংকারিক তাই বলেছেন, 'একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্। ভিন্নঃ পৃথক পৃথক ইবাশ্রয়তে বিবর্তান্'—একই (করুণ) রস নিমিত্তভেদে পৃথক পৃথক রূপে বিবর্তিত। এই রসবৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ট্র্যাজেডীর (তথা নাটকের) দ্বন্দ্ব দুটি পথে অগ্রসর হয়। একটি ডাইনামিক—প্রসারিত হতে হতে এক-দুই থেকে বহুর মধ্যে, গৃহসভা থেকে জনসভায় ছড়িয়ে পড়ে; অন্যটি ষ্ট্যাটিক—গভীর থেকে গভীরতর হতে হতে হৃদয়কে দ্বন্দ্বে-আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে থাকে। একদিকে অনেক হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাত, অন্যদিকে একই চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তির নিরন্তর সংঘাত—যেন দ্বন্দ্বের আহ্নিক ও বার্ষিক গতি। উভয়ের মিশ্রণে ট্র্যাজেডীর এক বিশেষ ভাব-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, যেখানে মনে হয়, the world is out of joints। ট্র্যাজিক চরিত্রও তাই নিষ্প্র-দীপ নয়, সংঘর্ষের আগুনে উজ্জ্বল; একদিকে বাইরের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে ভেতরের দ্বন্দ্ব—যার মূল emotional attitude, শুধু ইমোশন নয়, ইন্টেলেক্ট্‌ও। অনেক মূল্য দিয়ে তবে সে বোঝে, Perfect virtue is very far from attainable, to find reason tainted by feeling (পত্রাবলী : শেলী)। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। মনের জ্বালা আর চোখের জলে ভিজে যবনিকা নেমে আসে ট্র্যাজেডীর শেষতম দুঃখের শেষ কথার পর।

এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিষাদ-পরিণতি সকল যুগের সকল ট্র্যাজেডীর মৌল নাট্যবস্তু। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভংগির ও সৃষ্টি-প্রদর্শনীর। গ্রীক ধ্রুপদী ট্র্যাজেডীতে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ সত্ত্বেও বহির্দ্বন্দ্বের প্রাধান্য, দুর্লংঘ্য নিয়তির কাছে মানবশক্তির পরাজয় ও মৃত্যুতে তার উপসংহার। শেক্‌স্‌পীয়রীয় রোমান্টিক ট্র্যাজেডীতে বাইরের দ্বন্দ্ব গৌণ, আন্তর দ্বন্দ্বতথা বৃত্তিনিচয়ের

অসামঞ্জস্য ও সংঘর্ষই প্রধান বক্তব্য; স্বীয় চারিত্রিক 'ফ্ল' বা দুর্বলতার কাছে মানুষের পরাজয় ও মৃত্যুতে তার উপসংহৃতি। ইবসেনীয় বাস্তব নাটকে এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছে, সেই সঙ্গে শেষ পরিণাম সম্পর্কে নতুন কথা বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে মৃত্যুই ছিল ট্র্যাজেডীর ললাট লিখন; ট্র্যাজিক নায়কের হৃদয় যেমন হ্যামলেটের মত দ্বন্দ্ব-দোলায়িত: To be or not to be that is the question, তেমনি ওথেলোর মত বেদনাবিমথিত:

No way out this
Killing myself to die upon a kiss.

বাস্তব নাটকে ট্র্যাজেডীর গভীরতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বেঁচে থাকার মধ্যে। মৃত্যুতে তো সব যন্ত্রণার অবসান; বেঁচে থেকে রাবণের চিতা বুকে নিয়ে মানুষ তিলে তিলে পুড়ে মরছে, ছট্‌ফট্‌ করছে, ঝলসে যাচ্ছে—এইখানেই তো সত্যতম এবং গভীরতম বেদনার অভিব্যক্তি।

প্রাচ্য নাট্যকার কিন্তু এই বেদনা-যন্ত্রণাকেই জীবনের শেষ বিন্দু বলে মেনে নেন নি। দুঃখকে তাঁরা স্বীকার করেছেন কিন্তু চূড়ান্ত বলেন নি। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে-শাস্ত্রে 'করুণ রস' আছে, কিন্তু উপসংহার 'শান্ত রসে'। ভারতীয় কবিদৃষ্টি আপাত-নৈরাশ্যে দেখেছে মহৎ উদ্দেশ্যের পটভূমিকা, দুঃখের মধ্যে দুঃখান্তের অদৃশ্য ইঙ্গিত, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্ব। তাই বলতে পেরেছেন, জীবন ট্র্যাজেডী নয়, 'করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরম সুখম্'। মিলটনের নাটকেও স্যামসনের মৃত্যুর পর কোরাস দাঁড়ি টেনেছে এই ব'লে :—সমস্ত ব্যথাবেদনা

With peace and consolation hath dismissed,
And calm of mind, all passions spent.

অবশ্য মিলটনের এই রচনাটি ধর্ম-নাটক। তথাপি ট্র্যাজেডীর রস 'করুণরস' না হলেও, তার মধ্যে প্রাচ্য আলংকারিকের সমজাতীয় ভাবনা দুর্লভ নয়। আরিস্ততল ট্র্যাজেডীর দর্শনে যে 'আবেগমুক্তির' কথা বলেছেন, তার মূল বক্তব্য হল চিত্তের নির্দ্বন্দ্ব শান্তি—দর্শক হৃদয়ের করুণা ও ভয়কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে-ফাটিয়ে শেষে বার করে দেওয়া। তখন ব্যথাহীন চিত্তে যে বোধ জাগে, তা প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রের 'পরম সুখ' থেকে ভিন্নতর কিছু নয়।

তাছাড়া ট্র্যাজেডীর কল্পনা ও পরিকল্পনার মধ্যেও আছে একটা ভারসাম্যের

চেতনা। জগতে সৎ ও অসৎ, যন্ত্রণা ও মুক্তি, অনাচার ও আদর্শ, অনিয়ম ও বিশ্বনীতি পাশাপাশি বর্তমান—Suffering and catastrophe upon the the one hand and upon other a relation with some fundamental or universal law whose operation justifies or compensates them (Frontiers of Drama—Una Fermore)। একদিকে হারানো অন্যদিকে পাওয়া, জীবনের বিসর্জন ও আদর্শের আগমনী—ট্র্যাজেডীর ভারসাম্য ও সান্ত্বনা এইখানে। যা গেল তার জন্যে দুঃখ তো বটেই, কিন্তু তার বদলে পেলামও তো অনেক; এই হারিয়ে পাওয়াতেই তো গভীরতা, সত্য উপলব্ধি ও ভারসমতা—'সব সুন্দর দুঃখের শোভায় সুন্দর'। নায়কের মৃত্যুতে একটি মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হল। শ্যামসনের, জয়সিংহের, সুপ্রিয়ের মৃত্যু তো মৃত্যু নয়, সে যে আত্মোৎসর্গ, মানবজাতির মঙ্গলের জন্যে বীরের আত্মবিসর্জন, জীবন দিয়ে জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরসন্ধান। নায়ক বা নায়িকার বিষাদ-পরিণতিব মধ্যে দিয়ে অন্যান্য নাট্যচরিত্র এবং দর্শকসাধারণ চিনতে পারে সত্যকে, চিনতে পারে নিজেদের; প্রতিষ্ঠা পায় একটি বিশ্বাস বা বিশ্বসত্য, তা দেখে মনুষ গড়ে তোলে জীবনদর্শন।

ট্র্যাজেডীর শেষে তাই সব অশান্তি অন্যায় অত্যাচারের অবসান দ্যোতিত হয়ে ওঠে, শান্তি নেমে আসে অলক্ষ্যে বা লক্ষ্যগোচর হয়ে। ব্যর্থতার সিঁড়ি বেয়ে আসে পূর্ণতা, ত্যাগের ঐশ্বর্যে মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এই ভারসম দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, ট্র্যাজেডীর মৃত্যু চোখে জল আনে, সে জল মনের জ্বালা ধুইয়ে দেয়, ব্যথার স্রোতে সান্ত্বনার ঢেউ জাগে। তখন উপলব্ধ হয়:

> Nothing is here for tears, nothing to wail,
> Or knock the breast ;No weakness, contempt,
> Dispraise or blame. (Samson Agonistes)

তাই এলিজাবেথ ড্রু বলেছিলেন: Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre—তত্ত্ব নয়, দর্শন নয়, মানুষেরই জীবন, মানুষেরই জীবনদর্শন। তাতে অস্তি আছে, নাস্তিও আছে, ট্র্যাজেডী আছে, তার ভারসমতাও (equilibrium of tragedy) আছে। এই মানুষই ঘোষণা করে—We offer, as an example, the only original rule of life today : to learn to live and to die, and in order to be a man, to refuse to be a God (আলবেয়া কামু)।

মরমীয়া সাধনা

'ধর্ম ও নীতির বিশ্বকোষে' মরমীয়া সাধনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: relationship and potential union of the human soul with Ultimate Reality, and to use the term 'mystical experience' for direct intercourse with God। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড় সম্বন্ধ ও অন্তরঙ্গ মিলন মরমীয়াবাদের মূলকথা—কোথাও প্রেমের পথে, কোথাও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির সহায়ে। উভয় ক্ষেত্রেই এই সাধনা কুয়াসাধূসর রহস্যময়তায় মণ্ডিত।

মরমীয়া সাধনার উৎস সন্ধানে ঐতিহাসিকগণ পেছিয়ে গেছেন আদিম যুগে। সেকালের মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে নানা জাদুবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে, মাঠের শস্যে, বৃক্ষে প্রাণ কল্পনা করে তাদের দৈবীকরণ হত। এদের জয় ও লাভ করার জন্যে প্রাণময়ী প্রকৃতি-শস্যাদির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত মানুষ; তার দেহে 'ভর' হত, দৈব নির্দেশ প্রচারিত হত, দেবতার সঙ্গে অভেদ হয়ে ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা চলত। শস্য অথবা তার প্রতীকের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনায় তারা নতুন শস্য ও তার প্রতীকের (পশু বা মানব) মাংস আহার করত, রক্তে স্নান করত, সদ্যবিচ্ছিন্ন চর্ম পরিধান করত। দেবতা ও মানবে অভেদ-মিলনে মানুষ হত দৈবশক্তিসম্পন্ন। এই সব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শস্য-শিশু-পশুর সমৃদ্ধি। সেই সঙ্গে উৎসব হত, আসর বসত নাচ গান কথার। চাষের মাঠে, নারীরাই প্রধানত এই উৎসবে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করত; পরে পুরুষেরা সে ভার নিল। অনেক ক্ষেত্রে, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংস্কারের প্রতি বিশ্বাসে পুরুষ নারীর রূপসজ্জায় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করত—যেমন, দক্ষিণ ভারতের 'কুরুবইকুট্ট' নৃত্যাভিনয়। এইভাবে ইষ্টসহ অভেদের সাধনা ও নারীরূপে ভজনার রীতি—বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে তাইই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল আধ্যাত্মিক মিষ্টিকতায়—কোথাও হৃদয়ভাব তার সহায়, কোথাও দেহসাধনা তার মাধ্যম।

মধ্যযুগের ইউরোপে প্লেটোর মতবাদ, এপিকিউরিয়ান ও স্টোইক্ দর্শনের পাশে দেখা দিল প্লতিনাসের (২০৪-২৭০ খ্রীঃ) নিও-প্লেটোনিক দার্শনিকতা। প্লেটোর all knowledge is recollection-সূত্রকে ভিত্তি করে বিস্তৃত হল জন্মান্তরবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরতার ভাবনা। এর সাহায্যে নব্য প্লেটোনিকরা

গড়ে তুললেন মরমীয়া সাধনার প্রাথমিক রূপটি—'flight of the alone to the alone—'একার সাথে মিলুক একা।' পোরফিরি ও আয়ামব্লিকাস একে আরও মিষ্টিক করে তুললেন। দেবতা দেবদূত শয়তান, জাদুাবস্থা সন্ন্যাস দিব্যভাব, রূপক মন্ত্রতন্ত্র অদৃষ্টবাদ ইত্যাদির অনুপ্রবেশে সাধনা জটিলতর হয়ে উঠল। সেণ্ট্ অগষ্টাইন এই মিষ্টিক আরাধনাকে নিয়ে এলেন খ্রীষ্টধর্মে; তার নতুন ব্যাখ্যা প্রচারিত হল; ব্যাপকতা দান করলেন সেণ্ট পল। অতিপ্রাকৃত আনন্দলোকের স্বপ্ন-দর্শন ও রসাস্বাদন এবং পরম সত্যের নিবিড়তম উপলব্ধির এক রাহস্যিক উপাসনাধারা গড়ে উঠল 'মরমীয়া সাধনা' নামে ও রূপে।

কিন্তু মরমীয়া তত্ত্ব ও সাধনা কোন এক বিশেষ দেশকালের ধর্মমত নয়, তা সর্বজনীন, সকল দেশের সকল মানুষের; পারস্পরিক বৈষম্য আপাত, মূলে সমতা। ইহুদী ধর্মে 'জোহার' বইতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের প্রেমের সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়েছে। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টের 'সঙ্ অফ্ সঙ্স্'-এ এই ভাবনার ভাষারূপ প্রতিফলিত হয়েছে—Let Him kiss me with the kisses of His mouth ; for Thy love is better than wine···By night on my bed I sought Him whom my soul loveth···I sought Him but found Him not।

মধ্যপ্রাচ্যে মরমীয়া সাধনার আত্মপ্রকাশ সুফী ধর্মে। কোরাণে এর ইঙ্গিত এবং হজরৎ মহম্মদের ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের সঙ্গে এর যোগ আছে বলে অনেক মনে করেন। গ্রীক দর্শনের অনুশীলনের ফলে নিও-প্লেটোনিক মতবাদ থেকে ইসলামী মিষ্টিকতা শক্তি সংগ্রহ করে। সিরীয়, খৃষ্টান, ইন্দো ইরাণীয় বিশেষত বৌদ্ধ প্রভাবও এতে লক্ষণীয়। আবু সুলেমান, অল্ হল্লাজ, ইবন্ আরাবি, অল্ ইনায়ো, রাবেয়া প্রভৃতি সাধক সাধিকার মাধ্যমে সুফী ধর্ম ক্রমে বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান অল্ বহালির। সুফী মতবাদ সন্ন্যাস থেকে মরমীয়া, তা থেকে তত্ত্ব, শেষে বিশ্বদেবতাবাদে উপনীত হয়। এতে বিধান-বিরোধিতা, প্রেমসাধনা, অন্তরঙ্গতা, নির্বাণলাভ, ঈশ্বরের নারীত্ব, জীবের পুরুষত্ব ইত্যাদি ভাব মুখ্য স্থান লাভ করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইবন্ অল্ ফারীদ্, সাদী, হাফিজ, রুমী প্রভৃতি সাধকের মরমীয়াবাদী রচনা মধুররসান্বিত হয়ে ওঠে। ক্রমে, দার্শনিকতা ও দল-উপদলের ভীড়ে সুফী ধর্ম বিচিত্র ও জটিল হয়ে ওঠে।

ইষ্টদেবতার সঙ্গে অভেদ সম্বন্ধ মরমীয়া সাধনার মূল কথা। তার জন্যে

প্রয়োজন আত্মার বিশুদ্ধিকরণ ও ভাগবতসাযুজ্য-লাভের ব্যকুলতা ; এই দৃষ্টিতে, উপনিষদের 'সোহম্'-বাদ এর সঙ্গে অভিন্ন। ব্যাপকতর অর্থে, সকল মতপথেরই শেষকথা, ঈশ্বরে-জীবে ভেদহীন একাত্মতা : শেষ সাধনায় জ্ঞানপথে সাধক পশুত্ব ত্যাগে পশুপতিত্ব লাভ করেন ; দেহসাধনার মাধ্যমে তান্ত্রিক সাধকের শক্তিসাযুজ্য ঘটে (বৌদ্ধ ও চীনাচারী তন্ত্রসাধনায়ও এই ভেদরাহিত্য) ; বৈষ্ণব ভক্ত প্রেমসাধনার সহায়ে মিলিত হন নিখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণের সঙ্গে। পথ হয়ত আলাদা, পথিক হয়ত বিভিন্ন, কিন্তু পথের শেষের মিলন-বিন্দুটি সেই এক।

ভারতে ইসলাম অনুপ্রবেশের পর থেকে সুফী ধর্ম এদেশীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মরমীয়া সাধনাকে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করে তোলে। কবীর-তুকারাম-চৈতন্যদেবের সাধনায় তার অভিপ্রকাশ, সমকালীন ও পরকালীন ধর্মে ও সাহিত্যে তার ব্যঞ্জনা। কালক্রমে, ভারতীয় মরমীয়াবাদ বিস্তৃত ও রূপান্তরিত হতে থাকে। বিভিন্ন মত-পথের ধর্মে-কাব্যে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

স্পারজিঅন বলেছেন : Mysticism is, in truth, a temper rather than a doctrine, an atmosphere rather than a system of philosophy ; এবং আণ্ডারহিল বলেছেন : Mysticism is a vision, an individual quest, a psychological experience। উক্তি দুটির মধ্যে মিষ্টিক সাধনার মর্মকথা ও মৌল স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে : দেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও মরমীয়া সাধকদের উপলব্ধি ও চলার পথ প্রায়-অভিন্ন। আঞ্চলিক সীমান্ত সত্ত্বেও তা বিশ্বজনীন এবং সকল ক্ষেত্রেই এই উপাসনা কোন বিহিত শাস্ত্র বা সুশৃংখল দার্শনিকতার মুখাপেক্ষী নয়, কোন বিশিষ্ট মত পথ বা বাদ নয়। সর্বত্রসঞ্চারী মরমীয়া সাধনা একান্তই মরমী—ব্যক্তিগত এষণা, তত্ত্বাতীত বোধিদৃষ্টি ও আত্মার আত্মসাক্ষাৎকার সাধকের হৃদয়ভাবনির্ভর, 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে'। তাঁর কাছে, Ideal is the only Real এবং এই আইডিয়াল ভগবান। ইনিই আত্মার উৎস ও লয়স্থান, এঁর জন্যেই আত্মার অশুদ্ধি-মোক্ষণ ও লীলাভিসার, তদ্ভাব-ভাবিত হয়ে তাঁরই উপলব্ধি—God only। তত্ত্বরসিক সাধক সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখেন একটি চিত্র, সব অনৈক্যের মধ্যে পরম ঐক্যকে, প্রিয়তম সেই এককে।

মরমীয়া সাধনার একদিকে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের জটিলতা ও বিচিত্রতা, অন্যদিকে প্রেমারতির মধুরতা ও সুন্দরতা। ভাক্ত মরমীয়া সাধকের কাছে প্রেম জীবনের মূল ও ইষ্টের সঙ্গে মিলনের একমাত্র সেতু। পরমাণুর জন্যে জীবাণুর ব্যাকুল কামনা অভিসারের পথে এগিয়ে দেয় আত্মাকে, অসীমের সঙ্গে হয় সহৃদয় হৃদয়-সংবাদ; ভাগবত প্রেমের আলোয় পথ চিনে চিনে ভক্ত যেখানে উপনীত হয়, সেখানে—God and I are one। এই উপাসনা মরমীয়া বলে এর প্রকাশ মরমী, হৃদয়বেদ্য; এর ভাষা ধূসর সান্ধ্য: রূপকে প্রতীকে alchemic language। এখানে, দৈবীপ্রেম বোঝাতে মানবিক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়; ঈশ্বর ও ভক্তের সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রীর—উভয়ে বরবধূ, বিবাহ এখানে মিলনের দ্যোতক। এ ছাড়াও সোনা রূপা লোহা পাখী নৌকা জল আলো আগুন অন্ধকার ইত্যাদি শব্দকে নিগূঢ় অর্থবোধক প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়। বস্তুর রাসায়নিক রূপান্তরের ইঙ্গিত দ্বারা মনের বৃত্তিসমূহের ভাবান্তরকে বোঝান হয়। বিশ্বজগতের যা কিছু সবই মরমীয়া সাধকের কাছে অসীমের প্রতীক। ব্লেকের ভাষায়:

> To see a world in a grain of sand,
> And a heaven in a wild flower,
> Hold Infinity in the palm of your hand,
> And eternity in an hour.

মরমীয়া সাধনা ব্যবহারিক বিজ্ঞান-সদৃশ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মানবাত্মা কেবলই বদলায়, চলে, লড়াই করে, বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কেবলই 'হয়ে-ওঠে'। তাই এর চলার পথ বাঁধানো রাজপথ নয়, ব্যক্তিগত আকুতিতে মাঠঘাট উজিয়ে-যাওয়া। সকলেরই সেই এক কথা: 'কেবলই চলা, কেবলই সরা।' সমগ্র মরমীয়া সাধনাই যেন বর্ষণমুখর অভিসারের পদাবলী—পঞ্চপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত।

প্রথম প্রদীপ: 'আত্মার জাগরণ।' সংসারসুখে আবদ্ধ মন হঠাৎ শুনতে পায় অজানার ডাক, নতুন এক অনুভবের স্ফূর্তি, নবতর এক চেতনার পদসঞ্চরণ। অহংবোধ গৃহসুখ ছাড়তে চায়না, জ্বলেওঠা আগুন মনকে বার করে আনতে চায় দৈব-চেতনার অভিমুখে। ভাগবত প্রীতির এই স্থিরা-রতিই 'পূর্বরাগ'। দ্বিতীয় দীপ: 'চিত্তের শুদ্ধি'। পূর্বরাগান্বিত চিত্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে পথ করে এগিয়ে চলে অজ্ঞাত সম্মুখে। হৃদয়ই দৈবী প্রেমের আগুনে পুড়িয়ে দিতে থাকে

যাবতীয় হীনতা-দীনতা-কলুষ-গ্লানিকে। অহং দুর্বলতর, আত্মা শুদ্ধতর, সংসারচেতনা শিথিলতর হতে থাকে। ভক্ত তখন সেণ্ট্ থেরেসার মত বলে: Let me Suffer or die। এরই নাম 'অভিসার'। মরমীয়া সাধকচিত্তের উদ্বর্তনের তৃতীয় সোপান: 'চিত্তের উজ্জীবন'। অভিসার-অন্তে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারে অহংবোধ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়, আত্মবোধ ও বিশ্ববোধ এনে দেয় ভেদজ্ঞানরাহিত্য। ভাগবত প্রেমের দীপ্ত আলোকে হৃদয় তখন পরিপ্লাবিত। একদিকে আত্মার স্থিতি-ধ্যান-তন্ময়তা-সাত্ত্বিকভাব, অন্যদিকে সমস্ত দেহমনকে একাগ্র করে তুলে পরম আনন্দ-প্রেমামৃতের কাছে আত্মসমর্পণ। সেখানে, সেণ্ট্ জনের ভাষায়: all ceased and I was not। ভক্ত-ভগবানের এই সান্নিধ্যকে বলা হয়েছে 'মিলন'। চতুর্থ পর্যায়ে: 'আত্মার মৃত্যু'। মিলন স্থায়ী হয়না, ভগবান দেখা দেননা; কারণ ভক্তহৃদয়ের অহংকার, চিত্তের আবিলতা এখনও নিঃশেষিত নয়। তাই আঘাত দানের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর সরে যান নিকট-দূরে। একাকিত্বের অসহায়তা, শূন্যতার অন্ধকার ও বেদনার আগুনে ক্রম-রূপান্তর হতে থাকে আত্মার। তার শেষতম কালিমাটুকু নিশ্চিহ্ন, সামান্যতম আসক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। মুক্ত আত্মা নিজেকে পরিপূর্ণরূপে চিনতে পারে, উপলব্ধি করে নিজের ক্ষুদ্রতা ও ঈশ্বরের বিরাটত্ব। সেণ্ট্ ক্যাথারিনের মতো সে অনুভব করে, by me is God ঈশ্বরবিচ্ছেদে কাতর হৃদয় আরও নিবিড় ও আপন করে পেতে চায় তাঁকে। সংসারচিন্তার অপসরণে চিত্তে যে শূন্যতা জাগে, তা পরিপূর্ণভাবে অধিকার করে ভাগবত চেতনা রহসথার অভাববোধজনিত এই যে আকুল আর্তি, এই-ই 'বিরহ'। পঞ্চম বা শেষ বিন্দুতে: 'আত্মার অভেদমিলন'। পার্থিব চেতনাবিলুপ্ত ভক্তহৃদয়ে এখন কেবল দৈবচেতনার নিঃসীম আলো। আত্মা এখন পরম বিশুদ্ধ সর্বকলুষমুক্ত সুরভি-পদ্ম। পরম প্রিয়তম এসে ধীরে ধীরে বসেন সেই শুভ্র শতদলে আসন করে, জীবাত্মা-পরমাত্মায় হয় বিবাহ, অর্থাৎ পুনর্মিলন ও পূর্ণমিলন; সানন্দ চিত্ত উপলব্ধি করে: God in me—ঈশ্বরই প্রেম, প্রেমই ঈশ্বর—'সোহম্' বা 'সাহম্'। মরমীয়া ভাষায়—সংসারপ্রীত আত্মা থাকে লোহার মত কঠিন-কালো; ঈশ্বররতির আগুনে পুড়ে তার সব কালো উধাও হয়; সে হয় সাদা অর্থাৎ শুদ্ধ; তারপর লাল হয়ে ওঠে ভাগবতপ্রেমে দীপ্ত হয়ে; শেষে মহাভাবের আবেগে গলে গিয়ে মিলিত হয় ইষ্টের সঙ্গে। আত্মার সঙ্গে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, সাযুজ্য হয়, এক আর একে মিলে হয় এক—সমুদ্রের লবণে তৈরী পুতুল সমুদ্রেই মিশে যায়, ঘটে 'ভাবসম্মিলন'।

মিষ্টিকের এই অভিসার ও মিলনানন্দের অভিজ্ঞতা তত্ত্বাতীত বোধাতীত প্রকাশাতীত, অনুভববেদ্য হৃদয়গম্য হ্লাদৈকময়ী। সাধকের এই তুরীয় আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদস্বয়ং। বৈষ্ণব সাধকের অন্তিম প্রেমানুভূতিও বেদ্যান্তর, প্রকাশ-অগম্য, যদিও তাঁর সাধনা মূলত মরমীয়া নয়। তার ভিত্তিমূলে আছে একটি বিশিষ্ট ধর্মমত, প্রকাশভংগিমায় রহস্যের অভাব, লীলা রাধাকৃষ্ণের, (শাস্ত্রমতে) জীব-ঈশ্বরের নয়; ভক্ত লীলাশুক সখা, গোপীপ্রেম তাঁর সর্বসাধ্য সার। তথাপি বৈষ্ণবী রতি মরমীয়া অনুরাগানুগা। রাধার কৃষ্ণপ্রীতি মরমীয়া ঈশ্বরপ্রেমের সমান্তরাল, মিষ্টিক উপাসনার 'পঞ্চাঙ্গ' (পূবরাগ থেকে ভাবসম্মিলন) বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বেরও স্তম্ভস্বরূপ। আবার যাঁরা রাধাকে জীবাত্মার প্রতীক মনে করেন, যাঁদের আরাধনা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত—তাঁদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ মরমীয়ার মতই অতি-প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত। বৈষ্ণব রসসাধনে ইষ্ট প্রেমময়, ভক্ত রাধা, মুখ্য সাধ্য কৃষ্ণরতি, সাধন প্রেম ('সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'), পথশেষের অনুভূতি: 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর! চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর;' যেমন মিষ্টিকের কণ্ঠে: He is not only with us, but also within us। ভাষাও তখন সাংকেতিকতার হাত ধরে চলে। মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ বৈষ্ণব ধর্মে আরোপিত নয়, অন্তর্নিহিত এবং বৈষ্ণব সাধনা মরমীয়া না হয়েও মরমী।

মাটে ফিজিক্‌স্‌ অধ্যাত্মমুখী ভাবনা হলেও মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ তার মৌল কেন্দ্র নয়। মেটাফিজিক্‌স্‌ জানতে চায় কার্যকারণের আদিকে: absolule knowlege তার সাধ্য; মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ পেতে চায় কার্যকারণের অন্তকে: Union with Union তার সাধন। প্রথমটির লক্ষ্য জ্ঞানের উপলব্ধি, দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য পরমের অনুভূতি। তাই কাব্যকলার ক্ষেত্রে জন ড্যান ও ফ্রান্সিস টম্‌সন্‌ সগোত্র কবি নন। একজন জিজ্ঞাসু, অপরজন মুমুক্ষু। কিন্তু অনুভবের অতলান্ত গভীরে মেটাফিজিক্যাল কবিও মিষ্টিক হয়ে ওঠেন, প্রকৃতি দেহ নারী প্রেম সম্পর্কে তত্ত্বজিজ্ঞাসা উপনীত হয় তত্ত্বরসে—যেখানে আত্মার সঙ্গে আত্মার অন্তরঙ্গতম আত্মীয়তা। ড্যন্‌, ট্রাহের্ণে, ব্রন্টি, টেনিসন, শেলী, কীটস, ব্লেক, ডন-এর বহু কবিতা এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ; বিহারীলালের কবিতাও। এই দৃষ্টি-আলোকে ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ্‌ উপলব্ধি করেন:

> Gently did my Soul
> Put off her veil, and Self transmuted, stood
> Naked, as in the presence of her god.

মিষ্টিকতার রহস্যময় পরিবেশ ও আবেশ তান্ত্রিক সাধনায়ও অন্তর্নিহিত। প্রেমারতির স্থানে সেখানে দেহারতির আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ। বিচিত্র মন্ত্র ও কৃত্যের (ritual) মাধ্যমে তন্ত্রসাধক আবাহন করেন আরাধ্য দেবতার ; মন্ত্র ও তন্ত্রবলে দেবতা আবির্ভূত হন, আশ্রয় করেন আরাধকের দেহ ও মনকে ; উভয়ের একাত্মতার মাধ্যমে সাধক অলৌকিক শক্তি ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র, মন্ত্রপুত শুদ্ধি ন্যাস ইত্যাদি করণীয় আঙ্গিক। শুধু প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্য দেশেও তান্ত্রিক মিস্টিক সাধনা প্রসার লাভ করেছিল। 'সাধনমালায়' তান্ত্রিক মরমীয়া সাধনার সরলতর রীতিপদ্ধতি বিধিবদ্ধ ; ক্রমেই তা জটিলতর হয়ে ওঠে পুরাণঘেঁষা তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে, রহস্যময় ভীতিকর হয় শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয় নানা অনুষ্ঠানে ক্রিয়াকলাপে।

কিন্তু প্রেমের অভিসিঞ্চনেই মিষ্টিকতার যথার্থ বিকাশ। প্রেমভক্তির আকুলতা তান্ত্রিক চিত্তকেও দ্রবীভূত আবেগময় করে তোলে। ভীতিতে-প্রীতিতে ভয়ানক-সুন্দরতায় তান্ত্রিকের উপলব্ধি তখন ভক্তি-শক্তি মিশ্রিত। তখনই শাক্ত পদাবলীর শক্তিমৎ প্রেমের সাংগীতিক প্রকাশ, শ্যাম ও শ্যামায় অভেদ, সখী ও সন্তানে ভেদহীনতা। বৈষ্ণব ভক্তের মত শাক্ত তান্ত্রিকও হন কবি। প্রেমিক কবির আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ধ্যানলীনতার নৈঃশব্দ্যে : যেখানে দুয়ে মিলে এক হওয়া—হৃদি দিয়ে হৃদি অনুভব। সেখানে, ফ্রান্সিস টমসনের মত Naked I wait Thy love's uplifted stroke।

আধুনিক সাহিত্যশিল্পের বিচারে, রোমান্টিকতা নিবিড়তম হয়ে অধ্যাত্মরাজ্যে পদার্পণ করলে মিষ্টিকতার আবির্ভাব হয়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনন আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে আর্টের সীমান্ত অতিক্রম করে মিষ্টিক অসীমতায় বিহার করেছে। পঞ্চদীপান্বিতা পথ বেয়ে তিনি উপনীত হয়েছেন সবপেয়েছির দেশে, অবগাহন করেছেন 'দিঘির' অতলে, অনুভব. করেছেন চিত্তের নবীন পূর্ণতা :

এক রজনীর বরষণে শুধু কেমন করে,
আমার মনের সরোবর আজি উঠেছে ভরে।

সেই হৃদয়-সরোবরে :

একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঝলমল ;

তখন কবির অন্তরতম প্রদেশে সমাহিত সৌন্দর্য-উপলব্ধি :

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণীর মাঝখানে ;
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে।

আর সেই স্বর্ণকমলের ওপরে সোনালী-পাখা এক নাম নাজানা সোনার পাখার মধুর বিহার।

মিষ্টিক সাধনকলায় রোমান্টিক শিল্পকলা : যেন ইম্‌প্রেসনিষ্ট ছবির চারপাশে কাজকরা সুচারু সোনা-ফ্রেম ॥